ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

ISSN: 2710-1568

৬০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা । জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

ইফা/গবেষণা পত্রিকা/২০২১/রাজস্ব/৬০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা/১৭০০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক
রেজিঃ নং - ডিএ ২০/৭৬
ISSN : 2710-1568

৬০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১
জুমাদাল আখিরাহ-শাবান ১৪৪৩
মাঘ-চৈত্র ১৪২৮

প্রধান সম্পাদক
ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক
নূর মুহাম্মদ আলম

সহযোগী সম্পাদক
ড. ওয়ালীয়ুর রহমান খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ নূর উদ্দীন

গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA
[A Quarterly Research Journal of Islamic Foundation]

Regd. No. DA 20/76
Year 60, Issue-3
January-March 2021

Chief Editor
Dr. Md. Mushfiqur Rahman

Editor
Nur Muhammad Alam
Associate Editor
Dr. Waliur Rahman Khan
Assistant Editor
Mohammad Nur Uddin

Published by Department of Research.
Printed by Islamic Foundation Press.
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
E-mail : ifapatrika@gmail.com
Website : www.Islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 50.00
U. S. Dollar : 1

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বোরহান উদ্দীন মোঃ আবু আহসান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

যোগাযোগ
সম্পাদক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫২১

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

সূচিপত্র

- বাংলাদেশের মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সন্তানের অধিকার একটি পর্যালোচনা/০৫
  মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
- মহানবী (সা)-এর সামাজিক শিষ্টাচার নীতি : পর্যালোচনা/৩১
  ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল এবং মোঃ মিকদাদ সিদ্দিকী
- ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান ও জ্ঞানী : প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা/৫৫
  ড. আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ
- তারাবীহ নামায : একটি পর্যালোচনা/৭৬
  ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ
- মানব সৃষ্টি, প্রকৃতি ও প্রবণতা : পরিপ্রেক্ষিত আল-কুরআন/৯৬
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসাইন
- আল-কুরআনে সংখ্যাবিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা/১২০
  ড. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
- রমযান : পরিচিতি, প্রবর্তন ও উদ্যাপন/১৪৯
  ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা
- আরবি ব্যাকরণের পরিচয় ও ইসলামী শারী'আহ অধ্যয়নে এর প্রয়োজনীয়তা : একটি বিশ্লেষণ/১৭৮
  ড. মো: আব্দুর রহিম মুকুল
- محمد سلطان ذوق الندوى : خدمته فى اللغة العربية/১৯৩
  محمد عميم الاحسان

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় লেখার নিয়মাবলী

- পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা কম্পিউটার কম্পোজ করা দুই কপি সিডিসহ গবেষকের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর সম্পাদক বরাবর আবেদনপত্রসহ পাঠাতে হবে। প্রতিটি প্রবন্ধ কম্পোজকৃত অবস্থায় ১৫ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। প্রবন্ধ জমা দেয়ার সময় আবেদনপত্রে উল্লেখ করতে হবে যে, এটি প্রবন্ধ/বই আকারে অন্য কোন প্রকাশনা সংস্থা বা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি বা প্রকাশিত হয়নি।
- বিষয় হিসেবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক সমস্যা, উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ লেখাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যৌথ লেখাকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।
- তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে—ইমাম গাযালী, সৌভাগ্যের পরশমণি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ. ২০-২২। পত্রিকা থেকে তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে— মোহাম্মদ আজরফ, আবুল হাশিম : জীবন ও চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, ঢাকা, পৃ. ৮-১৩।
- কুরআনুল করীমের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'আল-কুরআনুল করীম'-এর অনুবাদ অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র আল-কুরআনুল করীমের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রে পুস্তকের নাম, কিতাব (অধ্যায়) ও বাব (অনুচ্ছেদ) উল্লেখ করতে হবে। সম্ভব হলে হাদীস নম্বরও যোগ করতে হবে। এছাড়া যে সকল প্রবন্ধে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি দেয়া হবে সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ দিতে হবে।
- লক্ষ করা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধসমূহ কম্পোজ করার পর লেখক কর্তৃক কপি মিলিয়ে জমা দেওয়া হয় না। ফলে সম্পাদনা এবং প্রুফ পর্যায়ে রেফারেন্স গ্রন্থের সাথে কপি মিলাতে গিয়ে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়। এতে সন-তারিখ এবং আল-কুরআনুল করীম থেকে উদ্ধৃত সূরা ও আয়াত নম্বরে ভুল পাওয়া যায়। এ বিষয়গুলো আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভুল প্রবন্ধ জমা দিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রবন্ধ মনোনীত হলেও তা প্রকাশের অগ্রিম প্রতিশ্রুতিপত্র দেয়া হয় না এবং অমনোনীত লেখা ফেরতও দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।
- পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মতামত ও তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকের।
- প্রকাশিত রচনার ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।
- উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের নিচে অথবা শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা উপস্থাপন করতে হবে।
- মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।
- বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (Italics) অক্ষরে হবে যেমন, বই: *কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম-শতবর্ষ)*; পত্রিকা: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*। মূল পাঠে বিদেশী শব্দ হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।
- প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপন রীতি হবে বর্ণানুক্রমিক। গ্রন্থের একাধিক লেখক থাকলে গ্রন্থপঞ্জিতে সকলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।
- প্রবন্ধের শুরুতে একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।
- জুলাই থেকে শুরু করে প্রতি তিন মাস অন্তর **'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা'** প্রকাশিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখাসহ (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকাসহ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য গ্রন্থ কিনতে পাওয়া যায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ❑ জমাদিউস সানি-শা'বান ১৪৪২ ❑ পৌষ-ফাল্গুন ১৪২৮

৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ❑ জমাদিউস সানি-শা'বান ১৪৪২ ❑ পৌষ-ফাল্গুন ১৪২৮

৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ❑ জমাদিউস সানি-শা'বান ১৪৪২ ❑ পৌষ-ফাল্গুন ১৪২৮

৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ❑ জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA. REGD.DA 20/76. January-March 2021

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA. REGD.DA 20/76. January-March 2021

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA. REGD.DA 20/76. January-March 2021

01 — ০২ — ০৩ — ০৪ — ০৫ — ০৬ — ০৭ — ০৮ — ০৯ — ১০ —
১১ — ১২ — ১৩ — ১৪ — ১৫ — ১৬ — ১৭ — ১৮ — ১৯ —
২০ — ২১ — ২২ — ২২ — ২৪ — ২৫ — ২৬ — ২৭ — ২৮ —
২৯ — ৩০ —

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA. REGD.DA 20/76. January-March 2021

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

৫৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-জুন ২০২০ ❑ শাবান-শাওয়াল ১৪৪১ ❑ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২৭

৫৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-জুন ২০২০ ❑ শাবান-শাওয়াল ১৪৪১ ❑ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২৭

৫৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-জুন ২০২০ ❑ শাবান-শাওয়াল ১৪৪১ ❑ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪২৭

৫৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-জুন ২০২০

৫৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-জুন ২০২০

৫৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-জুন ২০২০

৫৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-জুন ২০২০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা ত্রৈমাসিক

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA. REGD.DA 20/76. April-June 2020

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA. REGD.DA 20/76. April-June 2020

THE ISLAMIC FOUNDATION PATRIKA. REGD.DA 20/76. April-June 2020

01 — ০২ — ০৩ — ০৪ — ০৫ — ০৬ — ০৭ — ০৮ — ০৯ — ১০ —
১১ — ১২ — ১৩ — ১৪ — ১৫ — ১৬ — ১৭ — ১৮ — ১৯ —
২০ — ২১ — ২২ — ২২ — ২৪ — ২৫ — ২৬ — ২৭ — ২৮ —
২৯ — ৩০ —

সূচিপত্র

- বাংলাদেশের মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সন্তানের অধিকার একটি পর্যালোচনা/০৫
  মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
- মহানবী (সা)-এর সামাজিক শিষ্টাচার নীতি : পর্যালোচনা/৩১
  ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল এবং মোঃ মিকদাদ সিদ্দিকী
- ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান ও জ্ঞানী : প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা/৫৫
  ড. আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ
- তারাবীহ নামায : একটি পর্যালোচনা/৭৬
  ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ
- মানব সৃষ্টি, প্রকৃতি ও প্রবণতা : পরিপ্রেক্ষিত আল-কুরআন/৯৬
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসাইন
- আল-কুরআনে সংখ্যাবিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা/১২০
  ড. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
- রমযান : পরিচিতি, প্রবর্তন ও উদ্যাপন/১৪৯
  ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা
- আরবি ব্যাকরণের পরিচয় ও ইসলামী শারী'আহ অধ্যয়নে এর প্রয়োজনীয়তা : একটি বিশ্লেষণ/১৭৮
  ড. মো: আব্দুর রহিম মুকুল
- محمد سلطان ذوق الندوى : خدمته فى اللغة العربية/১৯৩
  محمد عميم الاحسان

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি.

বাংলাদেশের মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সন্তানের অধিকার একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

[সার সংক্ষেপ: *ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সর্বশ্রেণির মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থা বিস্তারিত ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী একজন পুত্র মৃতের সম্পত্তির কন্যার অংশের দুইগুন বেশী সম্পদ পেয়ে থাকে। আধুনিক সমাজে এ নিয়ে অনেকেই ইসলামের ন্যায়বিচারের ধারণা নিয়ে কথা বলছেন। কন্যা সন্তানরাও একই পিতা-মাতারই সন্তান। কন্যাসন্তানরা ইসলামী শরীয়া ও বিদ্যমান উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পুত্রসন্তানের মীরাসী সম্পত্তির অর্ধেক কেন পায়, কোন বিবেচনায় আল্লাহ তায়ালা এ বিধান দিয়েছেন এ সম্পর্কে ধারণালাভ, উত্তরাধিকার সম্পত্তির পুত্র-কন্যাদের সম্পদে অধিকারের প্রকৃতি জানা এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পদ বণ্টনের প্রক্রিয়া অবগত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় কন্যাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাওয়ার ধরণ ও প্রকৃতি কেমন তা অনুসন্ধানের যৌক্তিতা রয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাই মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের আলোকে সন্তানের সম্পত্তিতে অধিকার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামে 'ওয়ালাদ' ঘোষণার মাধ্যমে পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করে সম্পত্তিতে অধিকার দিলেও মহান আল্লাহ পুত্রকে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদে একটু বেশী অংশ প্রদান করেছে।মানুষের সামগ্রিক জীবনে ইসলামের চর্চা থাকলে তা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।]*

মূলশব্দ: ইসলাম; উত্তরাধিকার; পুত্র-কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার; উত্তরাধিকার আইন।

১. ভূমিকা

আল-কুরআনে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকারীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থাপনায় বিস্তারিত বর্ণনার দরকার হয়নি। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন হচ্ছে সবচেয়ে বেশী যুক্তিসম্মত এবং পূর্ণাঙ্গ।[১] রাসূল (সা) ইসলামী উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের আইন সংক্রান্ত

* পিএইচ.ডি. গবেষক (ইউজিসি ফেলো), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাবি ও সহকারী অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা।

১ মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, অনুবাদ মুহাম্মদ আব্দুল মতিন জালালাবাদী, ৩য় সংস্করণ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ২০৭।

বিষয়টি অতিগুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে সম্পদ বণ্টন সংক্রান্ত এ জ্ঞানকে চিহ্নিত করেছেন 'জ্ঞানের অর্ধেক' হিসেবে।[২] আর তা হলো 'ইলমুল ফারায়িয'।[৩]

আল-কুরআনে বর্ণিত উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন প্রক্রিয়ায় একই শ্রেণির একজন পুত্র পায় দুইজন কন্যার সমান সম্পদ।

এ বিধানটি ইসলামে বর্ণিত ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের ধারণাগত জ্ঞানকে প্রশ্নবোধক করে তুলেছে; এখানে কন্যা সন্তানদের পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে ঠকানো হয়েছে–একশ্রেণির মানুষের মনে এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দেওয়ার প্রেক্ষাপটে কন্যাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনে প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত করা হয়েছে কি-না, বা পুত্র সন্তানদের তুলনায় তাদের সম্পত্তি কম দেওয়া হলো কেন; এটাই তাদের জিজ্ঞাসা।[৪]

অন্য দিকে কেউ কেউ মনে করেন, পুত্রদের সম্পদ বেশি দেওয়ার কারণ তাদের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন দায়িত্ব বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। যাবতীয় খরচের ভারও তাদের উপর; তাই তারা কন্যা সন্তানের চেয়ে দ্বিগুণ সম্পদ পাবে এটাই সঠিক ও অধিক যুক্তিযুক্ত।[৫] কারো কারো এমন ধারণা পোষণ করার প্রেক্ষাপটে–এ বিষয়ে আইনের বিশ্লেষণ, আইন প্রয়োগ ও চর্চায় সমাজের বাস্তবচিত্র গবেষণার মাধ্যমে তুলে আনা দরকার। পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কন্যা সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পাওয়ার বাস্তব চিত্র বা এর অনুশীলন কেমন, এ বিষয়ে অনুসন্ধানও জরুরি। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানরা তাদের পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হয়।[৬] কন্যা সন্তানরা তাদের

---

২ মহানবী(সা) আবূ হুরায়রাহ রা. কে উদ্দেশ্য করে বলেন: 'হে আবূ হুরায়রাহ। 'ফারাইয' শিক্ষা করো এবং তা শিক্ষা দাও। কেননা তা জ্ঞানের অর্ধেক। নিশ্চয়ই তা ভুলে যাওয়া হবে এবং আমার উম্মাত থেকে সর্বপ্রথম এটিই উঠিয়ে নেওয়া হবে। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, *আল হাকেম*, পৃ. ৫৫।

৩ ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত জ্ঞানকে জ্ঞানের একটি আলাদা শাখা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদীসে এর নাম দেয়া হয়েছে 'ইলমুল ফারায়িয' বা উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত জ্ঞান। হাদিসের গ্রন্থগুলোতে এ নামে আলাদা অধ্যায় রচিত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৪ ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর প্রতি রয়েছে চরম বৈষম্য,http://giasuddinonline.blogspot.com/2016/01/blog-post_19.html. Accessed on date, 15/07/2019.
নারীর অর্থনৈতিক অধিকার,https://www.muslimmedia.info/2017/05/09/womens-finacial-rights-in-islam. Accessed on date, 10/07/2019.

৫ ইমামুদ্দিন ইসমাঈল, *ইবনে কাছীর*, খণ্ড-১, (বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯০), পৃ. ৩৩।
মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ, *ইবনে মাজাহ* (বৈরুত:দার আল ফিকর, ২০০৩), পৃ. ৫৩১।

৬ মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, *ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ-২০০৯), আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, পৃ. ৪১২।

ভাইদের কাছে সম্পত্তি দাবি করলে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কের চরম অবনতি হয়।[৭] এ গবেষণার ফলে ইসলামে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের মূলভিত্তি, দৃষ্টিভঙ্গি, কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্রসন্তানকে কেনইবা বেশী দেওয়া হলো তা জানা যাবে। আবার কন্যা সন্তানের সম্পদে অধিকার ও বণ্টনের পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের সম্পদ প্রাপ্তির বাস্তব চিত্র নিয়ে সবিস্তার তুলে ধরা হয়েছে।

২. গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

'বাংলাদেশেরমুসলিম উত্তরাধিকার আইনে সন্তানের অধিকার: একটি পর্যালোচনা'শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রধানত পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবিস্তর জানা। উৎসগত শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী প্রবন্ধটিতে যে সকল তথ্য উপাত্ত তা মূলত দুই ধরনের। এর একটি হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত; যা সরাসরি কোরআন ও হাদীস। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহায়ক উপকরণ; প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট ইলমে ফিকহ বা ইসলামী আইনের বইসমূহ, বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ, পুস্তক আকারে প্রকাশিত উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত বই। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ও বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বিশ্লেষণপূর্বক আরবি শব্দগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বহুমাত্রিক প্রবাহের কারণে কোনো ব্যক্তির পুত্র ও কন্যা সন্তান রেখে মারা গেলে এ ভাই-বোনের পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে সম্পদ কীভাবে পাবে এবং এর পর্যালোচনা গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার স্বরূপ জানা ও জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।একটি দেশের নাগরিক হিসেবে বিশেষ করে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যাসন্তানের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কে জানা খুব দরকার। আলোচিত প্রবন্ধটিতে উত্তরাধিকারের পরিচয়, ইসলামে বর্ণিত পুত্র ও কন্যা সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ সংক্রান্ত বিধানের বিশ্লেষণ ও উত্তরাধিকার আইনের কন্যাসন্তানের অংশ কম পাওয়ার কারণ নির্ণয়ের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। আশা করা যায় মানুষের সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ গবেষণা অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে।

৩. উত্তরাধিকার আইন এর বিশ্লেষণ

৩.১.১ উত্তরাধিকার এর শাব্দিক অর্থ

উত্তরাধিকার শব্দটি বাংলা। এর আরবি প্রতিশব্দ হলো *ওয়ারিস*। এ শব্দটি মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের মূলগ্রন্থ এবং ইসলামের প্রধান মৌলিক গ্রন্থ আল-কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। ওয়ারিছ একবচন, বহুবচনে 'ওয়ারাছাহ'। যার বাংলা অর্থ-উত্তরাধিকারী, উত্তরসূরী, ওয়ারিছ বা ওয়ারিস, বংশধর ইত্যাদি।[৮] আরবি বর্ণ 'ওয়া-রা-ছা' শব্দমূল থেকে এসেছে

৭ মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা, নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটী কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতা: এসএম প্রিন্টার্স), পৃ. ৩০।

৮ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবি বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৮০।

'মীরাছ'। যার অর্থ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ অথবা সম্পদের মালিকানা তথা স্বত্বাধিকার। আল-কুরআনে স্বত্বাধিকার শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৯] আবার 'ওয়ারিসা' অর্থ উত্তরাধিকারী হওয়া এবং 'আওরাসা' অর্থ উত্তরাধিকারী বানানো। দু'ভাবেই এটি আল-কুরআনে এসেছে।[১০] মহান আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে একটি হলো 'আলওয়ারিস'।[১১] কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি 'ইরছু' (আলিফ-রা-ছা) শব্দমূল থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো– 'আল-আসলু' বা মূল। পুরাতন জিনিস বা পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। এর দ্বারা প্রতিটি জিনিসের অবশিষ্টাংশ বুঝানো হয়ে থাকে।[১২] 'ইরছু' বা উত্তরাধিকার বলতে কোনো একটি জিনিস একদল লোকের নিকট থেকে অন্য একদল লোকের কাছে হস্তান্তর করা বুঝানো হয়ে থাকে। এর দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বস্তুকেও বুঝানো হয়ে থাকে।[১৩] উত্তরাধিকারের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Inheritance, Succession।[১৪] এর অর্থ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ।[১৫] আর আইনের ভাষায় যে আইন দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কারো অধিকার নিশ্চিত হয় তাই উত্তরাধিকার আইন। এ আইনকে 'ইলমুল ফারায়েজ'.ও বলা

---

৯ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন, সে ব্যাপারে কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্যে ভালো। বরং এতে রয়েছে তাদের জন্যে অনিষ্ট। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করে, কিয়ামতের দিন তাই হবে তাদের গলার বেড়ি। মহাকাশ এবং এই পৃথিবীর স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে বিশেষভাবে খবর রাখেন।' আল-কুরআন ৩:১৮০।

১০ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সুলাইমান হয়েছিল দাউদের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী)', আল-কুরআন ২৭:১৬। অন্য আয়াতে এসেছেঃ আর তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি আমাদেরকে দেয়া ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে ওয়ারিস (স্বত্বাধিকারী) বানিয়েছেন এই পৃথিবীর। (আর এখন) জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা আমরা আবাস বানাবো। সৎকর্মশীল পুরস্কার কতো যে উত্তম!', আল-কুরআন ৩৯:৭৪।

১১ সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবার পর যেহেতু কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন, তাই এটি তাঁর গুণবাচক নাম। মুহাম্মদ ইবনে মুকরাম ইবনে মানজুর, *লিসান আল আরব* (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ২০০৩), পৃ. ৭৮। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 'নিশ্চয়ই পৃথিবীর এবং পৃথিবীর উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানাআমরই এবং তারা আমারইনিকট প্রত্যানীত হবে।' আল-কুরআন ১৯:৪০। মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, '(আরো স্মরণ করো) যাকারিয়ার কথা, সে তার প্রভুকে ডেকে বলেছিল, 'প্রভু! তুমি আমাকে (সন্তানহীন করে) রেখো না। তুমিই তো সর্বোত্তম ওয়ারিস।' আল-কুরআন ২১:৮৯। যেমন তিনি বলেছেন,'আল্লাহই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের উত্তরাধিকারী'। আল-কুরআন ৫৭:১০।

১২ আল-কামূস আল মুহীত, খ. ১,পৃ. ১৬৭।

১৩ আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ.১৬; হাশিয়াতুল বাকারী, পৃ. ১০।

১৪ আল-মাওরিদ, আরবী- ইংরেজী, ১ম সংস্করণ (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল মাল্লাইন, ১৯৮৮), পৃ. ৭৩,৭১১; *The New Encyclopadia Britannica,* 15th Edition (USA: 1986), v-6, p- 317.

১৫ *আল মুনজিদ ফীল লুগাতি ওয়াল আলাম*, ১৮তম সংস্করণ (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, ১৯৯৬), পৃ. ৮৯৫, জিবরান মাসউদ, আররায়েদ, ৭ম সংস্করণ (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল মাল্লাইন, ১৯৯৩), পৃ. ৮৬০।

হয়। ফারায়েজ আরবি শব্দ; শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো ফরজ যার বাংলা অর্থ অবশ্যপালনীয়, কর্তব্য, অনুমান, নির্দিষ্ট অংশ। এখানে নির্দিষ্ট অংশ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[১৬] যেহেতু একমাত্র উত্তরাধিকার আইনের নীতিমালা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত; সে কারণেই এ জ্ঞানকে ইলমুল ফারায়েজ বলা হয়েছে। মূল কথা হলো, হিসাব নিকাশের কিছু মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা; 'যার সাহায্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে হকদারদের প্রত্যেকের প্রাপ্যাংশ সম্পর্কে জানা যায়,'[১৭] তা হলো 'ইলমুল মিরাছ' বা উত্তরাধিকার বিজ্ঞান।

৩.১.২ পারিভাষিক অর্থ

উত্তরাধিকার বিজ্ঞান হলো ইসলামী আইন শাস্ত্র ও হিসাব শাস্ত্রের এ জাতীয় কিছু নিয়ম কানুন এবং সূত্রাবলী জানার নাম, যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে বণ্টনের নিয়ম পদ্ধতি জানা যায়।[১৮] জুরজানী বলেন, 'উত্তরাধিকার বিজ্ঞান হলো এমন বিদ্যা, যা দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পদ তার প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের নিয়ম পদ্ধতি জানা যায়'।[১৯] শাফেয়ী ও হাম্বলীদের কাজী আফজালুদ্দীন আল-খাওয়ানজী প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো, 'উত্তরাধিকার বণ্টনযোগ্য এমন একটি হক, যা কোনো জিনিসের মালিকানা স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুর পর আত্মীয়তা বা অন্য কোনো কারণে প্রাপকগণ পেয়ে থাকেন।'[২০] মূলকথা হলো ব্যক্তির মৃত্যুর পর যাঁরা তার সম্পত্তির ভাগ পান তাদেরকেই 'ওয়ারিস' বা উত্তরাধিকারী বলা হয়। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার রেখে যাওয়া পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার সন্তানদের হক বা অধিকার তৈরি হয়। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক অথবা নারী অথবা হিজড়া, সকল ক্ষেত্রেই নারী কিংবা পুরুষ দুই শ্রেণির উত্তরাধিকারী থাকতে পারে।

৩.২ আইন

আইন শব্দটি ফারসি। আব্বাসীয় যুগে সাধারণত কানুন, প্রথা, দেশাচার ও নিয়ম অর্থে আইন শব্দটি ব্যবহার হতো।[২১] কেউ কেউ শব্দটিকে আরবি বলেছেন। আরবি বর্ণ 'আইন, ইয়া

---

১৬ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী- বাংলা অভিধান*, ১ম সংস্করণ (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ৬০৯।

১৭ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ.৪৫৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ.২; আল আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৬২; আদদুররুল-মুখতার ও হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪৯৯।

১৮ ইমাম সিরাজুদ্দিন, মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রশিদ, *কাশফুর রাজি ফী হল্লে সিরাজী*, অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তাবি), পৃ. ৮।

১৯ তদেব, পৃ. ৪৫।

২০ আল আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ.১৬; হাশিয়াতুল বাকারী, পৃ. ১০।

২১ আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবনুন নাদীম, *আল ফিহরিস্ত* (বৈরুত : মাকতাবাতু খাইরাত, ২০০১), পৃ. ১১৮।

ও নুনের' সমন্বয়ে 'আইন' শব্দটি গঠিত। যার বাংলা অর্থ চোখ,[২২] ঝর্ণা,[২৩] আবার উপস্থিত বিষয়কে আরবীয়গণ আইন বলে থাকে।[২৪] আরবি আইন শব্দটির অর্থসমূহের সাথে পারিভাষিক আইন শব্দটির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা মানুষের চোখ যেমন করে সত্য সন্ধান করে; আইনও ঠিক তেমনিভাবে সত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকে। প্রবাহিত ঝর্ণা যেমন নিম্নস্থানের দিকে প্রবাহিত বা ধাবিত হয় ঠিক তেমনি ভাবে আইনও রাষ্ট্রের উচ্চপরিষদ থেকে পাস হয়ে নিম্নস্তর পর্যন্ত এর প্রয়োগধারা প্রবাহিত হয়।

আসলে এটি হলো 'এমন বিধিমালার সমষ্টি, যা কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধকৃত আইন বা প্রথা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং বিশেষ রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের সদস্য বা প্রজাদের উপর একে বাধ্যতামূলক হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।'[২৫] বিচার প্রশাসন কার্যে যে সকল নীতিমালা রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও প্রয়োগকৃত হয়ে থাকে তাই আইন। হোকারের মতে, 'যে কোন ধরনের বিধি বা প্রথা, যা দ্বারা কর্ম বা আচরণ তৈরি হয়, আইন শব্দটি সে সকল অর্থে ব্যবহার হয়'।[২৬] জন অস্টিন এর মতে, 'সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশই আইন'।[২৭] এটি 'একধরনের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা যা রাষ্ট্র বলবৎ করে'।[২৮]

আসলে মানুষের সামগ্রিক জীবনধারা যে বিধিবিধান ও নিয়ম পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয় তাই আইন। আর রাষ্ট্রীয় বিধানে আইন বলে ঐ বিধিবিধান ও নিয়ম পদ্ধতিকে বুঝায় যা সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত, যা সকলে পালন করতে বাধ্য এবং পালন না করলে শাস্তি পেতে হয়। তবে ইসলাম ধর্মের আলোকে বিশ্বাসীরা মনে করে আইন হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যোগসূত্রের সেতুবন্ধন। আর স্রষ্টা কর্তৃক অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব সৃষ্ট কোন বস্তু বা বিষয়ের নিয়ন্ত্রণের নিয়মকেই আইন বলে।[২৯]আল-কুরআনে এসেছে 'স্বর্গ ও মর্ত লোকের

---

২২ আল-কুরআন, ১৯:২৬।

২৩ আল-কুরআন, ৮৮:১২।

২৪ সম্পাদনা পরিষদ, *আল মু'জামুল ওয়াসিত* (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসাইনিয়া), পৃ ৬৪১।

২৫ Dorling Kindersley Limited and Oxford University Press (ed), Illustrated Oxford Dictionary (New York: Oxford University Press, Reprinted in India, 2007), p-457.

২৬ V D Mahajan, *Jurisprudence and legal Theory*, Fifth edition (Lucknow: Eastern Book Company, 1993), p. 28.

২৭ 'Law is the command of the sovereign', Hafiz Habibur Rahman, *Political science and Government,* Seventh Edition (Dhaka: Ideal Publication, 1970), p-94; V.D.Mahjan, p-29-30; R.C.Agarwal, Political Theory, 1st edition (New Delhi: S. chand & Company Ltd, 1976), Reprint, 2005, p.202.

২৮ "Law is the system of rights and obligation which the state enforces". Hafiz Habibur Rahman, p. 94; N. Jaypalan, *Political Theory* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributor, 1999), p. 60.

২৯ সিরাজুল ইসলাম তালুকদার, *আল-কুরানিক আইন* (ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী- ১৯৯৩), পৃ. ১।

সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই।'[৩০] উত্তরাধিকার আইন হলো একটি ইসলামী আইন। আর সে হিসেবে আব্দুর রহিমের মতে, 'আইন হলো একজন মুসলমানের সর্বব্যাপারে ধর্ম কিংবা নৈতিকতাবোধ যাহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণা প্রসূত'।[৩১] আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদে আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গবেষণাপ্রসূত যে সকল সার্বজনীন নিয়ম পদ্ধতি, ধ্যান ধারণা ও বিধান জনজীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যমে বলবৎ করা হয় তাকেই ইসলামী আইন বলে। মূলত এটি ঐশ্বরিক আইন। এটি আল-কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক। আল-কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়াও ইজমা ও কিয়াস আইনের উৎস; এ আইন মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং ভালো পথে পরিচালিত করে। পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী আইন হলো আল-কুরআন, আল-হাদীস, (ইজমা ও কিয়াসের স্বমন্বয়ে) ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার সামগ্রিক কার্য পরিচালনা করে। এটি কোনো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কর্তৃক জারিকৃত বা বিশেষ সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইন নয়। এ আইনের মূল বুনিয়াদ হলো ঈমান বা বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের পাশাপাশি মানবিক সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর তার ক্ষমতার স্বীকৃতিকে বুঝায়। তিনি মানবজাতির ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল বিধিনিষেধ তাঁর মনোনীত প্রেরিত মহানবীর উপর অবতীর্ণ করেছেন তাই ইসলামী আইন। এর উৎপত্তি ঘটে ইসলাম ধর্মের বিকাশের সাথে সাথেই।

৪. ইসলামপূর্ব আরবে পুত্র-কন্যার উত্তরাধিকার সম্পত্তিলাভের চিত্র

ইসলামপূর্ব আরব সমাজে জাহেলী রীতিনীতি প্রচলিত ছিলো। সে রীতি মোতাবেক নারী ও শিশু তাদের পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের উত্তরাধিকারী বলে পরিগণিত হতো না। নারীদের তারা পুরুষের অধীনস্থ সেবাদাসী বলে বিবেচনা করতো।[৩২] নারী ও শিশু সকল কাজের উপযোগী নয় বলে তাদেরকে উত্তরাধিকারী হওয়ার অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হতো। উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা ছিলো ঘোড়ায় চড়তে পারা, ভার বহন করতে পারা, যুদ্ধ ও নিজ গোত্রের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে পারা। তারাই উত্তরাধিকারী হতো যারা যুদ্ধ করতো ও

---

৩০ আল-কুরআন, ৭:৫।

৩১ আব্দুর রহিম, *ইসলামী আইনতত্ত্ব* (মাদ্রাজঃ ১৯৯১), পৃ. ৫০; আব্দুল মান্নান তালিব সম্পাদিত, *ইসলামী আইন ও বিচার*, প্রবন্ধকার, এমবি তাজ মোহাম্মদ, *ইসলামী আইন ও বিশ্বায়ন*, ৩য় সংখ্যা (ঢাকা: ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ২৮।

৩২ সৈয়দ জিল্লুর রহমান, *ইলমুল ফারায়েজ বা ইসলামে উত্তরাধিকার আইন*, পৃ. ১৩।

গনীমতের মাল আহরণ করতে পারতো।[৩৩] প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সন্তান, ভাই, ভাতিজা, চাচা প্রভৃতি পুরুষ আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী বিবেচিত হতেন।[৩৪]

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে উত্তরাধিকার সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করার চিত্র তুলে ধরেছেন এবং এর মাধ্যমে আরব সমাজের তৎকালীন কন্যা সন্তানকে বঞ্চিত করার চিত্রও ফুটে উঠেছে। জাহেলী সমাজকে তিরষ্কার করে তিনি বলেছেন, 'তোমরা উত্তরাধিকারের সকল সম্পদ ভক্ষণ করে ফেলো।'[৩৫] অতঃপর তিনি বিস্তারিতভাবে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে মৃতের সম্পত্তি বণ্টনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা তুলে ধরেছেন।[৩৬] 'সিহাহ সিত্তা'সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে এর বিভিন্ন দিক অলোচিত হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মা-বোন, শিশু ও কন্যাদের কোনো অধিকার ইসলামপূর্ব সমাজে ছিলোনা।

উহুদ যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম মীরাস বণ্টন সংক্রান্ত বিধান দানের মাধ্যমে ইসলামই সর্বপ্রথম শিশু ও নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সকলের প্রাপ্য অংশের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের প্রাপ্য অংশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কম হোক অথবা বেশি তাতে নারীদেরও প্রাপ্য অংশ রয়েছে। (উভয়ের জন্য) অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।'[৩৭]

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম উত্তরাধিকারী হিসেবে নারীরা সম্পত্তিতে অধিকার পেলো। পুরুষের ন্যায় নারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলো।পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যাবে, তাতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে, যা মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত– এ ঘোষণার মাধ্যমে ইসলামপূর্ব যুগে নারী বা কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার সম্পদ হতে বঞ্চিত হওয়ার রীতির অবসান হলো।আল্লাহ তা'আলা 'দুর্বল তথা শিশু এবং নারীদেরকে অত্যাচার ও নিগ্রহের কবল থেকে রক্ষা, তাদের প্রতি ইনসাফ ও অনুগ্রহের নির্দেশ দিয়ে এবং তাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন।'[৩৮] এ নির্দেশনার মাধ্যমে নীতিগতভাবে

---

৩৩ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামের পারিবারিক আইন*, দ্বিতীয় খন্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-২০১৬), পৃ. ৪৯৫।

৩৪ সৈয়দ জিল্লুর রহমান, *ইলমুল ফারায়েজ বা ইসলামে উত্তরাধিকার আইন*, পৃ. ১৩।

৩৫ আল-কুরআন ৮৯:১৯।

৩৬ আল-কুরআন ৪:১১-১২।

৩৭ আল-কুরআন ৪:৭।

৩৮ এ আয়াত প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ আলী আস্‌সাবূনী লেখেন, 'আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে দুই শ্রেণির দুর্বল তথা শিশু এবং নারীদেরকে অত্যাচার ও নিগ্রহের কবল থেকে রক্ষা করেছেন, তাদের প্রতি ইনসাফ ও অনুগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, ছোট-বড় বা নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নয়; বরং উত্তরাধিকার বণ্টনে তাদের

সকলের; বিশেষ করে নারী ও কন্যাদের তাদের পিতা-মাতার উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৫. ইসলামে পুত্র-কন্যার উত্তরাধিকার সম্পত্তি লাভের ধারাক্রম

ইসলামি জীবন বিধান পরিপূর্ণরূপে বিকাশলাভের প্রেক্ষাপটে আরব সমাজের এক নারী রাসূল (সা)-এর কাছে এসে সর্বপ্রথম এ অভিযোগ করেন যে, তার স্বামীর সকল সম্পদ তার ভাই নিয়ে নিয়েছেন অথচ তার দুইটি কন্যা সন্তান আছে। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের কোন নির্শেনা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসেনি। হাদীসে এসেছে–

> 'হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা)-এর কাছে সা'দ বিন রাবী'য় (রা)-এর স্ত্রী তার দু'জন মেয়েকে নিয়ে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্ররাসূল (সা), সা'দ বিন রাবী'য় আপনার সাথে উহুদ যুদ্ধে গিয়েছিলেন। সে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। এই তার দু'মেয়ে। তার সম্পদ তাদের চাচা নিয়ে গেছে; তাদের জন্য কিছুই বাকি রাখেনি। সম্পদ না থাকার কারণে তাদের বিয়েও দেয়া যাবে না। রাসূল (সা)বললেন, আল্লাহ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবেন। এর পরেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূল (সা)তাদের চাচার কাছে খবর পাঠিয়ে বললেন, সা'দের দু'মেয়েকে দু'তৃতীয়াংশ দিয়ে দাও এবং তাদের মাতাকে এক অষ্টমাংশ প্রদান কর। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা তুমি পাবে।[৩৯]

এ ঘটনা পরবর্তী নির্দেশনায় উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ বর্ণনায় মহান আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে বলেন,

> 'তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশনা হল এই যে, একজন পুত্র, দুইজন কন্যার সমান হিস্সা পাবে। কিন্তু কেবল কন্যা দুইয়ের অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তাদের জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ; তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ; এ সবই সে যা ওয়াসিয়ত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ,

---

প্রত্যেকেরই প্রাপ্য অংশ রয়েছে। তা পরিমাণে কম বা বেশি যাই হোক; বণ্টনকারী তাতে সন্তুষ্ট থাকুক বা না থাকুক।' মুহাম্মাদ আলী আস্সাবূনী, *আল মাওয়ারিস ফিশশারিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ ফি দাবিল কিতাব ওয়াসসুন্নাহ* (কায়রোঃ দার আল সাবূনী, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরী), পৃ. ৫৩।

৩৯ তিরমিযি-২০৯২ কিতাবুল ফারাইজ; ইবনু মাজাহ-২৭২০ কিতাবুল ফারাইজ; আল মুসতাদরাক-৭৯৫৪, কিতাবুল ফারাইজ; আবু দাউদ-২৮৯৩, বাবু মা জাআ ফী মীরাছিছ ছুলব।

> প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ; তোমরা যা ওয়াসিয়ত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোনপুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্রিয় ভাই বা বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশ; এটা যা ওয়াসিয়ত করবে তা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।'[৪০]

এ আয়াতে দুই কন্যার সমান একজন পুত্রের সম্পত্তি লাভের ঘোষণা এসেছে। আবার এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে 'যদি কারো শুধুমাত্র এক কন্যা থাকে তাহলে সে মৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পদের অর্ধেক পাবে, আর দুই কন্যা থাকলে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ পাবে।' বাকী সম্পদ তার অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ পাবে।

৬. ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সন্তানের সম্পদ লাভের মৌলিক ভিত্তি

ইসলামী বিধান মতে উত্তরাধিকারী আত্মীয়গণের মধ্যে কিছু আত্মীয়ের উত্তরাধিকার শর্তহীন ও প্রশ্নাতীত। যেমন, পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রী। এ তিন ধরনের মোট ছয় জন ব্যক্তির মধ্যে কোনো একজন মারা গেলে বাকি আত্মীয়গণ সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী গণ্য হন। এদেরকে বলা হয় 'আসহাবে ফুরুজ' নির্দিষ্ট অংশভোগী। আল-কুরআনে সন্তান 'ওয়ালাদ' শব্দ বলে পুত্র-কন্যাদের পিতা-মাতার সম্পত্তি প্রাপ্তিতে অন্তর্ভুক্তই শুধু করেননি, বরং অধিকার ও সম্পদ গ্রহণের বিষয়টি একইভাবে সুনিশ্চিত করেছেন।[৪১] কেউ ইচ্ছা করে পুত্র বা কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন না; আল্লাহ তা'আলা নিজের ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে সন্তান দিয়ে থাকেন।[৪২]আল্লাহ তা'আলার সৃজিত বান্দাহ হিসেবে পুত্র-কন্যা তাঁর কাছে উভয়ই সমান। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী

---

৪০ আল-কুরআন ৪:১১-১২।

৪১ 'তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশনা হল এই যে, একজন পুত্র, দুইজন কন্যার সমান হিস্‌সা পাবে।' আল-কুরআন ৪:১১-১২। 'ওয়ালাদ' শব্দের অর্থ সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু। সে জন্য 'ওয়ালাদ' শব্দের মাধ্যমে শিশুপুত্র, শিশুকন্যা বা লিঙ্গহীন অথবা হিজড়া সকল শিশুকে বুঝাবে। শাহ আব্দুল হান্নান, *কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার: একটি পর্যালোচনা*, বাংলাদেশ জার্নাল অব ইসলামিক থট, ভ-১১, নম্বর-১৬, জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৫, পৃ. ১৩১।

৪২ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।" আল-কুরআন ৪২:৪৯।

সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সম্পদের বণ্টন পদ্ধতি হবে-'একজন পুত্র দুইজন কন্যার সমান হিস্যা পাবে'- এ অনুসারে। 'সিয়াকে কালাম' বা বক্তব্যের ধরন দেখে বুঝা যায় যে, 'একজন পুরুষ দুইজন নারীর সমান হিস্যা হিসেবে' সন্তানেরা সমস্ত সম্পদ পাবে। আর এ সূত্র মতে একজন মাত্র পুত্র থাকলে সে সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক হবে, আবার শুধুমাত্র কন্যা থাকলে সেও সম্পূর্ণ সম্পদের মালিকানা লাভ করবে। কেননা, উত্তরাধিকারী না থাকার কারণে সম্পদ বণ্টনের প্রয়োজন নেই। আবার কারো কেবল এক বা একাধিক কন্যা সন্তান থাকলে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রথমত সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ কন্যা সন্তান বা সন্তানেরা পাওয়ার পর বাকী অবশিষ্ট সম্পদ '*রদ*'বা ফেরত হয়ে আবার কন্যারা পাবে।

ইসলামের প্রথম যুগের বিশেষ করে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়া সা'দ বিন রাবীয় (রা)-এর ভাই তার সকল পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করলে তার স্ত্রী রাসূল (সা)-এর কাছে অভিযোগ করার পর তার উত্তরে সূরা নিসার ১১-১২ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। এখানে কন্যা একজন হলে সম্পত্তির অর্ধেক আর দুই বা ততোধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ মীরাসী সম্পত্তি পাবে মর্মে ঘোষণা এসেছে। অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃতের ভাই-বোন পাবে। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থাপনার এটি প্রথম আল্লাহ প্রদত্ত বিধান।

বাংলাদেশে এ বিধানের উপর ভিত্তি করে মৃতের ভাই বা বোনেরা যদিও সম্পদ পেয়ে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এ বিধান সঠিক নয়; কারণ রাসূল (সা)-এর বিদায় হজ্জের পূর্বে উত্তরাধিকারের সর্বশেষ অবতীর্ণ 'কালালা' সংক্রান্ত আয়াতে মৃতের মীরাসী সম্পত্তির হকদার হবে তার ভাই-বোন যদি তিনি নিঃসন্তান হন মর্মে শর্তারোপ করা হয়েছে। সূরা নিসার ১৭৬ নং *কালালা*সংক্রান্ত আয়াতই প্রমাণ করে মৃতের সন্তান থাকাবস্থায় ভাই-বোন সম্পত্তি পাবে না।[৪৩]আর পুত্রের ন্যায় কন্যাও সন্তান হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে সূরা নিসার ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা যা রেখে যাবেন তাতে প্রত্যেককে মাওলা বানিয়েছি' মর্মে ঘোষণা দিয়ে পুত্রদের সাথে কন্যাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৪৪]আবার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের মতো নারীদেরও অংশ রয়েছে মর্মে সূরা নিসায় ঘোষিত

---

৪৩ 'লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাচ্ছেন , কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে।' আল-কুরআন: ৪:১৭৬।

৪৪ "আর পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা যা কিছু ছেড়ে যাবেন তাতে পুরুষ ও নারীর প্রত্যেককে আমরা মাওলা বানিয়েছি।" আল-কুরআন ৪:৩৩। এ আয়াতে বর্ণিত মাওলা শব্দের অর্থ অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকারী, যাকে অনেকেই 'আসাবা' নাম দিয়ে থাকেন। সুতরাং নির্দিষ্টভোগী অংশিদাররা অংশ নেওয়ার পর পুত্র সন্তানের মতো কন্যা সন্তানও আসাবা হিসেবে (অবশিষ্টভোগী হিসাবে) বাকী সম্পত্তি পাবে।

হয়েছে।[৪৫]আবার অনেক সাহাবীর মতামত ও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর হাদীসটিও এখানে প্রাসঙ্গিক; তিনি বলেছেন, সম্পদ মূলে সন্তানের জন্য। আল্লাহ তায়ালা সেখান থেকে পিতা-মাতা ও স্বামী-স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে হিস্যা দিয়েছেন।[৪৬] তার এ বক্তব্য 'সম্পদে সন্তানের হক বেশী' এ দাবীকে সত্যায়িত করে। সুতরাং কন্যা সন্তান থাকাবস্থায় মৃতের ভাই-বোন মীরাসী সম্পত্তি পাবে না। মৃতের ভাই-বোন মীরাসী সম্পত্তি পাবে কেবল মৃত ব্যক্তির নিঃসন্তান হওয়ার শর্তে। যা *কালালা*র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৭. পুত্র ও কন্যার অংশ

ইসলামের উত্তরাধিকার বণ্টনের ভাগী হবে তার ওয়ারিসগণ। আবূ হুরায়রাহ ((রা)) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রসিদ্ধ বাণী,

> 'আমি মুমিনদের প্রতি তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি দায়িত্ববান। অতএব, তাদের কেউ যদি এমন ঋণ রেখে মারা যায়, যা শোধ করার সামর্থ্য তার ছিল না, তাহলে তা শোধ করার দায়িত্ব আমার (তথা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যায়, সে সম্পদের ভাগী হবে তার ওয়ারিসগণ।'[৪৭]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশনা হল এই যে, একজন পুত্র, দুইজন কন্যার সমান হিস্‌সা পাবে।'[৪৮]এ আয়াতের মাধ্যমেই মূলত পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির হকদার হয় পুত্র-কন্যারা। আর সম্পদ পায় দুইজন কন্যার সমান একজন পুত্র।

৮. সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি

মীরাসের কুরআনিক নির্দেশনা গভীরভাবে দেখলে সহজেই বুঝা যায় যে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে মৌলিক নীতিমালাকে সামনে রেখেছে,তা হলো ব্যক্তির আর্থিক দায়ভার ও

---

৪৫ لِّلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّمِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا আল-কুরআন, ৪:৭।

৪৬ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রা. সহ কিছুসংখ্যক সাহাবী ও অন্য একদল ফুকাহার মতে সন্তান পুত্র হউক বা কন্যা; কোনো ধরনের সন্তানের উপস্থিতিতে ভাই-বোন কোনো উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হবেন না। যেমন হযরত আতা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইবনে আব্বাস বলতেন মালের হকদার হলেন সন্তানগণ। সেখান থেকে আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীদের জন্য কিছু সম্পদ ছিনিয়ে দিয়েছেন।" শাহ আব্দুল হান্নান, *কন্যাসন্তানের অধিকার: একটি সার্বিক পর্যালোচনা*, বাংলাদেশ জার্নাল অব ইসলামিক থট, ভ-১৭,নং-১৮, পৃ. ১৫৪। আব্দুর রাজ্জাক, *কিতাবুল ফারায়েজ*, (বৈরুত: দারুল কিতাব-১৯৭৮), পৃ. ৩৮। আল মুছান্নাফ, ভ. ৮, পৃ. ৪৫৮।

৪৭ মুহাম্মদ ইবনে ঈসমাঈল আল বুখারী, *আলজামি আসসাহীহ* (বৈরুত: দার ইবনে কাছির, ১৯৮৭), হাদীস নং- ৬৩৫০, পৃ. ৪৪২।

৪৮ আল-কুরআন ৪:১১।

তার চাহিদার বিবেচনা। সে বিবেচনায় একজন নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর।[৪৯] সে কখনো নিজের বাবা, কখনো ভাই, কখনো স্বামী আবার কখনো সন্তানের কর্তৃত্বাধীন থাকে। তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার পাশাপাশি নৈতিক দায়িত্ব থাকে তাদের উপর। ঐসব পুরুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা মেটানোর পাশাপাশি তাদের অধীনস্থ নারীদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবারও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য। অথচ ইসলামে বর্ণিত নির্দেশনায় কোনো নারীরই তার নিজের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার কথা তাকে ভাবতে হয় না। যেমন নিম্নে কিছু ধারণা উপস্থাপিত হলো−

৯.১নারীর অর্থনৈতিক ব্যয় নির্বাহের স্বরূপ

ব্যয় নির্বাহের দিক বিবেচনা করলে একজন নারীর অর্থনৈতিক জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা−

৯.১.১বিবাহপূর্ব সময়ে নারীর ব্যয়নির্বাহ

জন্মের পর থেকে নিয়ে বিবাহ পর্যন্ত একজন নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব তার বাবা কিংবা ভাইদের উপর। তাকে তার নিজের আর্থিক চাহিদা মেটানো নিয়ে এভাবে গলদঘর্ম হতে হয় না, যেভাবে হতে হয় তারই পরিবারের একজন পুরুষ সদস্যের। পুরুষটিকে তার নিজের সকল প্রয়োজন মেটাবার পাশাপাশি নিজের বিবাহ এবং সংসার গঠনের লক্ষ্যে আর্থিক প্রস্তুতি নিতে হয়। যেমন−

> আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যার ভরণপোষণ করলো, তাদেরকে শিষ্টাচার শেখালো, (সৎ পাত্রে) বিবাহ দানের ব্যবস্থা করলো এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করলো, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত।[৫০]

কোনো কোনো বর্ণনায় তিন জন বোন/দুই জন বোন এবং কোনো কোনো বর্ণনায় তিন কন্যা/ দুই কন্যা/এক কন্যার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বিষয়টি বাবা-ভাইসহ সকল অভিভাবককেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিবাহের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এ দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। তাছাড়া হাদীসে উল্লেখিত অব্যয়টি ব্যাপকার্থবোধক, যা দ্বারা এমন সরল অভিভাবককেই বুঝায়, যারা বোন কিংবা কন্যাদের ভরণ পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও বিবাহ প্রদানে নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখে। এমনকি ইসলামী শারীয়ার বিধান অনুযায়ী একজন পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার ব্যক্তিগত খরচাদি দিতে তার পিতা বাধ্য নন।[৫১] অথচ কন্যাটিকে বিবাহ দিয়ে স্বামীর

---

৪৯ আল-কুরআন ২:২৩৬; আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৪৭; মুসলিম, হাদীস নং ১০০২; মুসনাদ, হাদীস নং ৪২৩৭।

৫০ সুলাইমান ইবনে আল আসআস আবু দাউদ, আল সুনান, (বায়রুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৭), হাদীস নং- ৫১৪৭।

৫১ আল-কুরআন ৬:১৫২; ১৭:৩৪; ১৮:৮২।

দায়িত্বে না দেয়া পর্যন্ত পিতাতার যাবতীয় খরচ মেটাতে বাধ্য। পিতার অবর্তমানে তা করবে তার দাদা, চাচা, ভাই কিংবা অন্য কোনো পুরুষ অভিভাবক।[৫২]কিন্তু এমনও পরিবার আছে মৃত ব্যক্তি যেখানে তার স্ত্রী ও বড় কন্যার সাথে নাবালক সন্তান রেখে মারা যান এবং স্ত্রী ও বড় কন্যাটিকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির পিতা বা চাচা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করার কারণে অথবা কেউই না থাকার কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরী হয়। তখন স্ত্রী বা বড় কন্যাকেই যাবতীয় অর্থনৈতিক দায় দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ অস্বাভাবিক সংঘটিত পরিস্থিতি কারো দায়িত্ব অবহেলা বা শরয়ী বিধান অমান্যের ফলে হওয়ার ফলে মীরাসী সম্পত্তি বণ্টন বিবেচনায় কন্যাকে সংসারে বিশেষ অবদানের জন্য মীরাসী সম্পত্তির বেশী অংশ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। তবে পিতা-মাতা জীবদ্দশায় পুত্র-কন্যাদের মাঝে সম্পত্তি সমান ভাগ করে দিতে পারেন। এ ছাড়া জীবদ্দশায় কাউকে বেশী বা কম দিতে পারেন না।

৯.১.২বিবাহ পরবর্তী সময়ে নারীর ব্যয়নির্বাহ

বিবাহের পর স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব তার স্বামীর। উপরন্তু বিবাহোত্তর তার নিজের কাছে একটা রিজার্ভ ফান্ড থাকার ব্যবস্থা ইসলাম করেছে। সে তার স্বামীর কাছ থেকে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মোহরানা[৫৩] পেয়ে থাকে, যা তার জন্য নিঃসন্দেহে একটা আপদকালীন তহবিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌতুকের কারণে এবং সামাজিক বিভিন্ন প্রথা ও নিয়মের কারণে বিয়ের সময়ে এ মহর নির্ধারনের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে এবং তা সময়মতো স্ত্রীকে প্রদানের হার খুবই কম। অথচ স্ত্রীকে মহর প্রদান করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। মহান আল্লাহ বলেন,'আর তোমরা স্ত্রীদের মহর খোলামনে আনন্দচিত্তে দিয়ে দাও। তবে তারা নিজেরাই যদি সন্তুষ্টচিত্তে (মহরের) কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তবে তোমরাও সানন্দে তা গ্রহণ করতে পারো।'[৫৪]

অতএব, একজন কন্যা ছোট কিংবা বড় একটা ফাণ্ড নিয়ে এসে তার সাংসারিক জীবন শুরু করলো; অথচ দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলে হয়ত তার সে ফান্ডে কোনো দিনই হাতও দেওয়া লাগে না। পক্ষান্তরে যে লোকটির সাথে তার বিবাহ হলো সে হয়ত দীর্ঘদিন ধরে আয় রোজগার করে বিবাহের জন্য একটা ফাণ্ড জমা করেছিল। এবার সে ফাণ্ড থেকে সে তার স্ত্রীর মোহরানাসহ বিবাহের আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ মেটাতে বাধ্য। উপরন্তু, বিবাহের পর থেকে তার

---

৫২ তদেব।

৫৩ আরবী 'মহর' শব্দটিকে বাংলায় আমাদের সমাজে মোহরানা বলা হয়। বিবাহ করার জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে এই মহর প্রদান করা ফরয। মহর বিবাহের প্রাক্কালেই নির্ধারণ করে নিয়ে তা প্রদান করতে হয়। তবে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তা পরেও পরিশোধ করা যায়।

৫৪ আল-কুরআন ৪:৪।

স্ত্রীর যাবতীয় খরচ মেটাবার দায়িত্বও তারই উপর। স্ত্রীদের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বের কথা জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-

> তোমরা তাদের ভরণ পোষণ দেবে। সচ্ছল ব্যক্তি দেবে তার (আর্থিক) সচ্ছলতা অনুযায়ী, আর দরিদ্র ব্যক্তি দেবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচলিত নিয়ম ও যুক্তি সংগত পরিমাণে। এটি কল্যাণপরায়ণদের উপর আরোপিত একটি কর্তব্য।[৫৫]

আবূ মাসঊদ আল বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন-'মুসলিম যখন আল্লাহ্‌র নিকট সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় পরিবারের জন্য ব্যয় করে, তখন তা তার জন্য *সাদাকাহ* বলে গণ্য হয়।'[৫৬] এ ব্যাপারে 'আমর ইবন উমাইয়্যা (রা)-এর বর্ণনাটি আরো ব্যাপকার্থক। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, তুমি তোমার পরিবারের প্রতি যত ধরনের দায়িত্ব পালন করো, তা সবই *সাদাকাহ*।[৫৭]শুধু তাই নয়, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো স্বামী পরিবারের ভরণ-পোষণে গড়িমসি করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ন্যায়সংগতভাবে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তার সম্পদ থেকে ব্যয় করার ব্যাপারেও অনুমতি প্রদান করেছেন। অথচ স্বামীর অর্থ সঙ্কট থাকলেও স্ত্রীকে কখনো স্বামীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ইসলাম দেয়নি। তবে প্রয়োজনে ও পরিস্থিতির কারণে শরয়ী বিধান পালনের মাধ্যমে সঙ্কট মোকাবিলায় স্ত্রী অর্থ উপার্জনে ইসলামে কোন নিষেধ নেই।

৯.২অভিভাবক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব

পিতার অবর্তমানে সাধারণভাবে ছেলেই হলো সংসারের কর্তা। কিন্তু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ পরিবারেই ছেলে হয় সংসারের পরবর্তী কর্ণধার। পরিবারের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম তাকেই পরিচালনা করতে হয়। এসব বিবেচনা করেই মহান আল্লাহ পুত্রদেরকে কন্যাদের চেয়ে ভাগ বেশি দিয়েছেন। পুরুষদের এ বিশাল দায়িত্ব এবং এর কারণে তাদের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে সে কথা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণাও করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> 'পুরুষরা নারীদের অভিভাবক ও ব্যবস্থাপক। কারণ, আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া পুরুষরা তাদের (নারীদের) জন্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (কাজেই) সতী সাধ্বী স্ত্রীরা (স্বামীর)

---

৫৫ আল-কুরআন ২:২৩৬। আয়াতটিতে যদিও তালাকপ্রাপ্তাদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তা বিবাহ বন্ধনে থাকা স্ত্রীদের বেলায় বরং আরো বেশি প্রযোজ্য।

৫৬ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল নিসাপুরী, আল মুসনাদ আল সাহীহ (বায়রুতঃ দার ইয়াহইয়া আল তুরাদ আল আরাবি, ১৬১৫ হিজরী), হাদীস নং ১০০২।

৫৭ আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান, আল মুসনাদ আস সহীহ্ (বায়রুতঃ মুআস্‌সাসাতু আল রিসালাহ, ১৯৯৩), হাদীস নং ৪২৩৭।

> অনুগত হয়ে থাকে। তারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে হিফাযাত করে আল্লাহ তাদেরকে যা হিফাযাত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৮]

সুতরাং নারীদের উপর পুরুষদের অভিভাবকত্বের অন্যতম কারণ হচ্ছে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে পুরুষের ভূমিকা। এই ভূমিকা পালনের জন্য আর্থিক সচ্ছলতা অন্যতম প্রধান নিয়ামক বিধায় মহান আল্লাহ সম্পদ বণ্টনে পুরুষদেরকে নারীদের তুলনায় মীরাসী সম্পত্তিতে অধিক অংশ দিয়েছেন। মূলত এ কারণেই একজন ভাইকে ইসলাম তার বোনের তুলনায় মীরাসী সম্পত্তির ভাগ বেশি দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শাইখ মুহাম্মদ 'আলী আস্ সাবূনী (রহ) একটি সুন্দর উদাহরণ টেনেছেন। তিনি বলেছেন-

> কোন ব্যক্তি যদি তার মৃত্যুকালে তিন হাজার রিয়াল[৫৯] এবং একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে যায়। ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান মতে, ছেলেটি এখান থেকে দুই হাজার রিয়াল এবং মেয়েটি এক হাজার রিয়াল পাবে। এমতাবস্থায় ছেলেটি যদি বিবাহ করতে গিয়ে তার নববধুকে দুই হাজার রিয়াল মোহরানা দিয়ে দেয়, তাহলে সে রিক্তহস্ত হয়ে যায়। অপরদিকে মেয়েটির বিবাহ হলে সে তার স্বামীর কাছ থেকে দুই হাজার রিয়াল মোহরানা পেল। বাবার থেকে প্রাপ্ত এক হাজারের সাথে এখন আরো দুই হাজার মিলে সে মোট তিন হাজার রিয়ালের মালিক হলো। অথচ তার ভাই পিতার সম্পদ থেকে তার দ্বিগুণ পেয়েও এখন রিক্তহস্ত। এরই মাঝে তাকে সংসারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে বোনের তিন হাজার রিয়াল সংরক্ষিত থেকে যাবে। কারণ কোনো প্রকার আর্থিক দায়ভারই তার উপর নেই।[৬০]

৯.৩সময়ের বিবেচনায় উত্তরাধিকারের অবস্থান

এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ 'আম্মারাহ মীরাস সংক্রান্ত ড. সালাহ উদ্দীন সুলতানের বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন, মীরাস বণ্টনের বেলায় যে তারতম্য তা নারী কিংবা পুরুষ বিবেচনায় নয়; বরং তার ভিত্তি হলো তিনটি;

এক.মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসের নৈকট্যের (সম্পর্কের) স্তর। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সাথে ওয়ারিসের সম্পর্ক যত কাছের হবে মীরাসী অংশে তার প্রাপ্যও তত বেশি হবে।

---

৫৮ আল-কুরআন, ৪:৩৪।

৫৯ সৌদি আরবে প্রচলিত মুদ্রাকে রিয়াল বলে।

৬০ মুহাম্মদ আলী আল সাবূনী, *আল মাওয়ারিস ফিশশারিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ ফি দাবিল কিতাব ওয়াসসুন্নাহ*, (কায়রো: দার আল সাবূনী, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরী), পৃ. ২০।

দুই. সময়ের বিবেচনায় উত্তরাধিকারীদের অবস্থান। অর্থাৎ যেসব উত্তরাধিকারীর জীবনকাল সামনে চলমান তথা যাদের আয়ুষ্কাল সাধারণভাবে বেশি হওয়ার কথা, তাদের মীরাস বেশি। পক্ষান্তরে যাদের জীবনকাল পিছনে চলমান তথা যাদের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাবার পথে, তাদের মীরাস কম। এক্ষেত্রে পুরুষ কিংবা নারীর কোনো বিষয় নেই। যেমন, মৃতব্যক্তির মেয়ে তার (মৃতব্যক্তির) মায়ের চেয়ে ভাগ বেশি পায়; অথচ তারা দুইজনেই নারী। এমনকি সে (মেয়ে) মৃতব্যক্তির পিতার চেয়েও ভাগ বেশি পায়। একইভাবে ছেলে পিতার চেয়ে ভাগ বেশি পায়; অথচ তারা দুইজনেই পুরুষ।

তিন.ইসলামী শারীয়াহ যেসকল অর্থনৈতিক দায়ভার কোনো ওয়ারিসের উপর আরোপ করে সে বিবেচনায়ও মীরাস বণ্টনে তারতম্য হয়।[৬১]

এগুলোই হলো মীরাস বণ্টনে নারী এবং পুরুষের মধ্যে তারতম্যের আসল ভিত্তি। মহান আল্লাহ একটি ছেলেকে দুইটি মেয়ের সমান ভাগ দিতে বলেছেন। কারণ ছেলেটি এখানে মেয়েটির সমস্তরের হওয়া সত্ত্বেও তার উপর অন্য একটি মেয়ে তথা তার স্ত্রীর দায়িত্ব বর্তিয়েছে। অথচ মেয়েটির ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পড়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি পুরুষ তথা তার স্বামীর উপর। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ছেলেটির প্রতিও জুলুম করেনি; বরং মেয়েটিকে আরো মর্যাদাবান করেছে এভাবে যে, আপদকালে তার জন্য একটি অর্থনৈতিক অবলম্বনের ব্যবস্থা করেছে। তবে এই ছেলে ও মেয়ের মাঝে ২ঃ১ এর ভিত্তিতে সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি শুধুমাত্র মীরাসী সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তি কোন কিছু সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দিতে চাইলে সমান দুইভাগ করে দিতে হবে। কোনক্রমেই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। ব্যক্তির মৃত্যু পর মীরাসী সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থাপনায় ২ঃ১ এর বিধান মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশনা। এই নির্দেশনা বর্ণনার শেষে সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের শেষে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন এই বলে যে ‘উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও, নিশ্চয়ই এটি আল্লাহ্‌র বিধান’।[৬২] আর উক্ত সূরার ১৩ এবং ১৪ নং আয়াতে এই বিধানকে সীমা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তা পালনের আবশ্যকতা এবং পালনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ এবং এই বিধান না মেনে সীমালংঘন করলে স্থায়ী জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে।[৬৩]

১০.পুরুষদেরকে সম্পদের ভাগ বেশি দেয়ার কারণ বিশ্লেষণ

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানে পুরুষ উত্তরাধিকারীদেরকে কোথাও কোথাও নারী উত্তরাধিকারীদের তুলনায় অংশ বেশি দেয়া হয়েছে।

---

৬১ সালাউদ্দিন সুলতান, *মীরাস আর মারআত ওয়া কাদিয়া আল মুসাওয়াত*, (কায়রোঃ দার নাহদা আলমিসর, ১৯৯৯), পৃ. ৩-৫।

৬২ আল-কুরআন ৪:১১।

৬৩ আল-কুরআন ৪:১৩-১৪।

তবে সে ক্ষেত্রে মহামহিম স্রষ্টার বিজ্ঞানময় ও ইনসাফপূর্ণ বিধানের ব্যাপারে বিশ্বাসের কমতি থাকলে সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই কোথায় কোথায় এবং কেন একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীকে মীরাসী সম্পত্তি বেশি দেয়া হলো তা জানা প্রয়োজন। উত্তরাধিকার বণ্টনে ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গিটি সামনে রেখেছে তা হলো– মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের দিক থেকে কে আগে এবং কে পিছে? কার প্রতি মৃত ব্যক্তির দায়ভার কী পরিমাণ ছিল?এবং মৃত্যুর পর ঐ মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া ওয়ারিসদের ব্যাপারে কার দায়বদ্ধতা কতটুকু?অথবা সে বেঁচে থাকলে তার প্রতি কার দায়িত্ব কর্তব্য বেশি ছিল? ইত্যাকার বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শাইখ সাবূনী[৬৪] প্রশ্নের অবতারণা করে বলেন, একজন নারী পুরুষের তুলনায় (শারীরিকভাবে) দুর্বল বিধায় সে অর্থের অধিক মুখাপেক্ষী, তবুও ইসলাম কেন তাকে পুরুষের অর্ধেক ভাগ দিলো? এমন প্রশ্নের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এরপর তিনি এর জবাব দিয়ে বলেন- ইসলামী শারী'আয় মীরাস বণ্টনে নিঃসন্দেহে বহুবিধ হিমকাত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচটি হিকমাত তথা কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। আর তা হলো-

এক. একজন নারীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও চাহিদা সীমাবদ্ধ না হলেও অর্থনৈতিক ব্যয় নির্বাহের বাধ্যবাধকতায় তিনি পুরুষের তুলনায় অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। কেননা, তার ব্যয়নির্বাহের দায়িত্ব তার স্বামীর, ছেলের, অথবা পিতার, কিংবা ভাইয়ের, অন্যথায় অপর কোনো নিকটাত্মীয় পুরুষের। মহান আল্লাহ বলেন: '(বাচ্চার পিতার অবর্তমানে স্তন্যদানকারীণী মায়ের প্রতি) ওয়ারিসদের দায়িত্ব কর্তব্য তার (পিতার) অনুরূপ।'[৬৫]এ প্রসঙ্গে সাহীহ এবং সুনানের প্রায় সকল গ্রন্থেই হাদীস এসেছে। ইমাম তিরমিযীসহ কেউ কেউ এ নিয়ে আলাদা অধ্যায়ও রচনা করেছেন। ইবনুল মুনকাদির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী স. বলেছেন:

> কারো যদি তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন থাকে এবং সে তাদের ব্যয়ভার বহন করে, তাদেরকে আশ্রয় দেয়, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা বললেন যদি দুইজন হয়? তিনি বললেন: যদি দুইজন হয়, তবুও। তারা (বর্ণনাকারীগণ) বলেন, আমাদের মনে হয় তারা একজনের কথাও বলেছেন।[৬৬]

দুই. পুরুষের ন্যায় অপর কারো ব্যয়নির্বাহের দায়িত্বও নারীর উপরে নেই। অথচ নিজের পরিবারসহ নিকটাত্মীয়দের ব্যয় নির্বাহ করা একজন পুরুষের উপর ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

---

৬৪ মুহাম্মদ আলী আল সাবূনী, *আল মাওয়ারিস ফিশশারিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ ফি দাবিল কিতাব ওয়াসসুন্নাহ*, (কায়রো: দার আল সাবূনী, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরী), পৃ. ১৮-১৯।

৬৫ আল-কুরআন ২:২৩৩।

৬৬ আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হুমাম আল সানানী, আল মুসান্নাফ, (বায়রুত: আল মাকতাবাহ আল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৩ হিজরী), হাদীস নং-১৬৯৭।

> সামর্থ্যবানরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয়ভার নির্বাহ করবে। আর যার জীবিকা সীমিত, সে ব্যয় করবে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকেই। আল্লাহ যা দান করেছেন তার চেয়ে বেশি বোঝা তিনি কোনো ব্যক্তির উপর চাপান না। আল্লাহ কাঠিন্যের পর সহজতা দান করেন।[৬৭]

তিন. একজন পুরুষের আর্থিক দায়ভার অনেক। তাই তার অর্থনৈতিক চাহিদাও একজন নারীর তুলনায় অনেক বেশি। পুরুষের দায়ভার বিষয়ক মহান আল্লাহ্‌র বাণী পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[৬৮]

চার. একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতে হয়। তাছাড়া স্ত্রী এবং সন্তানদের বাসস্থান ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও তাকেই করতে হয়। এমনকি স্বামীর অবর্তমানেও সে আশ্রয়হীন/বিপদগ্রস্ত নয়। পুরুষের উপর মোহরানা আদায়ের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ সম্বলিত আয়াত ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

> সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো সন্তানের মায়ের খাওয়া পরার ব্যয়ভার বহন করা ন্যায়সংগতভাবে। কারো উপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো ঠিক নয়। কোনো মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না এবং কোনো পিতাকেও তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না। (সন্তানের পিতার অবর্তমানে স্তন্যদানকারিণী মায়ের প্রতি) ওয়ারিসদের দায়িত্ব কর্তব্য তার (পিতার) অনুরূপ।[৭০]

পাঁচ. পরিবারের সকলের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয়ভারও একজন পুরুষকেই বহন করতে হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণিত উপর্যুক্ত দলীলাদি ছাড়াও আরো বিভিন্ন দলীয় বিদ্যমান। যেমন জাবির (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ

> ‘যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করলো, তাদের সকল প্রয়োজন মেটালো, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং সদাচরণ করলো, সে জান্নাতে যাবে। (বর্ণনাকারী বলেন) অথবা তিনি বলেছেন, যে আমার সাথে জান্নাতে যাবে।’[৭১]

অতএব, এটিই ইনসাফের দাবি যে, পুরুষটির আর্থিক দায়ভার যেহেতু বেশি, তাই তাকে সম্পদের ভাগও দেয়া হবে বেশি। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, মহান আল্লাহ একজন পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ উত্তরাধিকার দেয়ার পাশাপাশি একজন নারীকেও পরম দয়া ও অনুগ্রহে আচ্ছাদিত

---

৬৭ আল-কুরআন ৬৫:৭।

৬৮ আল-কুরআন ২:২৩৬।

৬৯ আল-কুরআন ৪:৪।

৭০ আল-কুরআন ২:২৩৩।

৭১ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি শাইবা, আল মুসান্নাফ, (রিয়াদঃ মাকতাবাহ আল রুশদ, ১৪০৯ হিজরী), পৃ. ৭১-৭২।

করেছেন। সে উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে ঠিকই শামিল হয়; কিন্তু সম্পদ আহরণের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে সে বাধ্য নয়। সম্পদ ব্যয়ের কোনো খাতই তার উপর বর্তায় না; অথচ সে তার ভাগ নিয়ে তা সঞ্চয় করতে পারে।

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়ও স্পষ্ট করে নেয়া প্রয়োজন যে, সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম একজন পুরুষকে নারীর তুলনায় সম্পদের ভাগ বেশি দেয়নি। ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানে সাধারণ নিয়মে নারী ও পুরুষের মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি ধারা রয়েছে।[৭২]

১. কখনো কখনো একই স্তর এবং অভিন্ন অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ সদস্যটি অংশীদার হয় না; অথচ নারী সদস্যটি অংশীদার হয়ে থাকে। যেমন-

ক. মৃতব্যক্তির নানা-নানী জীবিত থাকলে নানা উত্তরাধিকারী হবে না; কিন্তু নানী তার উত্তরাধিকারিণী হবে।

খ. মৃতব্যক্তির দৌহিত্র (মেয়ের ঘরের ছেলে) অংশ পাবে না; কিন্তু তার পৌত্রী (ছেলের ঘরের মেয়ে) অংশ পাবে। ইসলামের উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালায় মহিলা অংশীদারদের অগ্রাধিকার প্রাপ্তির এটি আরেকটি বাস্তব উদাহরণ।

২. কখনো কখনো নারী এবং পুরুষ সমান অংশীদারও হয়। যেমন–মৃতব্যক্তির পিতা-মাতা এবং সন্তানাদি না থাকলে তার ভাই-বোন উভয়েই সমান অংশ পায়। আল-কুরআনে এসেছে:

> যদি এমন কোনো পুরুষ বা নারী মারা যায়, যার সন্তান নেই এবং বাবা-মাও বেঁচে নেই, তবে (বৈপিত্রেয়) একজন ভাই এবং একজন বোন আছে, সে ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই ছয়ের এক অংশ পাবে। কিন্তু একাধিক হলে তারা প্রত্যেকেই এক তৃতীয়াংশে সমান অংশীদার হবে। এসব বণ্টন হবে (মৃতব্যক্তির) ওসীয়াত ও ঋণ পরিশোধ করার পর।[৭৩]

বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ 'আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.) রহ. বলেন: 'আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, এই আয়াতে ভাই-বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনকে বুঝানো হয়েছে।[৭৪]

৩. আবার কখনো কখনো নারী পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়। যেমন-

মৃতব্যক্তির কন্যা এবং বোন তাদের সাথে ভাই থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পাবে। কেননা মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে ওসিয়াত (নির্দেশ) করছেন; এক ছেলে সন্তান পাবে দুই মেয়ে সন্তানের সমান।[৭৫]

---

৭২ মুহাম্মদ আব্দুর রাহমান, ইসলামে উত্তরাধিকার আইন, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), পৃ. ৭১-৭২।

৭৩ আল-কুরআন ৪:১২।

৭৪ মুহাম্মদ ইবনে আলী আস-সাওকানী, ফাতহুল ক্বাদীর, (বায়রুত: আল মাক্বতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, ১৯৯৬), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৭।

৭৫ আল-কুরআন ৪:১১।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের এ বণ্টন নীতিতে ভাই তার বোনের চেয়ে দ্বিগুণ সম্পদ পেয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত আর্থিক দায়ভার ও দায়িত্ব কর্তব্যের কথা বিবেচনা করেই একজন পুরুষকে মহান আল্লাহ উত্তরাধিকার বণ্টনে একজন নারীর তুলনায় বেশি দিয়েছেন। এটি অত্যন্ত যৌক্তিক এবং ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দাবী। এখানে আরো একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, ভাই/ছেলেকে ইসলাম যাবিল ফুরূয বানায়নি; অথচ বোন/মেয়েকে যাবিল ফুরূয বানিয়েছে। ভাই/ছেলেকে বানিয়েছে 'আসাবাহ বা অবশিষ্টভোগী। অর্থাৎ যাবিল ফুরূযদেরকে দেওয়ার পর যা থাকবে তা তারা পাবে। তাছাড়া ভাই-বোন বা ছেলে-মেয়ে একসাথে থাকলে যেহেতু বোন এবং মেয়েটিও তার ভাইয়ের সাথে 'আসাবাহ হয়ে যায়, এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভাই/ছেলেটিকে অতিরিক্ত আর্থিক দায়ভার দেয়ার কারণেই এখানে তার ভাগ বেশি দেয়া হয়েছে।

১১.পুরুষদের সম্পদ বেশী দেওয়ার ক্ষেত্র বিশ্লেষণ

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে একজন পুরুষ প্রধানত তিনটি জায়গায় নারীর তুলনায় সম্পদের অংশ বেশি পেয়ে থাকে। আর তা হলো:

এক. তার বাবা-মার রেখে যাওয়া সম্পদে সে তার বোনের তুলনায় ভাগ বেশি পায়।

দুই. সে তার ভাই/বোনের রেখে যাওয়া সম্পদে বোনের তুলনায় ভাগ বেশি পায়। এটি নিছক এ কারণেই যে, তার নিজের এবং তার অধীনস্থ অনেকের দেখাশুনার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে যে বোনের চেয়ে তাকে বেশি ভাগ দেয়া হলো তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বেও এই ভাইটির উপরেই ন্যস্ত।

তিন. স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার সম্পদে যে ভাগ পায়, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তার সম্পদে সে তুলনায় বেশি ভাগ পায়। এক্ষেত্রেও স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদে স্বামীর ভাগ বেশি হওয়ার যুক্তি হলো- স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার প্রতি এই স্বামীই সবচেয়ে বেশি আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ করেছিল এবং মৃত্যুর পরও তার রেখে যাওয়া ওয়ারিসদের দেখাশুনার দায়িত্ব তাকেই বেশি পালন করতে হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে স্ত্রীকে অনেক বেশি ভাগ দিলেও তা তার জীবদ্দশায় ঐ মৃত স্বামীর ঊর্ধতন কিংবা অধঃস্তন ওয়ারিসদের বেলায় তত বেশি কাজে লাগার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। পক্ষান্তরে তার মৃত্যুর পর ঐ সম্পদের অধিকাংশ নির্ধারিত অংশের প্রাপক হবে তার পিতৃকূলের আত্মীয়গণ এবং তার পরবর্তী স্বামী। সম্পদ বণ্টন সংক্রান্ত বিধান নাযিলের এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

> "তোমরা তো জানো না, তোমাদের বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে তোমাদের জন্য লাভের দিক থেকে কে বেশি নিকটবর্তী? (উত্তরাধিকার বণ্টন এবং বণ্টনের এই হার) মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী।"[৭৬]

---

৭৬ আল-কুরাআন ৪:১১।

আয়াতটির শুরুতে মা-বাবা ও সন্তান-সন্ততির মীরাস বর্ণনার পর পরবর্তী আয়াতে অন্যান্য ওয়ারিসের বর্ণনার আগেই মাঝখানে একথা বলে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, তাঁর বণ্টন নিয়ে কোনোরূপ সংশয় কিংবা প্রশ্নারোপ করার অবকাশ নেই। তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। পরবর্তী আয়াতে আরো কতক ওয়ারিসের সম্পদ বণ্টনের পর তিনি আশ্বস্ত করলেন যে:

> এগুলো (মীরাসের ব্যাপারে) আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমানা। আর যে কেউ (এক্ষেত্রে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই মহাসাফল্য।[৭৭]

পরক্ষণে তিনি আবার কঠোর শাস্তির ব্যাপারে পূর্বাভাস দিয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, এ বিধান তাঁর রচিত। সুতরাং এর বিরোধিতা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করবে এবং তাঁর (আল্লাহ্র নির্ধারিত) সীমানা লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্যে রয়েছে অপমানকর আযাব।'[৭৮] অতএব, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা; এখানে খণ্ডিত কোন বিশেষ বিধানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সামগ্রিক দৃশ্যায়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জরুরী।তাহলে কোন ধরনের বিভ্রান্তি থাকবে না। তার কারণউত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধান মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এ বিধান নিসংকোচে মেনে নিতে হবে। সার্বিক বিচার একথা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদেরকে কোনোরূপ বঞ্চিত করা হয়নি। নিজের ভরণ-পোষণ এবং বিবাহের মোহরানা ছাড়াও একজন নারী ঐ সকল খাত থেকেই উত্তরাধিকার পান, যেসকল খাত থেকে একজন পুরুষ উত্তরাধিকার পেয়ে থাকেন। ভাই না থাকলে তিনি নিজের নির্ধারিত অংশ নিশ্চিতরূপে পেয়ে থাকেন। যখন ভাই (পিতা/স্বামীর অবর্তমানে তার অভিভাবক) থাকেন, তখন তিনি সেই ভাইয়ের সাথে 'আসাবাহ হিসেবে অবশিষ্ট সম্পদের ন্যায্য ভাগী হন।

১২. বাংলাদেশে কন্যাসন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাওয়ার চিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনদেরকে উত্তরাধিকারী গণ্য করে সম্পদের হিস্যা প্রদান করা হয়। এটা অন্যায় এবং একটি বিতর্কিত বিষয়।[৭৯] বিদ্যমান মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে কন্যা একজন হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুইভাগের এক, আর কন্যা দুই বা দুইয়ের অধিক হলে তিন

---

৭৭ আল-কুরাআন ৪:১৩।

৭৮ আল-কুরাান ৪:১৪।

৭৯ সৈয়দ জিল্লুর রহমান, *ইলমুল ফারায়েজ বা ইসলামে উত্তরাধিকার আইন* (সিলেট: দারুল আনওয়ার প্রকাশনী-২০০৮), পৃ. ১৬৩-৬৪।

ভাগের দুই ভাগ সম্পদ পাবে। বাকি সম্পত্তির অংশ পাবে মৃতের ভাই বা তার সন্তানেরা। মৃতের ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ভালো না থাকলেও বিধি মোতাবেক সে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সম্পদ লাভ করে 'আসাবা' হিসেবে। অথচ বিষয়টি ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[৮০] আবার পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকে অধিকাংশ কন্যা সন্তানেরা ভাই বা ভাইয়ের সন্তানদের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তাদের প্রদত্ত অধিকার যথাযথ ভোগ থেকে বিরত থাকে।[৮১] 'দুইজন কন্যার অংশের সমান একজন পুত্রের অংশ' হিসেবে যে অংশ কন্যা সন্তান পাওয়ার কথা তাও কন্যা সন্তান পায়না। ড. আবুল বারকাত Accessing Inheritance Law and Their Impact on Rural Women in Bangladeshশীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন,

> উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সম্পত্তিতে নিজের অধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ নারীই কিছু জানেন না। যারা জানেন তাদের সংখ্যা দুই থেকে চার শতাংশের বেশি নয়। মুসলিম গ্রামীণ নারীর মধ্যে মাত্র ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ নারী উত্তরাধিকার সম্পত্তির ভাগ পান। তবে তারা বেশিরভাগ সময়ই তাদের প্রাপ্য জমির চেয়ে কম পান।[৮২]

বিষয়টি ইসলামী আইনের সরাসরি লংঘন এবং মানবিকতার দৃষ্টিতে ঘোরতর অন্যায়। ক্ষেত্র বিশেষে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতকারীরা পরকালে জান্নাত থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবে।[৮৩] আধুনিক এ যুগের চিন্তাশীল বিশ্বাসী মানুষকে এ নৈরাজ্যকর অবস্থা ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। পিতার সম্পত্তিতে নারীর এই নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার অধিকার ইসলামী আইনে স্বীকৃত। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমাদের দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলেই নারীরা তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত।[৮৪]আল-কুরআন ও ইসলামী উত্তরাধিকার আইন অনুসারে কন্যাসন্তানকে সম্পত্তির অংশ দেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও শহরে বা গ্রামে বাস্তবে তারা এর সুফল পায় না।[৮৫] দেশের প্রায় সবখানেই কন্যাসন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার একটি ট্র্যাডিশন তৈরি হয়ে গেছে। কোনো কোনো সমাজে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের

---

৮০ শাহ আব্দুল হান্নান, *অবশিষ্টাংশভোগী উত্তরাধিকার: মাওলা ও মাওয়ালী বনাম আসাবা*, বাংলাদেশ জার্নাল অব ইসলামিক থট, ভলি ১১, নাম্বার ১৬, জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৫, পৃ. ১১৩।

৮১ *Women's Inheritance Rights to Land and Property in South Asia: A Study of Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, and Srilanka,* A report by The Rural Development Institute (RDI), for the World Justice Project, December-2009.

৮২ https://samakal.com/todays-print-edition/tp, Accessed on date, 12/07/2019.

৮৩ রাসূল (সা) বলেছেন, "যে লোক তার কোনো উত্তরাধিকারীর অধিকারকে ছিন্ন করার জন্য দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাতের অধিকারকে ছিন্ন করবেন।" ইবনু মাজাহ, হাদীস নং- ২৬৯৪।

৮৪ Kazi Arshadul Hoque and Others, *Inheritance rights of women in Islamic law: An assessment*,International Journal of Islamic Thoughts, v.2, n. 2, (Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought-2013),p. 54.

৮৫ N. Keddie, `Introduction'in N. Keddie and B.Baron (eds), *Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender,* Yale University Press, p. 6.

সময় নিয়মানুসারে নারীকে তার অংশ দেওয়া হয়; কিন্তু নারী তার সম্পত্তি গ্রহণ না করে ভাইদের জন্য তার অংশটুকু ছেড়ে দেন এই ভয়ে যে, পিতার সম্পত্তির অংশগ্রহণ করলে ভাইদের কাছে ভবিষ্যতে বোনদের আর কোনো দাবি-দাওয়া থাকবে না।[৮৬] কোনো অঞ্চলে আবার কন্যাসন্তানদের বঞ্চিত করা হয় ভিন্ন প্রতারণার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সম্পত্তি হস্তান্তর না করে নামেমাত্র কিছু টাকা নামে মাত্র মূল্য হিসেবে দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয় নারীদের।[৮৭] যা সম্পূর্ণরূপে অন্যায় এবং ইসলামী নীতি ও আদর্শবিরোধী কাজ।

১৩.গবেষণার ফলাফল ও তা বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় সুপারিশ

কোন মানুষ জীবদ্দশায় চাইলে পুত্র-কন্যা সন্তানের মাঝে সম্পত্তি সমান ভাগ করে দিতে পারেন। এটাই সঙ্গত ও ন্যায়ানুগ; কারণ বাজার থেকে কলা কিনে আনলে কন্যাকে অর্ধেক আর পুত্রকে একটা দেওয়া হয় না; বরং সমান সমানই ভাগই করা হয়। তবে ব্যক্তির মৃত্যুরপরে সম্পত্তি বণ্টন করতে গেলে পুরো কুরআনিক নির্দেশনা অনুযায়ী বণ্টন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যত্যয় ইসলামী শরীয়া অনুমোদন করে না। অন্য দিকে পিতা-মাতার মীরাসী সম্পত্তি হলো বান্দার হক। সুতরাং এ সম্পত্তি বণ্টনে অন্যায়-অবিচার করা হলে সংশ্লিষ্ট বান্দার সাথে এর সমাধান করতে হয়। কেবল মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলেই তা সমাধান হয়ে যায় না। পুরুষের তুলনায় নারীর অর্থনৈতিক দায়ভার একেবারেই নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম তাকে অনেক বেশি অংশ দিয়েছে, যাতে তা তাকে আর্থিক ক্ষমতায়নের মধ্যে সে সমাজে নিজের অবস্থান সুসংহত করতে ভূমিকা রাখতে পারে। অধিকাংশ পুরুষের ন্যায় নারী উত্তরাধিকারীদেরকেও ‘আসাবা’ বা অবশিষ্টভোগী বানানো হয়েছে, যারা ‘যাবিল ফুরূযদের’ অংশ বণ্টনের পর অবশিষ্ট অংশ পান। ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান মহান আল্লাহ প্রণীত এক অলংঘনীয় বিধান-মু'মিনদেরকে একথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। ইসলামের অন্যান্য বিধানের ন্যায় এ বিধান সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করা ফরয। এ বিধানকে যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য যার যার অবস্থান থেকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু চারটি অবস্থা এমন আছে, যেখানে নারীরা পুরুষদের অর্ধেক ভাগ পায়। অথচ আটটি অবস্থা এমন আছে, যেখানে নারীরা পুরুষদের সমান পায়। আবার দশ বা ততোধিক অবস্থায় নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি পায়। শুধু তাই নয়, এমনও কতক অবস্থা আছে যেখানে কেবল নারীরা ওয়ারিস বা সম্পত্তির হিস্যার হকদার হয়; অথচ তাদের সমকক্ষ পুরুষেরা ওয়ারিস হয় না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীরা মীরাসী সম্পত্তি থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়। নিম্নে এতদসংক্রান্ত কয়েকটি সুপারিশ ও প্রস্তাবনা পেশ করছি:

---

৮৬ L.P. Freedman, *Women and law in Asia and the Near East, `Draft Paper*, Development Law and Policy Program, Columbia UniversitySchool of Public Heath, p.24-25.

৮৭ প্রাপ্য সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত নারীরা, http://www.dailyislambd.com, Accessed on date, 12/07/2019.

এক. ইসলামী জীবন বিধান সংক্রান্ত মৌলিক বিশ্বাস ও মুসলমানদের পারস্পরিক ব্যবহারিক জীবনের সাথে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিধায় এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় সহজ ভাবে পর্যাপ্ত গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন;

দুই. মুসলিম শিক্ষার্থীদের মাঝে এ সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনকে সংক্ষিপ্তভাবে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার পাঠ্যভুক্ত করা অপরিহার্য;

তিন. ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার ও সেম্পোজিয়ামের আয়োজন করা দরকার;

চার. অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলিমদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান দানের লক্ষ্যে ওয়াজ মাহফিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন;

পাঁচ. এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান দান ও অবহেলা দূর করতে সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবায় মাঝে মাঝে এ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য থাকা অতীব জরুরী;

ছয়. উত্তরাধিকার বণ্টনের ব্যাপারে সচেতন লোক তৈরি করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স ও ডিপ্লোমা কোর্স প্রদানের ও কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে;

সাত. উত্তরাধিকার সম্পত্তি যথাযথ বণ্টনের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি ও ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের লক্ষ্যে মাতা-পিতা কর্তৃক নিজেদের জীবদ্দশায় সন্তানদেরকে ডেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেওয়া, মেয়ে সন্তানদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত নিজেদের এ অধিকার ছেড়ে না দেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সন্তানদেরকে পরস্পরের সুখে ও দুঃখে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া প্রয়োজন;

আট. উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে নানাবিধ অনিয়মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে তদারকি করা এবং তা নিরসনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহনের জন্য আইনী কাঠামো গঠন করা যেত পারে।

নয়. ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের আলোকে বাংলাদেশের মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার হওয়া দরকার; বিশেষ করে মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৬১ এর ৪ ধারা।

দশ. রাষ্ট্রীয় কোন বিধি বা আইন নেই উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য। এই জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিধি প্রণয়ন করা দরকার যাতে করে কেউই যেন ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বরখেলাপ না করে।

১৪. উপসংহার

উত্তরাধিকার বিধানের প্রণেতা হলেন মহাজ্ঞানী ও মহামহিম আল্লাহ তায়ালা, যিনি বান্দাহর প্রকৃত চাহিদা ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। জীবদ্দশায় বান্দা কার দ্বারা বেশি উপকৃত হয়েছে এবং মৃত্যুর পর কে তার কাজে আসবে বা তার রেখে যাওয়া ওয়ারিসদের বেশি উপকারে আসবে, তা কেবল তিনিই জানেন। সুতরাং তাঁর বণ্টনই হবে সর্বোত্তম বণ্টন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহান আল্লাহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই স্রষ্টা। তিনিই তাদের সকলের সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথাযথ আইন ও বিধান রচনা করেছেন। তাই এ আইন বাস্তবায়ন করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব এবং তাতে কোনোরূপ বিপত্তি তৈরি না করাও অপরিহার্য। উত্তরাধিকার বণ্টনে অনিয়ম করার মাধ্যমে কেবল ব্যক্তিবিশেষকেই বঞ্চিত করা হয় না; বরং এর মাধ্যমে তার সাথে সংশ্লিষ্ট আরো অনেক নারী ও পুরুষকেও বঞ্চিত করা হয়। ইসলামী শরীয়াতের বিধানাবলী অবলোকনের পর শিরক-কুফর এবং অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যার অপরাধের পর মীরাসী সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণের অপরাধ সবচেয়ে বেশী ও ভঙ্কর। সূরা নিসার ১৩ এবং ১৪ নং আয়াতে উত্তরাধিকার আইন পালনে পুরস্কার ও তা লংঘনে চরম শাস্তির ঘোষণা এসেছে।[৮৮] বাংলাদেশে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের আলোকে মীরাসী সম্পত্তি সঠিকভাবে খুব কমই বণ্টিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের খেয়াল-খুশি ও নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে গ্রাম্য সালিশ সংস্কৃতি ও মামলার মাধ্যমে মানুষ মীরাসী সম্পত্তির অধিকার লাভ করে।বাংলাদেশে কন্যা সন্তান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মীরাসী ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

৮৮ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ
“এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য।”(আল-কুরআন, ৪:১৩)।
وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ
“যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।”(আল-কুরআন, ৪:১৪)।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি.

মহানবী (সা.)-এর সামাজিক শিষ্টাচার নীতি : পর্যালোচনা

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল*
মোঃ মিকদাদ সিদ্দিকী**

[**সারসংক্ষেপ :** মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মানবিক গুণের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার অন্যতম। মহানবী (সা.)-এর জীবনদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর সামাজিক শিষ্টাচার নীতি। একে ধারণ করে মুসলমানরা একদিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিল, জয় করেছিল পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়। দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকলেও মুসলমানদের এই বিজয়ী অবস্থা বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই অনুপস্থিত। এর অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম একটি হলো মহানবী (সা.)এর সামাজিক শিষ্টাচার নীতি থেকে মুসলমানদের দূরে সরে যাওয়া, সামাজিকভাবে তাঁর অনুপম শিষ্টাচারের আদর্শ পরিহার করা। এ অবস্থার পরিবর্তন চাইলে মুসলমানদেরকে মহানবী (সা.)-এর সামাজিক শিষ্টাচার নীতির দিকে ফিরে যেতে হবে, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রতিটি নীতির অনুশীলন করতে হবে। তাহলেই মুসলমান জাতি হারানো গৌরব, লুপ্ত সম্মানে পুনরায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে।]

১. ভূমিকা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে শিষ্টাচার বিবর্জিত একটি জনপদে আবির্ভূত হন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুয়্যাত লাভ করেন এবং ইসলাম প্রচার শুরু করেন। যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর মনোরম আচরণ ও মনোহর নৈতিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে। মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে।[১] সমকালীন আরবের অসভ্য-অভব্য-অসংস্কৃত লোকদেরকে তিনি ইসলাম শেখানোর সুযোগ পান মাত্র ২৩ বছর। এ সময়কালে তিনি মূলত আচরণ ও চরিত্রে সুন্দরতম একদল মানুষ তৈরি করেন। এ মানুষগুলো তাঁর নির্দেশানুসারে দেশ-দেশান্তরে ইসলামের আহ্বান নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন। আরবিভাষী এ লোকগুলো আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের এমন এমন জনপদে পৌঁছে যান, যে জনপদের অধিবাসীরা একেবারেই আরবি জানে না। আবার তাঁরাও জানেন না জনপদের

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
** পিএইচ. ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১ সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ (২০শ খণ্ড)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ.৫৬০, ৫৭৬ ও ৬০৬

লোকদের ভাষা। কিন্তু তারপরও ইসলাম প্রচার হতে থাকে। মানুষ ইসলামও গ্রহণ করে। এর কারণ ছিল, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আদর্শে উজ্জীবিত লোকদের ব্যক্তিগত জীবনাচার। লোকগুলো তাঁদের জীবনে ইসলামের সদাচার ও সুনীতির বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাঁদের আচরণ থেকে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। তাদের মনে এই প্রত্যয় স্বতপ্রণোদিতভাবেই জন্মেছে যে, ভিন্ন ভাষার, আলাদা ঘরানার এই লোকগুলো যে আচরণ করছে, যে মানসিকতা পোষণ করছে, যে চরিত্র ধারণ করছে, যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে, তা যদি ইসলাম হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণীয়। এ প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে ভিন্ন সংস্কৃতি, আলাদা ভাষা ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশেও এইভাবে ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শবাদী মুমিনগণ এদেশে যখন এসেছেন, তখন এদেশে আরবি ভাষা বুঝার মতো একটি লোকও ছিলো না। আর ইসলামের আহ্বান নিয়ে যারা এসেছিলেন, তারাও বাংলা ভাষার একটি শব্দ সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতেন না। তা সত্ত্বেও সে সময়ের বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সমকালীন ক্ষমতাবান জমিদার শ্রেণির নিপীড়ন সহ্য করে ও সব হারানোর ঝুঁকি নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য যে, ভাষাগত দুর্বোধ্যতা, সংস্কৃতিগতবৈপরীত্য, জীবনযাপনগত পার্থক্য থাকার পরও কেবল এ সকল লোকদের আচরণ ও চরিত্র দেখেই বঙ্গদেশের আপামর জনগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সংশয়হীনভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিল যে, যে আদর্শ বা ধর্ম মানুষকে এমন সুন্দর আচরণের অধিকারী করেছে, যে বিধি ও নীতি অনুসরণ করার কারণে আগত লোকগুলোর নৈতিক চরিত্র এমন অনিন্দ্য সুন্দর হয়েছে, সে ধর্ম ও আদর্শ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায়।

মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন ১৩৮৫ বছর আগে। এখনো তাঁর উপর নাযিল হওয়া কুরআন মজীদ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। এখনো তাঁর বাণী পরিবর্তনহীন অবস্থায় বিশুদ্ধভাবে বর্তমান আছে। সদাচার, শিষ্টাচার, সুনীতি, উন্নত নৈতিকতা, মানবসেবা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে এখনো তাঁর শিক্ষা ও হুকুম অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। একুশ শতকের আধুনিকতম এই বিশ্বে মহানবী (সা.) প্রচারিত ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণকারী লোকদের সংখ্যা এখন প্রায় দুইশ কোটি। অথচ দেশে দেশে মুসলমানদের দেখে এখন আর অমুসলিমদের মধ্যে সে প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা জন্ম নিচ্ছে না। এখন আর নিপীড়নের আশংকাকে তোয়াক্কা না করে মুক্তি ও শান্তির আশায় নিপীড়িত-বঞ্চিত সাধারণ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় খুঁজছে না। বরং দেশে দেশে অন্যায়, অশিক্ষা, অনৈতিকতা, হিংসা, শত্রুতা, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ ইত্যাদি ত্রুটিগুলো অন্যদের মতো মুসলিমদের মধ্যেও প্রবলভাবে সংক্রমিত হয়েছে। কোথাও কোথাও মুসলমানদের মধ্যে এ সংক্রমণ এমনকি অন্যদের চেয়েও বেশি। মুসলমানদের এ দূরবস্থার কারণ কী? যে সকল নীতি ও আদর্শ মানুষের মনে আস্থা ও বিশ্বাসের সীসাঢালা ভিত্তি

তৈরিতে সমর্থ ছিল, সে নীতি ও আদর্শের ধারকদের নিকট এখন মানবতা, গণস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে কেনো?

'মহানবী (সা.)-এর সামাজিক শিষ্টাচার নীতি ও বর্তমান মুসলিম সমাজ : একটি পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক নিবন্ধে এ সকল জিজ্ঞাসার জবাব অন্বেষণ করা হয়েছে। নিবন্ধে এ অবস্থা উত্তরণের কোনো তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক পথ নির্দেশ করা হয়নি, জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তরে কোনো বিশ্লেষণাত্মক কথামালা বা প্রজ্ঞানির্ভর সুপারিশমালাও সংযুক্ত করা হয়নি। কেবল নির্মোহ ও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে বর্তমান মুসলিম সমাজের বিদ্যমান শিষ্টাচার ও নৈতিক অবস্থার সাথে মহানবী (সা.)-এর সামাজিক শিষ্টাচার নীতির তৌলোনিক ভাষাচিত্র প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

আশা করা যায়, এ প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানগণ মহানবী (সা.)-এর দেয়া সামাজিক শিষ্টাচার নীতিগুলোর সাথে নিজেদের দূরত্ব বুঝতে পারবেন এবং এগুলো অর্জনের জন্য আবশ্যক চেষ্টা-সাধনা শুরু করবেন। এ সাধনায় তারা সফল হলে বিশ্ব মানবতা আবারো এমন একদল লোক প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে, যাদের আচরণের সুঘ্রাণ, চরিত্রের সুবাসই ভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের লোকদের মুগ্ধকর উপলব্ধিতে উপনীত করবে এবং তারা ইসলামকে তাদের মুক্তি ও কল্যাণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবেন।

২. শিষ্টাচার পরিচিতি

শিষ্ট হলো শান্ত, ভদ্র, বিনীত, সুশীল, সুবোধ, নীতিযুক্ত, সুনীতিসম্পন্ন, শিক্ষিত, মার্জিত। শিষ্টাচার হলো ভদ্র ব্যবহার, নম্র আচরণ;[২]the formal rules of correct or polite behavior in society or among members of a particular profession;[৩] رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ماينبغى[৪]-এর ইংরেজি প্রতিশব্দEtiquetteএবং আরবি প্রতিশব্দ الأدبঅর্থ well-mannered, well-bred, polite, refined, cultured, polished.[৫]

শিষ্টাচার হলো ভালো আচরণ, মার্জিত ও কাঙ্ক্ষিত আচরণ। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অন্য মানুষের কিছু আচরণ পছন্দ করে। এটি ব্যক্তিক পছন্দ নয়; বরং সামগ্রিকভাবে মানবতার তীব্র

২ ড. মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত সংস্করণ পৌষ ১৪০৭, ৮ম পুনমুদ্রণ মাঘ ১৪১৩, পৃ.১০৮২

৩ A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English,* Oxford University Press, 2007-2008 (Seventh Edition), p.520

৪ Dr. Shawqi, *Al-Muzamul Waseet*, Cairo: Maktabatu al-Sharuk al-Dawliah, 2008 (4th Edition), p.9

৫ Dr. Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid*, Beirut: Dar el Ilm Lilmalayin, (Edition 22) 2008, p.64

চেতনায় পছন্দের এ অনুভূতিগুলো তীব্র ও চিরন্তন। এ কারণে মানুষ সততা, সত্যবাদিতা, সুবিচার, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ও বিশ্বাসপরায়ণতাকে সবসময় আকাঙ্ক্ষা করেছে। মিথ্যা, যুলম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে কখনোই সমর্থন করেনি। সহানুভূতি, দয়া, দানশীলতা, উদারতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্মদক্ষতাকে সম্মান করেছে। স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, কৃপণতা, সংকীর্ণতা, কর্মবিমুখতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, উদাসীনতাকে ঘৃণা করেছে। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, আদর্শপরায়ণতা, বীরত্ব, উচ্চাশাকে গ্রহণ করেছে। অস্থিরতা, নীচতা, তোষামোদী, হীনমানসিকতা, হীনমন্যতা ও কাপুরুষতাকে বর্জন করেছে। আত্মসংযম, আত্মসম্মানবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও অকপটতা মানুষের নিকট নন্দিত হয়েছে। প্রবৃত্তির দাসত্ব, অশালীন আচরণ, বিশৃঙ্খলা ও কুটিলতা নিন্দিত হয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা, সহানুভূতি, পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা, কল্যাণকামিতা, সামাজিক সুবিচার ও সাম্যকে অনিবার্য গুণ গণ্য করা হয়েছে। দলাদলি, উচ্ছৃংখলতা, বিভেদ-বৈষম্য, অনিয়ম, অনৈক্য, পারস্পরিক শত্রুতা, যুলম ও অসহযোগিতাকে বর্জন আবশ্যক মনে করা হয়েছে। মানুষ কখনোই চুরি, ডাকাতি, ব্যাভিচার, হত্যা, জালিয়াতি, ঘুষ, কটুক্তি, নিপীড়ন, কুৎসা রটনা, পরচর্চা, পরনিন্দা, হিংসা, অকারণ দোষারোপ এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজকে পুণ্যের কাজ মনে করেনি। প্রতারক, ধোঁকাবাজ, অহঙ্কারী, অন্যকে দেখানোর জন্য সৎআমলকারী, মুনাফিক, অন্যায়জেদপরায়ণ ও লোভী ব্যক্তি কখনোই ভালো লোক হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি পায় নি। আবার মাতা-পিতার খিদমত করা, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা, বন্ধু-বান্ধবের সাথে অকপট ও আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা, ইয়াতিম, মিসকীন ও অসহায়দের দেখাশোনা করা, রোগীদের সেবা এবং বিপদগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো চিরকালই পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সৎকর্মশীল, মিষ্টভাষী, কোমল স্বভাব ও অন্যের কল্যাণকামী ব্যক্তি চিরদিনই সম্মান লাভ করেছে। মানবতা চিরদিনই সে সকল লোককে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে মনে করেছে যারা সত্যবাদী, সত্য সন্ধানী, যাদের উপর সকল কাজে নির্ভর করা যায়, যাদের ভেতর-বাহির একই রকম, যাদের কথা ও কাজে মিল আছে, যারা কেবল নিজের অংশ পেয়েই সন্তুষ্ট না; বরং অন্যের অধিকার উদারচিত্তে আদায় করার ক্ষেত্রেও যত্নবান, যাদের কাছে প্রত্যেকেই কল্যাণময় কাজের আশা করতে পারে এবং যাদের দিয়ে কিছুমাত্র ক্ষতি বা লোকসান হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। মূলত এ সকল আচরণ ও অভ্যাসের মধ্যে যেগুলো গ্রহণীয় সেগুলো গ্রহণ করা এবং যেগুলো বর্জনীয় সেগুলো বর্জন করাই শিষ্টাচার।

৩. মহানবী (সা.)-এর শিষ্টাচার

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সুন্দরতম আচরণের সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।[৬]

শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) কিছু মূলনীতি অনুসরণ করেছেন এবং অন্যদেরকেও অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

অর্থাৎ তোমরা কোমল ব্যবহার করো, কঠোর ব্যবহার করো না। মানুষকে শান্তি দাও। মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।[৭]

তিনি অন্যত্র বলেছেন, "তোমরা মানুষের সাথে কোমল ব্যবহার করবে, কঠোর ব্যবহার করবে না। শুভ সংবাদ দেবে, তাদের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে না। তোমরা দুজনের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখবে।"[৮]

এ আলোকেই মহানবী (সা.) নিজের জীবনধারা ঠিক করে নিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি কারো চেহারার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতেন না। দৃষ্টি নিচু রাখতেন। আসমানের চেয়ে যমীনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি সময় নিবদ্ধ থাকতো। কারো মুখের উপর সরাসরি অপ্রিয় কথা বলতেন না। কারো ব্যাপারে অপ্রিয় কোনো কথা তাঁর নিকট পৌঁছালে সে লোকের নাম উল্লেখ করে তাকে বিব্রত করতেন না,; বরং বলতেন, কিছু লোক এমন বলাবলি করছে![৯]

ব্যক্তিগত জীবনে মহানবী (সা.) অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী, সদাচারী ও মার্জিত রুচিবোধ সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আয়শা (রা), খাদেম হযরত আনাস (রা) এবং ঘনিষ্ঠতম পারিবারিক সদস্য হযরত আলী (রা) সহ তাঁর অগণিত সহচরের বর্ণনা হতে জানা যায়, তিনি বরাবরই খোশ-মেজাজী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আচরণে ক্রোধ বা অসৌজন্যের প্রকাশ ঘটতে কখনোই দেখা যায়নি। সবসময় সকলের প্রতি তিনি ছিলেন অসামান্য নম্র, ভদ্র এবং বিনয়ী। সকল সময় তিনি উৎফুল্লচিত্ত, সুখী ও হাসিখুশী। সবসময় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত থাকতো এবং তাঁর নয়নযুগল হতে আনন্দময় উজ্জ্বল দীপ্তি ঝরে পড়তো।[১০]

মহানবী (সা.)-এর চেহারায় সবসময় স্মিতভাব বিরাজ করতো। তিনি ছিলেন নরম মেজাজের। রুক্ষতা ছিলো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি বেশি জোরে কথা বলতেন না। অশালীন

---

৬ আল-কুরআন, ৩৩:২১

৭ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০১৪, অষ্টম সংস্করণ, আচার-ব্যবহার অধ্যায়,, হাদীস নং ৫৬৯৪, খ.৯, পৃ.৪৫৭

৮ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৯৫, পৃ.৪৫৭

৯ ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতূম*, খাদিজা আখতার রেজায়ী অনূদিত, ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, জুন ২০১৪, ৩২তম প্রকাশ, পৃ.৫২৭

১০ আফযালুর রহমান, *হযরত মুহাম্মদ (সা) : জীবনী–বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ১৯৮৯, খ.১, পৃ.৪৯

কোনো কথা তাঁর মুখে উচ্চারিত হতো না। কারো প্রতি রুষ্ট হলেও তাকে ধমক দিয়ে কথা বলতেন না। কারো প্রশংসা করার সময় অতি মাত্রায় প্রশংসা করতেন না। যে জিনিসের প্রতি আগ্রহী না হতেন, সেটা সহজেই ভুলে থাকতেন। কোনো ব্যাপারেই কেউ তাঁর কাছে হতাশ হতো না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি নিজে মুক্ত থাকতেন। অহঙ্কার, কোনো জিনিসের বাহুল্য এবং অর্থহীন কথা। তিনটি বিষয় থেকে তিনি লোকদের নিরাপদ রাখতেন। পরের নিন্দা, কাউকে লজ্জা দেয়া এবং অন্যের দোষ প্রকাশ করা।[১১]

বস্তুত আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের জীবনে কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত সকল আচরণের বিস্তৃত ও বিস্তারিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। লোকদেরকে এ দৃষ্টান্ত অনুসরণে নির্দেশ দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর গোটা জীবন এ কাজে নিবেদন করেছেন। কথার সাথে কাজের কখনোই অমিল হতে দেননি। কারণ,

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللهِأَنْتَقُوْلُوْامَالَاتَفْعَلُوْنَ .

অর্থাৎআল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যা তোমরা করো না তা বলা।[১২]

শিষ্টাচার সম্পর্কিত মহানবী (সা.)-এর নীতি ও নির্দেশনা তাই অসংখ্য। এ স্বল্প পরিসরে তার একটি পরিপূর্ণ তালিকাও উপস্থাপন সম্ভব নয়। এখানে এগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো, যাতে অবশিষ্ট নির্দেশনা ও নীতিগুলোর জানার ব্যাপারে উৎসাহ তৈরি হয়। সাথে সাথে মানুষ নিজের অবস্থা ও অবস্থান এর সাথে মিলিয়ে নিতে পারে।

৩.১ শিষ্টাচারে অগ্রাধিকার

একজন মানুষের শিষ্টাচারের হকদার অবশিষ্ট সকল মানুষ। কিন্তু এর একটি ধারাক্রম রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন,

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِ ى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

অর্থাৎ মাতাপিতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী ও পথচারীদের সাথে এবং তোমাদের অধীনস্থদের সাথে তোমরা সদাচরণ করো।[১৩]

মহানবী (সা.)-এর বাণী থেকেও অগ্রাধিকারের একটি ধারণা পাওয়া যায়। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

---

১১ ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৯

১২ আল-কুরআন, ৬১:৩

১৩ আল-কুরআন, ৪:৩৬

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ .

অর্থাৎ এক সাহাবী মহানবী (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নিকট থেকে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।[১৪]

অন্য বর্ণনায় পিতার পরে ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তীজনদের কথা বলা হয়েছে।[১৫]

শিষ্টাচারে প্রতিবেশীও অগ্রাধিকার লাভকারী অন্যতম পক্ষ। মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে।"[১৬] তিনি অন্যত্র বলেছেন, "জিব্রাঈল (আ) আমাকে সব সময় প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের উপদেশ দিয়েই যাচ্ছিলেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, তিনি তাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করবেন।"[১৭] নিকটবর্তী প্রতিবেশী হতে দান শুরু করা,[১৮] প্রতিবেশীকে খাবারের অংশ দেয়া,[১৯] উপহার পাঠানো,[২০] তাকে কষ্ট না দেয়া[২১] ইত্যাদি প্রতিবেশীর সাথে শিষ্টাচারের অংশ। মহানবী (সা.) এ কাজকে ঈমানের প্রতীক হিসেবে বর্ণনাকরেছেন। বলেছেন, "সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট পুরে ভোজন করে, অথচ তার প্রতিবেশী থাকে অভুক্ত।"[২২]

---

১৪ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৫৪৬, পৃ.৩৮৯-৩৯০

১৫ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১৫, চতুর্থ সংস্করণ, সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, হাদীস নং ৬২৭০, খ.৬, পৃ.৮৮

১৬ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা আবুল বাশার আখন্দ অনূদিত এবং ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক ও মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগস্ট ২০১৪, দ্বিতীয় প্রকাশ, শিষ্টাচার অধ্যায়, হাদীস নং ৩৬৭২, খ.৩, পৃ.৩৪৪

১৭ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৭৩, পৃ.৩৪৫

১৮ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী (র.), *আল-আদাবুল মুফরাদ*, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৮ চতুর্থ সংস্করণ, হাদীস নং ১১০, পৃ.৮২

১৯ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৩ ও ১১৪, পৃ.৮৩

২০ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১০৭, পৃ.৮১

২১ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৯, পৃ.৮৫

২২ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১২, পৃ.৮৩

এখন অগ্রাধিকারের এই নীতি বদলে গিয়েছে। কেবল নিজের মা-বাবার নিকটই আকস্মিকভাবে লোকেরা ব্যক্তিত্ববান ও কম কথা বলা লোক হয়ে যায়। তাদের সাথে কদাচিৎ ভালো ব্যবহার করা হয়।

৩.২ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি উত্তম চরিত্র

বংশ, বর্ণ, বিত্ত, পদ, ক্ষমতা, প্রভাব, প্রজ্ঞা, সৌন্দর্য ইত্যাদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যার স্বভাব-চরিত্র ভালো, সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।[২৩] অন্যত্র তিনি সৎভাবে চলা, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বনকে নবুয়্যাতের পঁচিশভাগের এক ভাগ বলে ঘোষণা করেছেন।[২৪] তিনি আরো বলেছেন, "সদাচারণই পুণ্য আর যা তোমার অন্তরে দ্বিধা তৈরি করে এবং যা লোকের সামনে প্রকাশ করতে তুমি অপছন্দ করো, তাই পাপ।"[২৫]

যদি চরিত্রবান ব্যক্তির বংশ, বর্ণ, ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ বেশি পরিমাণে থাকে, তাহলে তা তো তাকে আরো মহিমান্বিত করে। কিন্তু চরিত্রহীনতার সঙ্গে এগুলো থাকলে মহানবী (সা.) সেগুলোকে মর্যাদার উপকরণ হিসেবে গণ্য না করার শিক্ষা দিয়েছেন। পাশপাশি মন্দ চরিত্রকে অমর্যাদার কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন,

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ

অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সে ব্যক্তি, যার মন্দ স্বভাবের কারণে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।[২৬]

বর্তমানে মুসলিম সমাজও তাত্ত্বিকভাবে এ কথাটির উপর প্রবল আস্থা পোষণ করে। আলোচনায়, মাহফিলে এ কথাগুলো উদ্বৃত করতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু নিজ জীবনে এর অনুশীলনের ক্ষেত্রে তারা খুবই অবহেলা প্রদর্শন করে।

---

২৩ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬০৯, পৃ.৪১৭

২৪ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র.), *আবু দাউদ শরীফ*,ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক অনূদিত এবং অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ ও অধ্যাপক আবদুল মালেক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০১৪, তৃতীয় মুদ্রণ, আদব অধ্যায়, হাদীস নং ৪৭০১, খ.৫, পৃ.৪৬৫

২৫ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, হাদীস নং ৬২৮৬, পৃ.৯৪

২৬ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬০৬, পৃ.৪১৬

৩.৩ অতিরিক্ত প্রশংসা নিষিদ্ধ

মানুষকে কাজে উৎসাহ দেয়ার জন্য, হতাশা ও বিষাদগ্রস্ত লোককে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যক্তির যোগ্যতা, দক্ষতা ও সম্ভাবনা নিয়ে প্রশংসাসূচক কথা বলা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশংসায় অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ। এতে ব্যক্তি নিজের ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। ফলে সংশোধন হওয়ার সুযোগ পায় না। সে কারণে মহানবী (সা.) প্রশংসায় অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ করেছেন। একবার মহানবী (সা.)-এর সামনে এক সাহাবী অন্য সাহাবীর প্রশংসা করলেন। তিনি প্রশংসায় অতিরঞ্জন করলেন। তখন মহানবী (সা.) তাকে বললেন, "তোমরা তো লোকটিকে মেরে ফেললে অথবা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে।"[২৭] একই রকম ঘটনায় অন্যত্র তিনি প্রশংসাকারীকে বললেন, "আফসোস তোমার প্রতি! তুমি তো তোমার সাথীর গলা কেটে ফেললে!"[২৮]

৩.৪ অন্যের ক্ষতি নিষিদ্ধ

মুমিন সবসময় অন্যের কল্যাণ কামনা করবে। অন্যের জীবন, সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা নষ্ট করবে না। বরং সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে, উপস্থিতিতে–অনুপস্থিতিতে অন্যের কল্যাণ কামনা করবে। মহানবী (সা.) বলেছেন,

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়। আল্লাহ শপথ সে মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ সে মুমিন নয়। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কোন সে লোক মুমিন নয়!? তিনি বললেন, যে ব্যক্তির ক্ষতি হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

৩.৫ অভিশাপ ও অপবাদ নিষিদ্ধ

মহানবী (সা.)এর শিষ্টাচারের একটি অন্যতম দিক হলো তিনি কাউকে অভিশাপ দিতেন না। কাউকে অভিশাপ দেয়া, অপবাদ দেয়াকে তিনি বৈধ মনে করতেন না। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, মহানবী (সা.) গালিগালাজকারী, অশালীনভাষী ও অভিশাপদাতা ছিলেন না।[২৯]; বরং তিনি এগুলো হারাম করেছেন। বলেছেন,

مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهْوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ.

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো মুমিনের অভিশাপ দিলে, তা তাকে হত্যা করারই শামিল হবে। আর কোনো মুমিনকে 'কাফির' অপবাদ দিলে তাও তাকে হত্যা করার মতোই হবে।[৩০]

---

২৭ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৩৪, পৃ.৪২৯

২৮ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৩৫, পৃ.৪২৯

২৯ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬০৫, পৃ.৪১৫

৩০ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬২১, পৃ.৪২২

মহানবী (সা.) অন্যত্র বলেছেন, "দু ব্যক্তি যখন গালি-গালাজে লিপ্ত হয়, তখন তাদের উভয়ের গোনাহ তার উপর পতিত হয়, যে গালিগালাজ শুরু করেছে, যতক্ষণ না মাযলূম সীমালংঘন করে।"[৩১]

৩.৬ অশ্লীলতা নিষিদ্ধ

অশ্লীল আচরণ, অশালীন-অশোভন কথা শিষ্টাচার বিরোধী বিষয়।

আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা হারাম করেছেন। বলেছেন,

قُلْاِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।[৩২]

তিনি অশ্লীল বিষয়ের প্রচারণাও নিষিদ্ধ করেছেন। বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَهُمْ عَذَاب اَلِيْم فِیْ الدُّنْيَا وَ الاَخِرَةِ.

যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তি রয়েছে।[৩৩]

মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই, যার অশালীনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশ্রব ত্যাগ করে।[৩৪]

৩.৭ অহঙ্কার নিষিদ্ধ

মহানবী (সা.)-এর শিষ্টাচারের আদর্শে অহঙ্কার করা সর্বোতভাবে হারাম একটি কাজ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَلِلنَّاسِ وَ لَاتَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّاللّٰهَلَايُحِبُّكُلَّ مُخْتَالٍفَخُوْرٍ.

অহঙ্কারের কারণে তুমি কোন মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং যমীনে অহঙ্কারী হিসেবে চলাফেরা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ উদ্ধত–অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।[৩৫]

---

৩১ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৩৫৫, পৃ.১১৭

৩২ আল-কুরআন, ৭:৩৩

৩৩ আল-কুরআন, ২৪:১৯

৩৪ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬২৮, পৃ.৪২৬

৩৫ আল-কুরআন, ৩১:১৮, (আরো দেখুন: ৪:৩৬ ,১৭১-৭২; ৭:৪০, ১৪৬; ১৬:২২-২৩, ২৯; ১৭:৩৭-৩৮, ৮৩; ৩১:১৮-১৯; ৩২:১৫; ৩৯:৫৯-৬০, ৭২; ৪০:৩৫-৩৭; ৪১:৫১; ৫৭:২৩

মহানবী (সা.) বলেন, "অণু পরিমাণ অহঙ্কারও যার অন্তরে থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৩৬]

৩.৮ কথা বন্ধ রাখা নিষিদ্ধ

ভাই ভাই নানা বিষয়ে মতবিরোধ করবে, তাদের মধ্যে ঝগড়া হতে পারে, এমনকি সাময়িকভাবে কথা বলা বন্ধও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এটি তিনদিনের বেশি হওয়া উচিত নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দুজনে সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে আর অপরজন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে, সেই উত্তম ব্যক্তি।"[৩৭]

৩.৯ কথা বলার শিষ্টাচার

কথা বলা উচিত স্পষ্টভাবে, অনুচ্চ কণ্ঠে, যেনো অন্যের অসুবিধা না হয়।

আল্লাহ বলেছেন,

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ.

তুমি শোভনভাবে পা ফেলো এবং কথা বল নিচুস্বরে।[৩৮]

বিশেষত বয়োজেষ্ঠ্য ও সম্মানিত লোকদের সামনে কথা বলার ক্ষেত্রে নিম্নকণ্ঠে কথা বলার এ অভ্যাস বজায় রাখা আবশ্যক। কণ্ঠে যেনো বেআদবী ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ না পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ.

তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে।[৩৯]

যদি কোথাও তিনজন লোক থাকে, তাহলে তাদের একজনকে বাদ দিয়ে অপর দুজন চুপি চুপি কথা বলা মহানবী (সা.)-এর শিষ্টাচার নীতি পরিপন্থী কাজ।[৪০] কারণ, এতে যাকে বাদ দিয়ে কথা বলা হয়, সে সংশয় ও দুঃখবোধে আক্রান্ত হতে পারে।

---

৩৬ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০১৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, সৎ ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা অধ্যায়, হাদীস নং ২০০৫, খ.৪, পৃ.৪০৬

৩৭ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬৪৮, পৃ.৪৩৬

৩৮ আল-কুরআন, ৩১:১৯

৩৯ আল-কুরআন, ৪৯:২

৪০ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৫৮৫১, পৃ.৫৪৩

৩.১০ কৃপণতা ও অপচয় নিষিদ্ধ

মহানবী (সা.)-এর শিষ্টাচারের অনিবার্য দিক হলো কৃপণতা না করা ও অপচয় না করা; বরং দান করা। এতে সঞ্চয় নিষিদ্ধ নয়, অধিক দান বা অধিক ব্যয়ও কাম্য নয়। সকল ক্ষেত্রে আবশ্যক ভারসাম্য নীতি অবলম্বন করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ لاَتَجْعَلْيَدَكَمَغْلُولَةًإِلَىعُنُقِكَوَ لاتَبْسُطْهَاكُلَّالْبَسْطِفَتَقْعُدَمَلُوْمًامَّحْسُوْرًا.

দান করার ক্ষেত্রে তুমি তোমার হাত ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ করে রেখ না এবং তোমার হাত পুরোপুরি খুলেও দিও না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে।[৪১]

وَ لاَتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

আর কোনক্রমেই অপচয়-অপব্যয় করো না।[৪২]

মহানবী (সা.) বলেছেন, "মুমিনের মাঝে দুটি স্বভাব একত্রিত হতে পারে না। একটি হল কৃপণতা, অন্যটি হলো মন্দ চরিত্র।"[৪৩]

মুমিন দান করবে, এটিই স্বাভাবিক। কোনো কারণে যদি দান করতে অপরাগ হয়, তখনো মন্দ ব্যবহার করা যাবে না। বরং বিনয়ের সাথে অপরাগতা প্রকাশ করতে হবে।[৪৪]

৩.১১ ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা

রাগ, ক্রোধ বা ক্ষোভ এমন একটি মানসিক ক্রিয়া যা মানুষকে স্বাভাবিক আচরণ ও চিন্তা করতে দেয় না। এ অবস্থায় মানুষ ভুল করে, অন্যায় কাজ করে এবং এমন কাজ করে যা পারস্পারিক সম্পর্ক ও স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর। মহানবী (সা.) তাই রাগ বা ক্রোধ দমনকে শিষ্টাচারের একটি অনুসঙ্গ ঘোষণা করেন এবং একে দমন করা বীরত্বপূর্ণ কাজ বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

অর্থাৎ প্রকৃত বীর সে নয় যে কুস্তীতে কাউকে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।[৪৫]

৩.১২ গৃহকর্মী ও অধীনস্থদের সাথে শিষ্টাচার

গৃহকর্মী ও অধীনস্থদের সাথেও শিষ্টাচারের আদর্শ স্থাপন করেছেন মহানবী (সা.)। তিনি বলেছেন, "তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন

---

৪১ আল-কুরআন, ১৭:২৯

৪২ আল-কুরআন, ১৭:২৬

৪৩ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ‘ঈসা আত–তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৬৮, পৃ.৩৯০

৪৪ আল-কুরআন, ১৭:২৮

৪৫ আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬৮৪, পৃ.৪৫৩

করেছেন। আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দেন, সে নিজে যা খায়, তাকেও যেনো তা খাওয়ায়। সে নিজে যা পরে, তাকেও যেনো তা পরায়। তার উপর যেনো এমন কোনো কাজের চাপ না দেয়, যা তার শক্তির বাইরে। তার উপর যদি কোনো কঠিন কাজের চাপ দিতে হয়, তাহলে সে নিজেও যেন তাকে সাহায্য করে।"[৪৬] তাদের কাজে সবসময় বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না। সবসময় জবাবদিহিতা চাওয়া ঠিক হবে না। কারণ অতিরিক্ত বিরক্তি প্রকাশ বা সবসময় কাজের অপ্রয়োজনীয় কঠিন জবাবদিহিতা ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা কমিয়ে দেয়। বরং মমতার সাথে ভুল ধরিয়ে দিলে সম্পর্ক যেমন অটুট থাকে তেমনি সংশোধনেরও অন্তর্গত তাগিদ তৈরি হয়। মহানবী (সা.) তাঁর জীবন জুড়ে এ নীতিই অনুসরণ করেছেন। হযরত আনাস (রা.)-এর স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি থেকেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি দশ বছর মহানবী (সা.)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমার প্রতি 'উহ' শব্দ বলেননি। একথা জিজ্ঞাসা করেননি, তুমি এ কাজ কেন করলে এবং কেন করলে না?[৪৭]

৩.১৩ ঘরের কাজে সহযোগিতা

অনেকেই পৌরষের অস্বাভাবিক অহমবোধের কারণে ঘরের কোনো কাজ করতে চায় না। মাকে বা স্ত্রীকে ঘরের কাজে সাহায্য করা নারীসুলভ কাজ বলে তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। অথচ মহানবী (সা.) ঘরে ফেরার পরও অবসর থাকতেন না। ঘরের কাজে নিজ সহধর্মিণীদের সাহায্য করতেন। হযরত আয়শা (রা) বলেন, মহানবী (সা) ঘরে সাধারণ ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। যখন নামাযের সময় হতো, উঠে নামাযে চলে যেতেন।[৪৮]

৩.১৪ জামা'আতে সূরা সংক্ষেপ করা

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ১৭ রাকাআত নামায জামাআতে পড়া হয়। এর মধ্যে ১০ রাকাআত নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ার বিধান রয়েছে। মহানবী (সা.) এ ক্ষেত্রে ইমামদেরকে সংক্ষিপ্ত সূরা নির্বাচনের আদেশ দিয়েছেন। বলেছেন,

فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

কাজেই তোমাদের যে কেউ লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে, সে যেনো সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং কর্মব্যস্ত লোক থাকে।[৪৯]

কী ভীষণ মানবিকতার সাথে ইবাদাতে নেতৃত্ব দেয়ার নির্দেশ মহানবী (সা.) প্রদান করেছেন। অথচ প্রায়শ মসজিদগুলোতে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, যা উচিত নয়।

৩.১৫ দ্বিমুখিতা বর্জন করা

---

৪৬ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬২৪, পৃ.৪২৪

৪৭ আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ (র.), *আবু দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৬৯৮, পৃ.৪৬৪

৪৮ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬১৩, পৃ.৪১৯

৪৯ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৮০, পৃ.৪৫১

সত্য ও মিথ্যা যাচাই না করে, ভালো ও মন্দ মূল্যায়ন না করে যখন যে পক্ষের কাছে যায় সে পক্ষের মতাদর্শ সমর্থন করে, সকল পক্ষের সুবিধা গ্রহণ করে এমন লোক সমাজে বিরল নয়; বরং এমন চরিত্রের লোকই অসংখ্য। অথচ মহানবী (সা.)এর শিষ্টাচারের দর্শন হলো, ব্যক্তি ভেতরে-বাহিরে এক হবে। দ্বিমুখিতাকে তিনি ব্যক্তির ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "কিয়ামাতের দিন তুমি আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় পাবে যে দুমুখো। সে এদের সামনে এক রূপ নিয়ে আসে আবার ওদের কাছে অন্য রূপে ধরা দেয়।"[৫০]

৩.১৬ দোষ গোপন করা ও সংশোধন করা

মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষক্রটি গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামাতে তার দোষক্রটি গোপন রাখবেন।"[৫১]

মহানবী (সা.)-এর শিষ্টাচার নীতির অন্যতম দিক হলো, এক ব্যক্তির ক্রটির কথা অন্যকে বলা যাবে না। বলতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই বলতে হবে। মমতা, ভালোবাসা ও দায়িত্বশীলতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংশোধন করে দিতে হবে। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "তোমরা একজন তার অন্য ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। তার মাঝে যদি সে কোন দাগ দেখতে পায় তবে যেনো দূর করে দেয়।"[৫২]

৩.১৭ প্রবেশের আগে অনুমতি নেয়া

অন্যের ঘরে, কার্যালয়ে, সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশের আগে অনুমতি নেয়া একটি সাধারণ শিষ্টাচার। মহানবী (সা.) প্রবর্তিত শিষ্টাচার নীতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلٰى أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া আর কারো ঘরে ঘরের অধিবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা মনে রাখ।[৫৩]

চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার আর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কক্ষে ঢোকার সময় আমরা অনুমতি নিয়ে থাকি। অন্যক্ষেত্রগুলোতে অনুমিত নেয়ার ক্ষেত্রে তেমন অনুসরণ হয় না। অথচ মহানবী

৫০ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৩২, পৃ.৪২৮

৫১ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৩৪০, পৃ.১১৩

৫২ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯৩৫, পৃ.৩৭৩

৫৩ আল-কুরআন, ২৪:২৭

(সা.) মায়ের কক্ষে প্রবেশের আগেও সন্তানকে অনুমতি নেয়ার আদেশ দিয়েছেন।[৫৪] আমরা কেউ কেউ অনুমতি চেয়ে আবার দরোজার ফাঁক দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে ভেতরের অবস্থা দেখার চেষ্টা করি। এমন একজনকে মহানবী (সা) বলেছেন, "যদি আমি জানতাম যে, তুমি উঁকি মারবে তাহলে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। তাকানোর জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে।"[৫৫]

৩.১৮ ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকা

মহানবী (সা.) অশালীন, অশ্লীল, মন্দ, অভদ্রজনোচিত, অভব্য কথা বলা নিষেধ করেছেন। তিনি ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকাকে ঈমানের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। যা আবশ্যকভাবে অপ্রয়োজনীয় কথা বা বেশি কথা বলাকে শিষ্টাচার বহির্ভূত বলে গণ্য করে। তিনি বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেনো ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[৫৬]

৩.১৯ বিদ্রুপ করা, দোষারোপ করা, মন্দ নামে ডাকা নিষিদ্ধ

মানুষ অর্থহীন মজার জন্য অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। অনেক সময় অন্যকে হেয় করার জন্যও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়। এতে বিদ্রুপকারীরা বিকৃত আনন্দ পেলেও বিদ্রুপকৃত ব্যক্তি ভীষণ লজ্জা পান। মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েন। এ কাজে কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই। যে কোনো মন্দ ঘটনায় বা খারাপ ব্যাপারে অনেকেই অন্যকে দোষারোপ করতে ভালোবাসে। নিজের দায় থাকলেও সবসময় একজন বলিরপাঠা খোঁজার চেষ্টা করে, যার উপর দোষ চাপিয়ে দেয়া যাবে। একইভাবে মানুষকে উপহাস করার জন্য বা কাউকে নীচ প্রমাণের তার পূর্বেকৃত কোনো অপরাধ বা অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে মন্দ নামে ডাকা হয়। অনেক সময় মানুষের অর্থবহ সুন্দর নামকেও পরিকল্পিতভাবে অপমানকরার জন্য বিকৃত করে ডাকা হয়। ইসলামে এর একটি কাজও হালাল রাখা হয়নি; বরং সবগুলো সুস্পষ্ট হারাম করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৫৪ ইমাম মালিক (র.), *মুয়াত্তা* (দ্বিতীয় খণ্ড), মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০১৪, ষষ্ঠ সংস্করণ, ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ বিষয়ক অধ্যায়, রেওয়ায়ত ১, পৃ. ৬৮৭

৫৫ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৫৮০৭, পৃ.৫১৭

৫৬ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৫৯৩, ৫৫৯৪ পৃ.৪১০, ৪১১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে ভাল হতে পারে। আর কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী নারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা অত্যন্ত খারাপ।[৫৭]

মহানবী (সা.) বলেছেন, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং হেয় করবে না। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় করে।"[৫৮]

৩.২০ বিনয় ও নম্রতা

মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে প্রকৃত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।"[৫৯] তিনি আরো বলেন, "নম্রতা যে কোনো বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যে কোনো বিষয় থেকে নম্রতা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে।"[৬০]

৩.২১ মন্দ ধারণা, দোষান্বেষণ ও গীবত নিষিদ্ধ

মহানবী (সা.) প্রবর্তিত শিষ্টাচার নীতির অন্যতম দিক হলো, এতে অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ। অপরাধের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার আগে কারো সম্পর্কে তাই মন্দ ধারণা পোষণ যাবে না। অথচ মানুষ প্রমাণ ব্যতীতই মন্দ ধারণা পোষণ করে। কারো সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে অনেকের ভীষণ কষ্ট হয়। অথচ যতটুকু মানুষকে বাইরে থেকে ভালো বা মন্দ মনে হয় এরচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখানো বা আগ্রহী হয়ে খোঁজ করা বৈধ নয়। মহানবী (সা.)-এর প্রবর্তিত শিষ্টাচারে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানো হারাম। মুসলিম হওয়ার পরও অনেকে এ জাতীয় খোঁজাখুঁজিতে ভীষণ পারঙ্গম। অনেকের আরেকটি দক্ষতা হলো পরচর্চায়, যাকে 'গীবত' বলা হয়। মহানবী (সা.)-এর শিষ্টাচারে তা নিষিদ্ধ ও অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ হিসেবে গণ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

---

৫৭ আল-কুরআন, ৪৯:১১

৫৮ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৩০৯, পৃ.১০১

৫৯ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৩৬২, পৃ.১২০

৬০ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৩৬৬, পৃ.১২১

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাক; কারণ অনুমান কোন কোনো ক্ষেত্রে পাপ। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের গীবত কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর।[৬১]

গীবতের পরিচয় দিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা হলো গীবত, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলেছি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে তাকে আপনি কী বলবেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলেছো, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তুমি গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।[৬২]তিনি আরও বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারো প্রতি ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ব্যাপার। তোমরা দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থাকো।[৬৩]

অন্য বর্ণনায় মহানবী (সা.) উল্লিখিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি পার্থিব বিষয়ে সীমাহীন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হতে ও গোপন শত্রুতা না করতে[৬৪] অন্যের বেচাকেনার উপর বেচাকেনা করতে[৬৫] নিষেধ করেছেন।

৩.২২ মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকী

মহানবী (সা.) শিষ্টাচারের যে আদর্শ পেশ করেছেন তাতে মিথ্যার কোনো সংশ্রব নেই। এতে বৈধ প্রতিশ্রুতিসমূহ ভঙ্গ করার সুযোগ নেই। এতে অন্যের সম্পদ, সম্মান ও জীবনের আমানত রক্ষা করা আবশ্যক। ঈমান থাকা অবস্থায় কোনো মানুষ এ জাতীয় কাজ করতে পারে না। ঈমানের দাবিকারী কেউ যদি এ জাতীয় কাজ করে মহানবী (সা.) তাকে মুনাফিক হিসেবে অভিহিত করেছেন। বলেছেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

---

৬১ আল-কুরআন, ৪৯:১২

৬২ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৩৫৭, পৃ.১১৮

৬৩ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*,, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬৩৮, পৃ.৪৩১

৬৪ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৩০৪, পৃ.১০০

৬৫ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৩০৫, পৃ.১০০

মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে আর যখন আমানত রাখা হয়, তা খিয়ানত করে।[৬৬]

আর আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের স্থান নির্ধারণ করেছেন জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকে আর তাদের জন্য আপনি কোন সাহায্যকারী পাবেন না।[৬৭]

৩.২৩ মেহমান ও মেযবানের শিষ্টাচার

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-শুভার্থী একে অন্যের বাড়ি যাবে, এটিই স্বাভাবিক। এতে যেনো শিষ্টাচারের সীমা লংঘিত না হয় সে কারণে মহানবী (সা.) মেহমান ও মেযবান উভয়েরই করণীয় নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহমানের সম্মান একদিন ও এক রাত। আর সাধারণ মেহমানদারী তিনদিন ও তিনরাত। .. মেযবানকে কষ্ট দিয়ে তার কাছে মেহমানের অবস্থান হালাল নয়।"[৬৮]

৩.২৪ রাস্তার শিষ্টাচার

ব্যক্তির কোনো কাজ বা ভূমিকার কারণে মানুষের চলাচলে যেনো অসুবিধা না হয় তেমন অবস্থা বজায় রাখা হলো রাস্তার শিষ্টাচার। এ কারণে লোক চলাচলের স্থানে বসা উচিত নয়। কোনো কারণে বসতে বাধ্য হলে সে স্থানের হক আদায় করেই বসা উচিত। মহানবী (সা.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাস্তার হক কী? তিনি বলেছিলেন, চোখ অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।[৬৯]

আজকের রাস্তার পরিস্থিতি কী? অনেকে এভাবে দাঁড়ায় যে, অন্যদের খুব কষ্ট করে চলাচল করতে হয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সৎকাজের আদেশ দেয়ার পরিবর্তে ইভটিজিং চর্চা করা হয়। সাধারণ লোকদের সংকীর্ণ পথে চালানোকেই কেউ কেউ নিজেদের ক্ষমতা ও অহমের প্রকাশ বলে গণ্য করেন। অথচ এর সবই মহানবী (সা.)-এ আদর্শ পরিপন্থী কাজ।

৩.২৫ লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ

---

৬৬ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬৬৫, পৃ.৪৪৬

৬৭ আল-কুরআন, ৪:১৪৫

৬৮ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৭০৫, পৃ.৪৬২

৬৯ প্রাগুক্ত, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৫৭৯৬, পৃ.৫১২

মহানবী (সা.)এর শিষ্টাচার নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাশীলতা। একে তিনি ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেন,

فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ

কারণ নিশ্চয় লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।[৭০]

নিজেকে প্রকাশ করার বা নিজের অসুবিধা বলার কিংবা নিজের যোগ্যতা গোপন করার দ্বিধা-সংশয়কে লজ্জাশীলতা বলে না। লজ্জাশীলতা হলো শিষ্টাচারের একটি সীমা। এর ফলে মানুষ কৃতজ্ঞ হয়, অন্যের উপকার করে, অশালীন ও মন্দ থেকে বিরত থাকে, কুৎসিত কাজ করে না। এটি একটি বোধ। মহানবী (সা) বলেছেন, "লজ্জাশীলতা কল্যাণ ব্যতীত কোনো কিছুই বয়ে আনে না।"[৭১] তিনি অন্যত্র বলেছেন, "যদি তুমি লজ্জাই ছেড়ে দাও, তবে তুমি যা চাও তা কর।"[৭২]

আল্লাহর অবাধ্যতা করায়, মানুষের ক্ষতি ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং অশালীন বাক্য ব্যবহার ও কাজে আমরা প্রায়ই লজ্জাশীলতার সীমা রক্ষা করি না। ফলে মহানবী (সা)-এর ঘোষণা অনুসারে, আমরা যা চাই, তা করতে পারি। আমাদের কোনো দ্বিধা হয় না।

৩.২৬ শত্রুতা পোষণ না করা

পার্থিব কারণে, বৈষয়িক নানা বিষয়ে মানুষের সাথে মানুষের মতবিরোধ হতে পারে। কিন্তু তাকে শত্রুতায় পর্যবসিত করা উচিত নয়। যদি কোনো মুসলমান পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত হয় তাহলে অবশিষ্ট মুসলমানরা সে সম্পর্ক সংশোধন করে দেয়ার চেষ্টা করবে। শত্রুতাকে উসকে দেবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

মুমিনদের দুটি দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। আর তাদের এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ নিশ্চয় সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[৭৩]

৭০ প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬৮৭, পৃ.৪৫৪-৫৫

৭১ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৮৭, পৃ.৪৫৪

৭২ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬৯০, পৃ.৪৫৫

৭৩ আল-কুরআন, ৪৯:৯

মহানবী (সা.) বিভিন্ন বর্ণনায় বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, যারা তাঁর সাথে কিছু শরীক করে না। কিন্তু এমন মুমিনদের ক্ষমা করেন না যাদের মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। তারা শত্রুতা না মেটানো পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।[৭৪]

৩.২৭ শিশুর প্রতি মমতা

আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, একবার মহানবী (সা.) আমাদের সামনে এলেন। তখন উমামা তাঁর কাঁধের উপর ছিলেন। এমন অবস্থায় মহানবী (সা.) নামাযে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রুকুতে গেলেন, তাকে নামিয়ে রাখলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেন, তাকেও উঠিয়ে নিলেন।[৭৫]

অনেক সময় কোনো কোনো মসজিদে শিশুরা ধমকের শিকার হয়। কোথাও কোথাও তাদেরকে মারপিটও করা হয়। অনেক সময় মসজিদের ভেতর থেকে বারান্দায় বের করে দেয়া হয়। মসজিদ সম্পর্কে শিশুদের মনে ভক্তি তৈরি হয় না, ভীতি তৈরি হয়। এটা উচিত নয়।

৩.২৮ সকলের প্রতি ভালোবাসা

আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত কঠোর শাস্তিদাতা, জাহান্নাম অনন্ত শাস্তির স্থান, এই ভয় ও আত্মরক্ষার ভাবনা থেকে আমরা ইবাদত করি, মানুষকেও করতে বলি। আল্লাহ যতখানি কঠোর, দয়ালু তারচেয়ে অসংখ্যগুণ বেশি। মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে ৯৯ ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীতে নাযিল করেছেন এক ভাগ। এ একভাগের কারণেই সৃষ্টিজগতের একজন অন্যজনের উপর দয়া করে।[৭৬] সন্তানের জন্য মা-বাবার স্নেহ, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রেম, ভাই-বন্ধুর ভালোবাসা, পশু-পাখির পরস্পরের প্রতি মমতা, এ সবই এই একভাগ রহমতের ফল। তাহলে যিনি ৯৯ ভাগ ভালোবাসার মালিক, তিনি আমাদের প্রতি কী অসীম ভালোবাসা ও মমতা পোষণ করেন, তা কি ধারণা করা যায়? মানুষকে আল্লাহর এই অশেষ ভালোবাসার কথা বলে আশাবাদী করে তোলা উচিত। কিন্তু অধিকাংশ সময় তা না করে সবসময় আযাব ও গযবের ভয় দেখানো হয়। অথচ মানুষকে জয় করার জন্য ভয়ের চেয়ে ভালোবাসা সবসময়ই ভীষণভাবে কার্যকর। শিষ্টাচার সে ভালোবাসারই অংশ, শিল্পিত-সংহত বহিঃপ্রকাশ।

---

৭৪ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৩১২, ৬৩১৩ ও ৬৩১৪, পৃ.১০২-১০৩

৭৫ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৫৭০, পৃ.৪০২

৭৬ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৫৭৪, পৃ.৪০৩

মানুষ আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চায় কিন্তু মানুষকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে না। ক্ষমা করে না। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় না। অথচ আল্লাহর ক্ষমা পেতে চায়, তাঁর সাহায্য চায়। মহানবী (সা.) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ

যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।[৭৭]

বস্তুত সকলের প্রতি ভালোবাসা পোষণ ইসলামের একটি সাধারণ নীতি। মহানবী (সা.) একে মুসলিম উম্মাহভুক্ত থাকার শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া করে না আর বড়দের শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৭৮]

৩.২৯ সত্য বলা ফরয, মিথ্যা বলা হারাম

মহানবী (সা.) সত্যবাদী ছিলেন। তিনি সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার জন্য আল-আমিন নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্টাচারের অন্যতম নীতি হলো, সত্য বলা, মিথ্যা না বলা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَاأَيُّهَاالَّذِينَاَمَنُوا اتَّقُوا اللهَوَقُولُوا قَوْلًاسَدِيدًا

হে মুমিনগণ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা সঠিক কথা বলো।[৭৯]

মহানবী (সা.) বলেছেন, "সত্য আঁকড়িয়ে ধরা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সত্য নেকীর দিকে আর নেকী জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সাবধান থাকো। কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ আগুনের দিকে পরিচালিত করে।"[৮০]

ইসলামের পঞ্চভিত্তির অন্যতম রোযা। কিন্তু মিথ্যাচারের জন্য এ রোযাও অর্থহীন বলে গণ্য হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِه وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ও মূর্খতা পরিত্যাগ করলো না, আল্লাহর নিকট তার পানাহার ত্যাগের কোনো প্রয়োজন নেই।[৮১]

৩.৩০ সৎসঙ্গ গ্রহণ, অসৎসঙ্গ বর্জন

মহানবী (সা.)এর শিষ্টাচার নীতিতে ব্যক্তির জন্য সৎসঙ্গ গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ বর্জনের নির্দেশনা রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, ভালো সাথী ও মন্দ সাথীর উপমা সুগন্ধিবিক্রেতা ও কামারের মতো। সুগন্ধি বিক্রেতা হয়তো তোমাকে কিছু সুগন্ধি লাগিয়ে দেবে অথবা তুমি তার

---

৭৭ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৫৮৮, পৃ.৪০৮

৭৮ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ‘ঈসা আত–তিরমিযী (র.), *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯২৫, পৃ.৩৬৯

৭৯ আল-কুরআন, ৩৩:৭০

৮০ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৪০১, পৃ.১৩২

৮১ আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, আচার-ব্যবহার অধ্যায়, হাদীস নং ৫৬৩১, পৃ.৪২৮

নিকট থেকে কিছুটা ক্রয় করবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে অন্তত সুঘ্রাণ লাভ করবে। অন্যদিকে কামার হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।[৮২]

৩.৩১ সালাম দেয়া

মহানবী (সা.) প্রবর্তিত শিষ্টাচারের একটি শ্রেষ্ঠতম অনুসঙ্গ সালাম। কে কাকে সালাম দিলে তার একটি সাধারণ রীতি মহানবী (সা.) নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, ছোট বড়কে, পথচারী উপবিষ্টকে, অল্প সংখ্যক বেশি সংখ্যককে[৮৩] আরোহী পদচারীকে[৮৪] সালাম দেবে। পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দেয়াকে তিনি ইসলামের অন্যতম উত্তম কাজ বলে অভিহিত করেছেন।[৮৫]

সালামের ক্ষেত্রে ছোটো বড়কে সালাম দেবে এটি একটি সাধারণ শিষ্টাচার। মহানবী (সা.) এ ক্ষেত্রেও ছিলেন অনন্য, অতুলনীয়। তিনি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে কেউ কখনো আগে সালাম দিতে পারেনি। তিনি শিশুদেরকে পর্যন্ত আগে সালাম দিতেন।[৮৬]

৩.৩২ হতাশ হওয়া নিষিদ্ধ

মহানবী (সা.) এক আশাবাদী দর্শন প্রবর্তন করেছেন। এতে কোনোক্রমেই হতাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে। সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করে ব্যর্থ হওয়ার পরও আশা করতে বলা হয়েছে। সকলকে এ আদর্শে উজ্জীবিত করা হয়েছে যে, মানুষের ক্ষমতার যেখানে শেষ সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার সেখানে শুরু।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَاتَقْنَطُوا مِنرَّحْمَةِاللهِإِنَّاللهَيَغْفِرُ الذُّنُوبَجَمِيْعًاإِنَّهُهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলম করে ফেলেছো, তারা আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম করুণাময়।[৮৭]

৩.৩৩ হাসিমুখে কথা বলা

মহানবী (সা.) প্রবর্তিত শিষ্টাচার নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সাক্ষাৎকালে হাসি মুখে থাকা। গোমড়া মুখে থাকা, ক্রোধ বা রাগ ফুটিয়ে কথা বলা কিংবা চেহারায় বিদ্বেষ ও

---

৮২ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৪৫৩, পৃ.১৪৭

৮৩ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৫৭৯৮, পৃ.৫১৩

৮৪ ইমাম মালিক (র.), *মুয়াত্তা* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, সালাম সম্পর্কিত অধ্যায়, রেওয়ায়ত ১, পৃ.৬৮১

৮৫ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল–বুখারী (র.), *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৫৮০১, পৃ.৫১৪

৮৬ প্রাগুক্ত, অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, হাদীস নং ৫৮১৩, পৃ.৫২০

৮৭ আল-কুরআন, ৩৯:৫৩

শত্রুতা ভাব বজায় রাখা মহানবী (সা.)-এর নীতি নয়। তিনি নিজে সবসময় মুচকি হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে কথা বলতেন। আমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ, “কোনো কিছু দান করাকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাকেও।”[৮৮]

৪. উপসংহার

বস্তুত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সামাজিক শিষ্টাচারের যে অনন্য নীতি প্রণয়ন করেছেন এবং বাস্তব জীবনে কার্যকর করে দেখিয়েছেন, তা অনবদ্য, নজিরবিহীন। মানুষের জীবনের বড় বড় ঘটনা ও আবেগের সাথে সাথে আপাত দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলে গণ্য কোনো আচরণ বা আবেগও তিনি উপেক্ষা করেননি। মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, দীনী ভাই, প্রতিবেশী, সহকর্মী, ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন আদর্শের অনুসারী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, শ্রমিক, মালিক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় মানুষের করণীয় বিষয়ে এমন বিস্তৃত ও খুঁটিনাটি বিবরণ মহানবী (সা.)-এর নীতি ও দর্শনকে সর্বজনীন করে তুলেছে। এ নীতি বাস্তবায়ন করে মহাবিশ্বের সকল মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছিল মুসলমানেরা। পৃথিবীতে তাদের বিত্ত ও প্রভাব অবিসংবাদিত হয়ে উঠেছিল। অর্ধ্ব পৃথিবীর শাসক তার সাধারণ কর্মচারীর সাথে বাহন ভাগ করে নেয়ার ঔদার্য দেখিয়ে বিনা বাধায় জয় করে নিয়েছিল দুর্জেয় বিভিন্ন জনপদ। তারপর যখন সে আদর্শ ও নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলমান শাসকরা, সাধারণ মুসলমানরা ভোগ ও বিলাসের, প্রভাব ও প্রতিপত্তির, দম্ভ ও অসহযোগিতার, প্রভূত্ব ও প্রতিপত্তির পথ অবলম্বন করেছে, তখন থেকেই ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গেছে মুসলমানদের সকল সৌন্দর্য ও ক্ষমতার মহাশক্তিশালী ভিত্তি। সেখান থেকেই সাধিত হয়েছে সর্বনাশী সর্বগ্রাসী পতন। তা থেকেই বিশ্বজুড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ও গোষ্ঠীর মর্যাদা হারিয়ে মুসলমানরা পরিণত হয়েছে অধীনস্থ মানবগোষ্ঠীতে। আশার কথা, মহানবী (সা.)-এর শিষ্টাচারের সামাজিক সে নীতি ও দর্শন অদ্যবধি অবিকল অবস্থায় সুরক্ষিত রয়েছে। পৃথিবীতে অসংখ্য মুসলিম কুরআন মজীদের হাফেয হিসেবে এবং অসংখ্য আলিম মুহাদ্দিস হিসেবে সে নীতি ও দর্শনের জীবন্ত সুরক্ষা শক্তি হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। একুশ শতকের এই ভয়ানক বৈষয়িক যুগে, প্রযুক্তির এ বিস্ময়কর উন্নতির যুগেও মুসলিম উম্মাহ যদি মহানবী (সা.)-এর শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের সে দর্শন আবারো যথাবিধি ধারণ করতে পারে, তাহলে আবারো বিশ্বে মুসলিম জাতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হতে পারবে। আল্লাহ তাআলা নিজেই মুসলমানদের জন্য এ বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন। বলেছেন,

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَ نْتُمُ ا لْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

তোমরা সাহস হারিয়ো না, তোমরা দুঃখিতও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।[৮৯]

---

৮৮ আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.), *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৪৫১, পৃ.১৪৬

৮৯ আল-কুরআন, ৩: ১৩৯

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি.

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান ও জ্ঞানী : প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা

ড. আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ*

[**সারসংক্ষেপ :** জ্ঞান কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহন। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং মহান আল্লাহর প্রতিনিধি নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে জ্ঞানই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ সব কারণে ইসলাম জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চাকে সর্বধিক গুরুত্ব দিয়েছে, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জনকে আবশ্যক করেছে এবং জ্ঞানীদের বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বক্ষমান প্রবন্ধে উল্লেখিত বিষয়াবলী আলোচনার পাশাপাশি ইসলামের আলোকে জ্ঞানের বিশ্লেষণ, কল্যাণ, জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হয়েছে। একজন মুসলিমের জন্য ন্যূনতম কতটুকু জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক তার একটি সীমারেখা চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানীর পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী প্রামাণিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী অনেকেই জ্ঞান অনুযায়ী কাঙ্খিত গুণের অধিকারী না হলে জ্ঞানী পর্যায়ভূক্ত নাও হতে পারে তার একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত জ্ঞানীর প্রকৃতি নির্ণয়ে ইসলামে উন্নত নৈতিক গুণাবলী বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বপরি, ইসলামে জ্ঞানীর মর্যাদা এবং জ্ঞানবিস্তারে জ্ঞানীদের দায়িত্ব-কর্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষভাগে জ্ঞানার্জনে জ্ঞান অন্বেষণকারীর গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]

ভূমিকা : জ্ঞান মানব জীবনে একটি মৌলিক ও অপরিহার্য বিষয়। জ্ঞান মানুষের মধ্যে গভীর অনুভূতি ও বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটায়। তা মানুষকে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য বোধ সৃষ্টি করে। মানবিক গুণাবলী বিকাশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে জ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। জ্ঞানের কারণে মানুষ অন্যান্য জীব-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ জীব। তাই ইসলাম জ্ঞান ও জ্ঞানীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং জ্ঞানীদের উচুঁ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

জ্ঞান শব্দের অর্থ

জ্ঞান শব্দটির আভিধানিক অর্থঃ অভ্যাস চর্চা প্রভৃতির দ্বারা আয়ত্তকরণ, বিদ্যাচর্চা, অধ্যয়ন, ইল্ম, জ্ঞান লাভ।[১] শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ تعليم (তা'লীম) বা علم (ইল্ম)। যার অর্থ জানা, বোঝা, শেখা, উপদেশ, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, তত্ত্ব, তথ্য ইত্যাদি। অবশ্য আরবী تربية

---

* সহকারী অধ্যাপক (আরবি ও ইস: শিক্ষা), সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া।

১. ড মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় সং. ২০০২), পৃ. ৪৮২ ও ১০৭৯।

(তারবিয়্যাহ) শব্দটি শিক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ বৃদ্ধি, ধারাবাহিকভাবে কোন কিছুকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া।

মনীষীগণ বিভিন্নভাবে জ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন

আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন, العلم إدراك الشئ بحقيقته

"জ্ঞান বা ইল্‌ম হচ্ছে কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা।"[২]

বিশিষ্ট ভাষাবিদ আল-জুরজানী বলেন, العلم هو الإعتقاد الجازم المطابق للواقع

"জ্ঞান বা ইল্‌ম হলো কোন বিষয় সম্পর্কে বাস্তবের অনুরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস।"[৩]

আয-যুরকানী বলেন, العلم في لسان الشرع العام على معرفة الله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه

"মহান আল্লাহ্, তাঁর নির্দেশনাবলী এবং মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর কার্যাবলী অনুধাবন করার নাম ইল্‌ম।"[৪]

মোটকথা, জ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধন করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তিকে স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবগত এবং তা সম্পাদন করতে সাহায্য করে।

জ্ঞান চর্চার ধারা

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির পর তাকে জ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। প্রথম মানব আদম ('আ.) কে সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ্ তাঁকে সব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান দান করেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا.

"আর তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন।" আল-কুরআন; ০২:৩১।

জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য তিনি মানুষকে দিয়েছেন বাকশক্তি এবং শিখিয়েছেন কলমের ব্যবহার।

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে,

خَلَقَ الْإِنسَانَ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

"তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।" আল-কুরআন; ৫৫:০৩-০৪।

---

২. রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (মক্কা মুকাররমা: মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, তা. বি.), খ. ০২, পৃ. ৪৪৬।

৩. আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.),পৃ. ১৯৯।

৪. মুহাম্মদ আবদুল আযীম আয্-যুরকানী, *মানাহিলুল ইরফান* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯৬), খ. ০১, পৃ. ১০।

আরও বলা হয়েছে,

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.

"পড়ো, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।" আল-কুরআন; ৯৬:০৩-০৪।

মহান আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য প্রেরণ করেন নবী-রাসূল ও কিতাব। নবী-রাসূলগণ ছিলেন সর্বোচ্চ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। তাঁরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কিতাব লাভ করেছিলেন।[৫] জ্ঞান বিস্তার ও শিক্ষার বিকাশ সাধনে যুগে যুগে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জ্ঞানের প্রসারে নবী-রাসূলগণের মধ্যে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.)।

কুরআনে বলা হয়েছে,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۝

যেমন আমি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং তোমাদের কিতাব (কুরআন) ও হিকমত (সুন্নাহ) শিক্ষা দেয়; আর তোমরা যা জানতে না তা তোমাদের শিক্ষা দেয়। আল-কুরআন; ০২ : ১৫১।[৬]

নবী-রাসূলগণের আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে যাবার পর জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করছেন। আজকের জ্ঞানের বিকাশ, শিক্ষার বিস্তার ও শিক্ষার নানা সুফল তাঁদের প্রচেষ্টার ফল।

ইসলামে জ্ঞানের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা

জ্ঞান কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহক। বিশেষ করে কল্যাণকর জ্ঞান সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদের মাধ্যম। তা মানুষকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথনির্দেশ করে এবং অন্যায়, অসত্য ও অকল্যাণ থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে। এটা এমন শক্তি, যা মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের সাথে সাথে মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধন করে। এর দ্বারা সমাজ থেকে অজ্ঞতা-মূর্খতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, উগ্রতা ও ভ্রান্তবিশ্বাস ইত্যাদি দূরীভূত হয়। জ্ঞান মানুষকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে উপযোগী করে গড়ে তোলে। এ সব কারণে ইসলাম জ্ঞানার্জনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনে প্রথম নাযিলকৃত বাণী জ্ঞানচর্চার নির্দেশ সম্বলিত। অথচ ইসলামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঈমান; এরপর গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাত,

---

৫. আল-কুরআন, ২১:৫১,৭৪, ৭৯; ১২:২২; ২৮:১৪; ১৯:১২; ৩৮:২০, ৪৫।

৬. আরও দ্র. আল-কুরআন; ২:১২৯, ৩৯:০২।

সাওম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। কিন্তু এ সব বিষয়ে কুরআনে প্রথমে নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং জ্ঞানচর্চার নির্দেশ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

"পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে; পড়ো, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।" আল-কুরআন; ৯৬: ০১-০৫।

জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে কুরআন মানুষকে উৎসাহিত করেছে। এ ব্যাপারে কুরআন একটি বিশেষ দু'আও শিক্ষা দিয়েছে,

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا۝

"বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করো।" আল-কুরআন; ২০ : ১১৪।

চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানুষের নিকট যখন জ্ঞানার্জনের কোন গুরুত্ব ছিলো না, উল্লেখিত আয়াতসমূহে তখন মানুষকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তা ছিল মূর্খতা, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের একটি যুগান্তকারী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। এটা মানুষকে সমৃদ্ধ করার আহবান। মানুষ যাতে ব্যাপকভাবে শিক্ষার মাধ্যমে নিজে উপকৃত হয় এবং জগতবাসীকে সমৃদ্ধ করতে পারে, সেজন্য এ নির্দেশ বাস্তবায়নে মহানবী (সা.) শিক্ষাকে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয (আবশ্যক) করেছেন। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মমত তার অনুসারীর উপর শিক্ষাকে ফরয করেছে এমন কোন নযির পাওয়া যায় না।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

"জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।"[৭]

এখানে যে 'ইল্ম বা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা প্রচলিত ধরনের দীনী 'ইল্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহ্‌র হক, সমাজের মানুষের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত জ্ঞানসহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর শিক্ষাই এর অন্তর্ভূক্ত। তাই মুসলমানদের কর্তব্য দীনি বিষয়সহ জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সব ধরনের জ্ঞানচর্চা করা। তাতে স্বাস্থ্য রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ সভ্যতা পরিচালনা ও সংগঠন সংক্রান্ত সব জ্ঞান অন্তর্ভূক্ত থাকবে। শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য সামরিক বিদ্যাও এর বাইরে নয়। এ সবই ফরযে কিফায়া।[৮]

---

৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, আল-মুকাদ্দমাহ, বাব ফাদলিল 'উলামায়ি ওয়াল হাছ্ছি 'আলা তালাবিল 'ইলমি, হাদীস নং ২২৪ ।

৮. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিকহুয যাকাত* (বৈরুত : মু'আসাসতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৩ হি.), খ.০২, পৃ. ৫৭০।

আল-কুরআন তার অনুসারীদের কাছ থেকে অন্ধ আনুগত্য দাবি করে না। জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে জেনে-বুঝে মানুষকে ঈমান আনার তাকিদ দেয়।[৯] তাই প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই। জ্ঞান ঈমানের ভিত্তি। এছাড়া ইবাদত ও আচরণ সঠিক হয় না। আর বাস্তব 'আমল ও আচরণের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান অর্জন ও সুস্থ মানসিকতা তৈরি। ঈমানের পরে দীনি জ্ঞানার্জন আল্লাহ্র নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির প্রথম উপায়। যারা যত্ন সহকারে ও সতর্কতার সাথে জ্ঞানার্জন করে তারা আল্লাহ্র শক্তি-ক্ষমতা ও দয়া সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে এবং তাঁর দয়া লাভে সচেষ্ট হয়। তাই কুরআনে বলা হয়েছে,

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۞

"জেনে রাখ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন (সত্য) ইলাহ নেই।" আল-কুরআন; ৪৭:১৯।

এ আয়াতে ঈমানের আগে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিসে ঈমান আনতে হবে এবং কিভাবে ঈমান বিশুদ্ধ হবে তা আগে জানতে হবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা ফরয। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব না হলেও ব্যক্তিগত পড়ালেখা ও জ্ঞানীদের নিকট শোনার মাধ্যমে এ ফরয আদায় করা জরুরী।

জ্ঞান মানুষকে সুসভ্য, বিনয়ী, সৎ, সংযমী, উদার, সহনশীল, দয়ালু, ক্ষমাপরায়ণ, আল্লাহ অভিমুখী, মুত্তাকী প্রভৃতি মহৎ গুণ হাসিলে সাহায্য করে।

তাই জ্ঞানীদের প্রশংসায় কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۞

"আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে।" আল-কুরআন; ৩৫:২৮।

উল্লেখিত আয়াতে জ্ঞানীদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তাঁরাই আল্লাহ্কে ভয় করেন। আর এ আল্লাহ্ভীতি ব্যক্তির মধ্যে উন্নত নৈতিক গুণ অজর্নে সহায়তা করে। তবে উল্লেখ্য যে, এখানে 'জ্ঞানী বলতে দীনি 'ইলমের অধিকারীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা পার্থিব ধর্মনিরপেক্ষ 'ইলম (জ্ঞান) কাউকে আল্লাহ্ ভীরু বানায় না। এটা দীনি জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ। এদিকে ইঙ্গিত করে 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) বলেন,

بحسب المرء من العلم أن يخاف الله وبحسبه من الجهل أن يعجب بعمله.

"ব্যক্তি জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় করে থাকে। আর তার মূর্খতা অনুপাতে স্বীয় জ্ঞানের জন্য দম্ভ প্রকাশ করেন।"[১০]

সঠিক জ্ঞান আলোকবর্তিকা স্বরূপ, যা মানুষকে আলোকিত মানুষে পরিণত করে কিংবা আলোর পথ নির্দেশ করে এবং কুসংস্কারাচ্ছান্ন হওয়া থেকে মুক্ত করে। তা মানুষকে ধ্বংসের

---

৯. আল-কুরআন, ৪৭:১৯।

১০. *আল-মুছান্নাফ ইবন আবী শায়বা*, খ.০৭, পৃ. ১০৩, কিতাবুয যুহদ, রিওয়ায়াত নং ৩৪৫১৮।

কবল থেকে রক্ষা করে এবং অন্যকেও রক্ষা করতে সহায়ক হয়। আর অজ্ঞতা অন্ধকার স্বরূপ, যা মানুষকে কুসংস্কার, ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের পথে ধাবিত করে। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ ۝ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَاالنُّوْرُ ۝ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءَ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۝

"সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুমান, আর না অন্ধকার ও আলো, আর না ছায়া ও রৌদ্র, এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত।" আল-কুরআন;৩৫ : ১৯-২২।[১১]

উল্লেখিত আয়াতে রূপকের মাধ্যমে জ্ঞানকে আলো এবং জ্ঞানীকে জীবিত ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর অজ্ঞতাকে অন্ধকার এবং অজ্ঞকে অন্ধ ও মৃত ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানী ও মূর্খের দৃষ্টিভঙ্গি একইরূপ নয়। আর উভয়ের মর্যাদাও এক সমান নয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রে সঠিকভাবে ও সচেতনার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য পূর্বশর্ত হলো জ্ঞানবান হওয়া।[১২] মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য, জীবন ও জগতের গূঢ় রহস্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খরা উদাসীন। কেবল জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই এ সব ব্যাপার সঠিকভাবে উপলব্ধি করে কাজ করতে পারেন। কুরআনে বলা হয়েছে,

ومَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝

"আর কেবল জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বোঝে না।" (আল-কুরআন; ২৯ : ৪৩)।

এ আয়াতেও জ্ঞান ও জ্ঞানীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।

জ্ঞান মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি অতি উৎকৃষ্ট নি'আমত ও সকল কল্যাণের উৎস। তা মানব মনের সংকীর্ণতা দূর করে চিন্তা-চেতনায় প্রশস্ততা আনে, মানুষের মধ্যে উদারতা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, চরমপন্থা, উগ্রতা, ভ্রষ্টতা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দেয়। এর দ্বারা হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি হয় এবং শত্রুকে মিত্রে পরিণত করা যায়। আজকের সমাজে যে অন্যায়, হানাহানি, উগ্রতা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি বিদ্যমান তার প্রধান কারণ অজ্ঞতা-মূর্খতা। যদি মানুষ সঠিক জ্ঞান লাভ করতো ও বুঝতো তাহলে এসবে লিপ্ত হতো না।

কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ ۝

"যাকে হিক্‌মত (বিশেষ জ্ঞান) প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়, আর জ্ঞানবান লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।" আল-কুরআন; ০২ : ২৬৯।

---

১১. আরও দ্র., আল-কুরআন, ৪০ : ৫৮।

১২. আল-কুরআন, ০২ : ২৪৭; ১২: ৫৫।

জ্ঞান কল্যাণের বাহন। যারা জ্ঞানের অধিকারী তারা সৌভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "মহান আল্লাহ্ যার কল্যাণ সাধন করতে চান তাকে দীনের 'ইলম দান করেন।"[১৩]

জ্ঞান এমন কল্যাণকর বস্তু, যা দ্বারা মানুষ তার মৃত্যুর পরও উপকৃত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

যখন মানুষ মারা যায় তখন তিনটি জিনিস ব্যতীত তার থেকে সমস্ত কাজ ছিন্ন হয়ে যায়। এ তিনটি ব্যতীত কোনো 'আমলই তার কাছে পৌঁছায় না: সাদকায়ে জারিয়াহ (এমন সাদ্কা যার উপকারিতা অব্যাহত থাকে), কিংবা এমন 'ইল্‌ম (জ্ঞান) যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় অর্থাৎ যা মানুষের জন্য উপকারী, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।[১৪]

এভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্তে জ্ঞানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ বক্তব্য রয়েছে।

জ্ঞানের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞানীগণও মূল্যাবান কথা বলেছেন। মু'আয ইবন জাবাল (রা.) বলেন,

জ্ঞান অর্জন করো। কেননা জ্ঞানার্জন করাই হলো আল্লাহ্ভীতি, জ্ঞানান্বেষণ ইবাদত। জ্ঞানচর্চা তাসবীহ পাঠতুল্য। তার গবেষণা হলো জিহাদ। যে জানেনা তাকে জ্ঞান দান করা সাদাকা। উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য তা ব্যয় করা নৈকট্য। এই জ্ঞান একাকিত্বে সঙ্গী, নির্জনে বন্ধু, দীনের ব্যাপারে পথপ্রদর্শক, সচ্ছলতা ও অভাবে সাহায্যকারী, বন্ধুদের সাথে থাকা অবস্থায় পরামর্শদাতা, ঘনিষ্ঠদের সাথে থাকার সময় অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান তার অধিকারীকে ন্যায়-অন্যায় চিনতে সহায়তা করে। তা জান্নাতের পথের আলোকবর্তিকা, [নির্বান্ধব অবস্থায় এই জ্ঞান আমাদের সংগী, এই জ্ঞান আমাদের সুখের পথে পরিচালিত করে; দুর্দশায় তা আমাদের রক্ষা করে, শত্রুর বিরুদ্ধে তা অস্ত্র, আর বন্ধু সমাবেশে তা অলংকার।] এই জ্ঞানের কারণে আল্লাহ্ বিভিন্ন জাতিকে উন্নত করেন এবং সৎকাজে তাদের পথ প্রদর্শন করেন তাদের নেতৃত্ব দান করেন, ফলে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়, তাদের কার্যাবলী অনুসরণ করা হয় এবং তাদের মতামত অনায়াসে গৃহীত হয়... এই জ্ঞানের দ্বারাই আল্লাহ্র অনুগত্য ও ইবাদত করা হয়, এর দ্বারা আল্লাহ্র একত্ব, মহত্ত্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করা হয়, এর দ্বারা তাকওয়া অবলম্বন করা হয়, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা হয়, হালাল-হারাম চিনা যায়। জ্ঞান হলো ইমামতুল্য, 'আমল তার

---

১৩. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, বাব মাই ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহহু ফীদ দীন, হাদীস নং ৭১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, বাব আন-নাহী 'আনিল মাসআলাহ, হা. নং ১০৩৭।

১৪. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ওসীয়ত,বাবমা ইয়ালহাকুল ইনসান মিনাস সাওয়াবি বা'দা ওয়াফাত, হাদীস নং ১৬৩১।

অনুসারী। সৌভাগ্যবানরা ঐশী প্রেরণার মাধ্যমে তা লাভ করে, আর হতভাগারা তা থেকে বঞ্চিত হয়।[১৫]

বর্তমান সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ও শিক্ষিতের হার বেড়েছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, লোভ, প্রতিহিংসা, অন্যায় ও অসভ্যতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সততা, মনুষ্যত্ব, শিষ্টাচার, উদারতা, দয়া, সহনশীলতা, ক্ষমাপরায়ণতা ইত্যাদি উন্নত মানবিক গুণাবলী হ্রাস পাচ্ছে। বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থাই এর বড়ো কারণ। এজন্য আজ সত্যিকার নৈতিক তথা ইসলামী শিক্ষার বড়ই প্রয়োজন।

এদিকে ইঙ্গিত করে নবী (সা.) বলেন,

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا.

"কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে (অন্যতম হলো), 'ইলম উঠে যাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যাপকভাবে মদ পান করা হবে এবং যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।" [১৬]

এখানে 'ইলম বা জ্ঞান দ্বারা দীনি শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এ শিক্ষা মানুষকে মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারাম সম্পর্কে অবহিত করে। এ শিক্ষাই মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও উন্নত নৈতিকতা জাগ্রত করে। কিয়ামতের পূর্বে মানুষ এ শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে পার্থিব জ্ঞানে উন্নতি লাভ করবে। মহান আল্লাহ ও তাঁর সত্য দীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। ফলে মানুষ চরম লোভী ও স্বার্থপর নীতি-নৈতিকতাহীন পশুতে পরিণত হবে, যা তাদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করবে। আজ আমাদের সামনে এ বাস্তবচিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিখ্যাত দার্শনিক টি.এস. ইলিয়টের এর বক্তব্যে–এ কথার সত্যতা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

All our Knowledge brings us nearer to our ignorance. All our ignorance brings us nearer to death. অর্থাৎ "আমাদের সার্বিক জ্ঞান আজ আমাদেরকে নিয়ে চলছে অজ্ঞতার অন্ধকারে, আর আমাদের সার্বিক অজ্ঞতা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে।"[১৭]

জ্ঞানের বিভিন্ন ধারা

বর্তমান আমাদের দেশে প্রধানত দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এর একটি হলো- দীনি শিক্ষা, আর অপরটি হলো- প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা। এ দুই ধরনের শিক্ষার মধ্যে দীনি শিক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর। এ কারণে দীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন প্রত্যেক

---

১৫. আবূ নুআইম ইসপাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ. ১, পৃ. ২৩৯; ইবন 'আবদিল বার, *জামি'উ বয়ানিল 'ইলম* (http://www.alsunnah.com), খ. ০১, পৃ. ২৩৫, রিওয়ায়াত নং ২১৯।

১৬. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, বাব রাফ'ইল 'ইলমি ওয়া যুহূরি আজ-জাহলি, হাদীস নং ৮০; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল 'ইলম, বাব রাফ'ইল 'ইলমি ওয়া কাবদিহি ওয়া যুহূরি আজ-জাহলি, হাদীস নং ২৬৭১।

১৭. T. S. Elliot, Choruses from *The RocK,* Selected Poems (New York : Harcourt, Brace & world,1964), P.107.

মুসলিমের জন্য ফরযে আইন। আর দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা ফরযে কিফায়া, এর অর্ন্তভুক্ত প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার এমন সব শাখা, যা মানুষের জন্য উপকারী। প্রত্যেক জনপদের একদল লোকের জন্য তা অর্জন করা আবশ্যক। আর কেউ তা অর্জন না করলে সকলে অপরাধী হবে।[১৮] যেমন চিকিৎসা, কৃষি, প্রকৌশল বিদ্যা ইত্যাদি। এছাড়া যে সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা ফরয নয়, বরং বৈধ বা অতিরিক্ত পর্যায়ের তা কেউ চাইলে গ্রহণ করতে পারে। তবে যে সব জ্ঞানের বিষয়ে মানুষের কল্যাণ নেই এবং যা দ্বীন, ঈমান ও নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর; যেমন-যাদুবিদ্যা, ভেলকিবাজি ইত্যাদি। ইসলাম এ জাতীয় অকল্যাণকর বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ইল্ম থেকে আশ্রয় চেয়েছেন।[১৯]

কতটুকু দীনী জ্ঞান অর্জন করা একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরয (আবশ্যক)

ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে বিশেষজ্ঞ 'আলেম হতে বলে না, তবে প্রত্যেককে দীনের মৌলিক জ্ঞানার্জন করতে বলে। প্রশ্ন হলো প্রত্যেকের জন্য দীনের কতটুকু পরিমাণ জ্ঞানার্জন ফরয (অতি আবশ্যক)? এ সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণ কথা এই যে, একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য দীন ও দুনিয়ার জন্য যতটুকু জ্ঞান না থাকলে চলে না, ততটুকু জ্ঞান অর্জন করা ফরয। তা হলোঃ ক). বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদা অর্জন এবং শিরক, কুফর, নিফাক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত হওয়ার জ্ঞান। খ). সঠিকভাবে ইবাদতের জন্য শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান। গ). ব্যক্তিগত, পরিবার ও সমাজ জীবনে স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন, আচার-আচরণ, লেনদেন, নিজ পেশার বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কিত জ্ঞান।

মোটকথা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-কাজ, পবিত্রতা অর্জনের পন্থা, নামায, রোযা, নামাযে পঠিত কুরআন, যাকাত ও হজ্জ সম্পর্কিত বিধান, বিবাহ-তালাক, নিজ পেশা তা কৃষি, ব্যবসা, চাকুরী বা অন্য যা-ই হোক না কেন, হালাল-হারাম, আবশ্যকীয়-অনাবশ্যকীয়, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদার শরয়ী বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান।[২০]

দীনের বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করা ফরযে কিফায়া, যা প্রত্যেক জনপদের কিছু লোকের জন্য আবশ্যক, সবার জন্য নয়।[২১] এছাড়াও দীনের মৌলিক জ্ঞানার্জনের পর প্রত্যেক জনপদের একদল মুসলমানের জন্য চিকিৎসা, কৃষি, প্রকৌশল ও অন্যান্য উপকারী বিদ্যা

---

১৮. আল-কুরআন, ১৬ : ৪৩; ২১ : ৭।

১৯. *সুনান ইবনু মাজাহ*,আল-মুকাদ্দমাহ, বাবুল ইনতিফা' বিল 'ইলমি ওয়াল 'আমালি বিহি, হাদীস নং ২৫০।

২০. দেখুন, ইবন হাযম রচিত *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, ৩১ পরিচ্ছদ; আবূ হামিদ আল-গাযালী রচিত *ইহইয়া উলূমিদ্দীন*, খ.০১, ২য় পরিচ্ছদ।

২১. আল-কুরআন, ৯ : ১২২।

শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া ইত্যাদি। এরপর যেসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা ফরয নয়, বরং বৈধ অথবা অতিরিক্ত পর্যায়ের তা কেউ চাইলে গ্রহণ করতে পারে এ ব্যাপারে ইসলামে নিষেধ নেই।

দীনের ন্যূনতম যতটুকু পরিমাণ জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয আইন আজ তা অধিকাংশ মুসলমানের নেই। ফলে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর দুরবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক মুসলিম পরিবারের সন্তান পাশ্চাত্য বস্তুবাদী শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন হয়ে পড়েছে এবং অমুসলিমদের রীতিনীতি গ্রহণ করছে। সঠিক দ্বীনি শিক্ষার অভাবে আজ মুসলিম সমাজের একটি অংশ শিরক, কুফর, বিদ'আত, কুসংস্কার, অনৈতিকতা ও মূর্খতায় নিমজ্জিত। এ কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ হারামকে হালাল করছে এবং লেনদেনে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করছে। আবার অনেকে ইসলামী শরয়ী বিধি-বিধানকে বর্তমান সময়ে অনুপযোগী মনে করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সততা ও উন্নত নৈতিকতা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে আজ মুসলিম জাতির অধঃপতন ঘটেছে। প্রথম যুগের মুসলিম মহিলারা দ্বীনের যে জ্ঞান অধিকারী ছিলেন, আজ অধিকাংশ মুসলিম পুরুষের তা নেই। সে যুগের মুসলিম মহিলাদের দীনি জ্ঞান কতটুকু ছিল তা আয়শা (রা.) এর একটি বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে কুরআন মজীদের কোন আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্ত না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।

ইসলামী দৃষ্টিতে জ্ঞানীর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা ও জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা। কিন্তু জ্ঞানী কে? কিভাবে জ্ঞানী হওয়া যায়? জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য কী? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষায় সর্বোচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরাই জ্ঞানী বা 'আলেম। বাস্তবে তারা নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী নাও হতে পারেন। জ্ঞানীদের পরিচয় ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোকপাত করেছেন। কুরআনের দৃষ্টিতে জ্ঞানীর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হলো,

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ . الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ . رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ . رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে নির্দশনাবলী রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য। (জ্ঞানবান লোক হলো) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ

করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং (বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে নিক্ষেপ করলে, তাকে তো তুমি অবশ্যই হেয় করলে আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন'; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করো এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করো, আর আমাদের সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দাও। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে ওয়াদা করেছো তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমান করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না। আল-কুরআন; ০৩: ১৯০-১৯৪।[২২]

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকুল, সৃষ্টিরহস্য, রাত ও দিনের বিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাকারী এবং এ সব বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিজগতের অসীম ক্ষমতাধর মহাস্রষ্টা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনায়নকারী এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্বরণকারী ব্যক্তিগণকে জ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ . الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ . وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ . وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.

জ্ঞানী লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে, (তারা এমন লোক), যারা আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আর আল্লাহ্ যে সম্পর্ক যা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন যারা তা বজায় রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিয্ক দিরেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো কাজের দ্বারা মন্দকে দূর করে, তাদের জন্য রয়েছে (আখিরাতে) শুভ পরিণাম। (আল-কুরআন; ১৩: ১৯-২২)।

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্র আদেশসমূহ পালন এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জনে তৎপর, আখিরাতের জবাবদিহির ব্যাপারে সদা সতর্ক, নামায কায়েম ও যাকাত-সাদাকা প্রদানে আন্তরিক, ধৈর্যশীল এবং উত্তম কাজের দ্বারা স্বীয় মন্দ কাজের প্রতিবিধানকারী ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২২. আরও দ্র., আল-কুরআন ০২ : ১৬৮।

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ۞

"যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।" আল-কুরআন; ৩৯ : ১৮।

এ আয়াতে সত্য ও ভালো বিষয়ে উত্তমরূপে শ্রবণ এবং তার যথার্থ অনুসরণ করাকে জ্ঞানীদের ভূষণ ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্ঞানী হওয়ার জন্য উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে কিছু মন্দ গুণ পরিহার করা দরকার। কেননা কিছু মন্দ গুণ রয়েছে, যা জ্ঞানী হওয়ার পথে অন্তরায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ সত্যকে উপেক্ষা, স্রষ্টার প্রতি উদাসীনতা, শিরকে নিমজ্জিত হওয়া, প্রবৃত্তিপূজা, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি। এ ধরনের মন্দ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে কুরআন জ্ঞানী বলে স্বীকার করেনি।[২৩]

এ সম্পর্কিত কুরআনের একটি ভাষ্য নিম্নে,

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ . وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِیْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ .

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর', তখন তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব। তাদের বাপ-দাদারা যদিও কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তবুও? যারা কুফর করে তাদের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যে হাঁক– ডাক ছাড়া আর কোন কিছুই শোনে না, (তারা) বধির, বোবা, অন্ধ। তাই তারা কিছুই বুঝবে না। আল-কুরআন; ০২ : ১৭০-১৭১।[২৪]

وَ الرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ ۞

"আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত; আর বোধশক্তিসম্পন্নরা ছাড়া অন্য কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।" আল-কুরআন; ০৩ : ০৭।

---

২৩. আরও দ্র. আল-কুরআন ০৫ : ৫, ১০৩, ৮ : ২২, ১৩ : ০৪, ১৬ : ১২-১৩, ৬৫-৬৭, ২২ : ৪৬, ২৩ : ৮০, ২৫ : ৪৩-৪৪, ২৯ : ৬১-৬৩, ৩০ : ২৪,২৮, ৩৯ : ৪৩, ৪৯ : ০৪।

২৪. আল-কুরআন,০২ : ১৭০-১৭১।

এ আয়াতে বর্ণিত الرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ (গভীর জ্ঞানী লোক) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যার শপথ যথার্থ, যে সত্যবাদী, যার পেট হারাম খাদ্য থেকে পবিত্র এবং যার যৌনাঙ্গ ব্যাভিচার হতে পবিত্র সে হলো গভীর জ্ঞানী।[২৫]

উল্লেখিত আয়াতসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, জ্ঞানী হলেন (তারা), যারা মহান আল্লাহ, তাঁর কিতাব, নবী-রাসূলগণে ও আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী, যারা চিন্তাশীল, বিচক্ষণ, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও সৃষ্টিবৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন। যারা মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করেন, তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করেন, সলাত কায়েম করেন, যাকাত ও দান-সাদাকা করেন, আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা অটুট রাখেন, স্বীয় পাপ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, পরকালে মন্দ হিসাবের ভয় করেন এবং ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করেন। তারা সত্যের অনুসারী, ন্যায়পরায়ন, মিথ্যা ও অন্যায় বর্জনকারী, ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের বোধ শক্তিসম্পন্ন, সত্যকে উত্তমভাবে শ্রবণকারী, সত্য অনুধাবন ও গ্রহণে সচেষ্ট এবং একই সাথে তারা সত্যকে উপেক্ষা, স্রষ্টার প্রতি উদাসীন, প্রবৃত্তিপূজা, উগ্র-উচ্ছৃখলতা, শিরক-কুফর ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আত্মরক্ষাকারী।

কুরআনে উল্লেখিত গুণসমূহের আলোকে মুসলিম দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে জ্ঞানীর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে

- হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন,

  العالم مَن خشي الرحمن بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سَخط الله فيه،

  "জ্ঞানী হলেন যিনি না দেখে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করেন, আল্লাহ্ যা পছন্দ করে তিনি তাতে আগ্রহী হন এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করে তিনি তা থেকে বিরত থাকেন।"[২৬]

- বরী ইবনু আনাস (রহ.) বলেন,

  من لم يخش الله تعالى فليس بعالم.

  "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে না সে জ্ঞানী ('আলেম) নয়।" [২৭]

- মুজাহিদ (রহ.) বলেন,

  إنما العالم من خشي الله عز وجل.

  "জ্ঞানী ('আলেম) সে ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করেন।"[২৮]

---

২৫. *তাফসীর ইবন কাছীর* (সৌদী আরব : দারুত তাইয়্যেবাহ, ১৪২০হি.), খ.০২, পৃ. ১২।

২৬. *তাফসীর ইবন কাছীর*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৬, পৃ. ৫৪৫।

২৭. *তাফসীর আল-কুরতূবী* (বৈরুত : দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রী.), খ. ১৪,পৃ. ৩৪৪।

- সা'দ ইবন ইবরাহীম (রহ.) কে জিজ্ঞেসা করা হলো, মদীনার বড় 'আলেম কে? তিনি বললেন, 'যিনি মহান আল্লাহ্কে অধিক ভয় করেন'।[২৯]
- 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) বলেন,

  ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية.

  "অধিক হাদীছ বর্ণনা জ্ঞান নয়, বরং আল্লাহ্ ভীতিই হলো প্রকৃত জ্ঞান।"[৩০]
- 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন,

  العالم بالرحمن مَنْ لم يشرك به شيئا، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله.

জ্ঞানী ('আলেম) সেব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক করে না, তাঁর কৃত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম গণ্য করেন, তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ যথাযথ রক্ষা তথা পালন করেন, আর দৃঢ় বিশ্বাস করেন তাঁর সাথে সাক্ষাতকে এবং নিজ কর্মকাণ্ডের হিসাবের বিষয়ে।[৩১]

মোটকথা, ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানী ('আলেম) সেই ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহ্র পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত, তাঁর কুদরত, দয়া-অনুগ্রহ, সৃষ্টিজগত ও সৃষ্টিবৈচিত্র্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন, হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ যথার্যথভাবে পালন করেন এবং কুরআনে উল্লেখিত সদ্গুণাবলী অর্জন ও মন্দ বিষয়সমূহ পরিহার করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তি যে শাখার জ্ঞান বিতরণ করবেন তার প্রতি তিনি অনুসন্ধিৎসু, আন্তরিক, সতর্ক, সুদক্ষ ও বিনয়ী হবেন। তাই উল্লেখিত উত্তমগুণাবলীর পূর্ণমাত্রায় যার মধ্যে রয়েছে তিনি সত্যিকার জ্ঞানী, আর যার মধ্যে আছে এ সব সদগুণের অভাব আছে এবং মন্দগুণসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, তিনি সত্যিকার ও পূর্ণ জ্ঞানী নন, তিনি যতো বড় ডিগ্রির অধিকারী হোন না কেনো।

জ্ঞানীর মর্যাদা

আল-কুরআন জ্ঞানীদের সুউচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে জ্ঞান আলো এবং অজ্ঞতা অন্ধকার স্বরূপ। আর জ্ঞানীরা জীবিত ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এবং অজ্ঞরা অন্ধ ও মৃতবৎ।

এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে,

وَ مَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ . وَ لَا الظُّلُمٰتُ وَ لَا النُّوْرُ . وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُوْرُ . وَ مَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَ لَا الْاَمْوَاتُ.

---

২৮. *তাফসীর আল-কুরতুবী*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৪, পৃ. ৩৪৪।

২৯. *তাফসীর আল-কুরতুবী*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৪, পৃ. ৩৪৪।

৩০. *তাফসীর ইবন কাছীর*, *প্রাগুক্ত*, খ. ০৬, পৃ. ৫৪৫; আবূ নুআইম ইসপাহানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ০১, পৃ. ১৩১।

৩১. *তাফসীর ইবন কাছীর*, *প্রাগুক্ত*, খ. ০৬, পৃ. ৫৪৪।

"সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, আর না অন্ধকার ও আলো, আর না ছায়া ও রৌদ্র, এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত।" আল-কুরআন; ৩৫ : ১৯-২২।[৩২]

উল্লেখিত আয়াতে জ্ঞানকে আলো এবং জ্ঞানীকে জীবিত ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর অজ্ঞতাকে অন্ধকার এবং অজ্ঞকে অন্ধ ও মৃতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরও বলা হচ্ছে, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানী ও মূর্খের দৃষ্টিভঙ্গি এক সমান নয় এবং উভয়ের মর্যাদায় বেশ তারতম্য রয়েছে। আবার অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এক সমান নয় এবং এ প্রসঙ্গে এও বলা যেতে পারে, অন্ধ ব্যক্তি ভালো-মন্দ দেখতে পায় না; ফলে সে যে কোন মুহূর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। পক্ষান্তরে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ভালো-মন্দ দেখতে পায়; ফলে সে নিজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। জ্ঞানীরা জ্ঞানের আলোর সাহায্যে উত্তমকে গ্রহণ এবং মন্দ থেকে নিজদের রক্ষা করতে পারে কিন্তু মূর্খরা তা পারে না।

জ্ঞানীর মর্যাদা সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

"বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।" আল-কুরআন, ৩৯:০৯।[৩৩] অন্যত্র এসেছে,

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া আর কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই, আর ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্র নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া আর কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" আল-কুরআন; ০৩:১৮।[৩৪]

এখানে প্রথমোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ জ্ঞানীদের প্রশংসা করেছেন এবং পরবর্তী আয়াতে জ্ঞানীদের মর্যাদা প্রকাশার্থে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাদের পাশাপাশি জ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞান প্রচারের জন্য ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি জ্ঞান প্রচারকের উঁচু মর্যাদা তুলে ধরেছেন। জ্ঞান প্রচারকের কাতারে নিজেকে শামিল তিনি বলেছেন,

وإنما بعثت معلما.

"আমি তো শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।"[৩৫]

---

৩২. আরও দ্র., আল-কুরআন ৪০ : ৫৮।

৩৩. আরও দ্র., আল-কুরআন ০৯ :৭৫-৭৭।

৩৪. আরও দ্র., আল-কুরআন, ১৪ : ৫২।

৩৫. *সুনান ইবন মাজাহ*, মুকাদ্দামাহ, বাব ফাদলিল 'উলামায়ি ওয়াল হাছ্ছি 'আলা তালাবিল 'ইলমি, হাদীস নং ২২৯।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কল্যাণকর জ্ঞানের প্রচারককে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।"[৩৬]

জ্ঞান বিতরণকারীর প্রশংসায় তিনি আরও বলেন,

أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.

"সর্বোত্তম সাদাকা হলো কোন মুসলমান ব্যক্তির 'ইলম শিক্ষা করা, অতঃপর তা তার মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেওয়া।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞান শিক্ষাদানকারীকে শ্রেষ্ঠ দাতা অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

هل تدرون من أجود جودا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : الله تعالى أجود جودا ثم أنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره .

তোমরা কি জানো, সবচেয়ে বড় দানশীল কে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জনেন। তিনি বললেন, সবচেয়ে বড় দানশীল হলেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা। তারপর আদম সন্তানের মধ্যে বড় দানশীল হলাম আমি। এরপর বড় দানশীল হলো ঐ ব্যক্তি যে জ্ঞান শিক্ষা করার পর এর প্রচার ও শিক্ষাদানে রত থাকে।[৩৮]

পূর্ণিমার রাতে তারকারাজির ওপর চাঁদের যেমন মর্যাদা জ্ঞানীর মর্যাদা তদ্রুপ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.

যদি কেউ জ্ঞানার্জনের মানসে কোন পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথসমূহের মধ্যকার কোন একটি পথ সহজ করে দেন। ফেরেশতাগণ শিক্ষার্থীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য তাদের পাখাগুলি বিছিয়ে দেন। 'আলেম (জ্ঞানী) এর জন্য আসমান এবং যমিনের সকলেই ক্ষমাপ্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যকার মাছও। সমস্ত তারকাররাজির উপর পূর্ণিমা

---

৩৬. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাব খাইরুকুম মান তা'য়াল্লামাল কুরআন ওয়া 'আল্লামাহ, হাদীস নং ৪৭৩৯।

৩৭. *সুনান ইবন মাজাহ*, মুকাদ্দামাহ, বাব সাওআবি মু'আল্লিমিন নাস বিল খাইরি, হাদীস নং ২৪৩।

৩৮. *মিশকাত*, কিতাবুল 'ইলম, ৩য় পরিচ্ছদ, হাদীস নং ২৫৯।

রাতের চাঁদের যেমন মর্যাদা, ইবাদতকারীর উপরে 'আলিমের ও মর্যাদা তদ্রূপ। 'আলেমরাই হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীগণ (আ.) নগদ অর্থের ভাণ্ডার উত্তরাধিকাররূপে রেখে যাননি। তাঁরা শুধু 'ইলম-এর উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি 'ইলম গ্রহণ করলো, সে নবীদের উত্তরাধিকার থেকে একটি বড় অংশ গ্রহণ করলো।[৩৯]

উপকারি বিষয়ের জ্ঞান বিতরণকারীর মর্যাদা ও প্রতিদান অপরিসীম।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান এবং যমিনের অধিবাসীগণ, এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও পানির মাছও মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষাদানকারীদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।" [৪০] তিনি আরও বলেন,

من علم علما فله أجر من عمل به.لا ينقص من أجر العامل.

"যে ব্যক্তি কোন জ্ঞানের শিক্ষা দান করলো তাকে যত মানুষ সেই জ্ঞান অনুসারে 'আমল করবে তাদের সমান সওয়াব দান করা হবে। তাতে আমলকারীদের সওয়াবে হ্রাস পাবে না।"[৪১]

জনৈক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) কে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করলে তিনি বলেন, "আমি কি তোমাকে জিহাদের চেয়েও উত্তম কিছুর কথা বলবো না? তা হলো, তুমি একটি মাসজিদ বানাবে এবং সেখানে মানুষকে কুরআন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ ও ফিক্হের জ্ঞান শিক্ষা দিবে।"[৪২]

জ্ঞান বিস্তারে জ্ঞানীদের দায়িত্ব-কর্তব্য

সমাজ থেকে অজ্ঞতা-মূর্খতা দূরীকরণে ইসলাম জ্ঞান চর্চা ও বিতরণের ওপর বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছে। জ্ঞানের সর্বাধিক সুফল লাভের জন্য কুরআন প্রতিটি জনপদের একদল লোককে সর্বদা শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿﴾

৩৯. *আবূ দাউদ*, কিতাবুল 'ইলম, বাবুল হাছ্ছি 'আলা তালাবিল 'ইলমি, হাদীস নং ৩৬৪১।

৪০. *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল'ইলম, বাব মা জা- ফী ফাদলিল ফিকহি 'আলাল ইবাদাতি, হাদীস নং ২৬৮৫।

৪১. *সুনান ইবন মাজাহ*, মুকাদ্দামাহ, বাব সাওআবি মু'আল্লিমিন নাস বিল খাইরি, হাদীস নং ২৪০।

৪২. ইবন 'আবদিল বার, *জামি'উ বয়ানিল 'ইলম*, খ. ০১, পৃ. ১৪১, রিওয়ায়াত নং ১৩০ এবং খ. ০১, পৃ. ২৫৯, রিওয়ায়াত নং ২৪৩।

মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসে, যাতে তারা সতর্ক হয়। আল-কুরআন; ০৯: ১২২।

ব্যক্তি নিজেকে সুশিক্ষিত করার সাথে সাথে অন্যদের নিকটও জ্ঞানের প্রসার ঘটাবে– এ প্রসঙ্গে কুরআনে জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। জ্ঞান প্রচার না করাকে ইসলামে বড় ধরনের অপরাধ গণ্য করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ ۞

"আর স্মরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না।" আল-কুরআন; ০৩ : ১৮৭।

উল্লেখিত আয়াত থেকে জ্ঞান বিস্তারের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সেই সাথে আরও জানা যায় যে, সত্য ও কল্যাণকর জ্ঞান অবিকৃত ও বিশুদ্ধভাবে মানুষের নিকট প্রচার ও প্রসার করা জ্ঞানীগণের কর্তব্য। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞান একটি পবিত্র আমানত।

জ্ঞান বিস্তারে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।[৪৩] এক্ষেত্রে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামের সূচনালগ্নেই তিনি জ্ঞান বিস্তারে মক্কায় '*দারুল আরকাম*'[৪৪]কে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলেন। মদীনায় হিজরতের পর তিনি তাঁর মাসজিদকে (*মাসজিদুন নববী*) জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। শিক্ষা বিস্তারের প্রতি তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলেছেন,

بلغوا عني ولو آية .

"তোমরা আমার থেকে একটি বাণী হলেও অন্যের নিকট প্রচার কর।"[৪৫]

রাসূলুল্লাহ(সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে যে সব মৌলিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তন্মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নির্দেশ ছিল অন্যতম। তিনি বলেন,

ليبلغ الشاهد الغائب.

"উপস্থিত ব্যক্তি যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছে দেয় "।[৪৬]

---

৪৩. আল-কুরআন, ০৫:৬৭।

৪৪. মক্কা নগরীর সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সাহাবী হযরত আরকাম (রা.) এর গৃহে অবস্থিত ইসলামের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রই '*দারুল আরকাম*' নামে পরিচিত।

৪৫. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব মা যাকারা 'আন বানী ইসরাঈল, হাদীস নং ৩২৭৪।

জ্ঞান বিস্তারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। জ্ঞানকে তিনি সর্বসাধারণে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেছেন,

بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا.

"তোমরা লোকদের সুসংবাদ দাও, ঘৃণা-বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করো না, তাদের জন্য (কাজ-কর্ম) সহজসাধ্য কর এবং কষ্ট সাধ্য করো না।"[৪৭]

শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নবী (সা.) সব ধরনের সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন এবং পার্থিব সম্পদ হাসিল অপেক্ষা শিক্ষার প্রসারকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইবন সা'দ-এর ভাষ্য,

বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কাফির যোদ্ধা বন্দি হলো। তাদের (অনেকে) সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভ করলো।...যাদের মুক্তিপণ দেয়ার সামর্থ্য ছিলো না এ ধরনের লেখাপড়া জানা বন্দিদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয় মদীনার দশজন করে মুসলিম শিশু-কিশোরের লেখাপড়া শেখানো।[৪৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ উম্মাতকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে বন্দি মুশরিকদের মাধ্যমে লেখাপড়া শিখাতে কোন প্রকার কুণ্ঠবোধ করেননি, বরং তাদেরকে শিক্ষকের মর্যাদা দিয়েছেন। তাই আলী (রা.) বলেন, "জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ। মুশরিকদের থেকে হলেও তা গ্রহণ করো।"[৪৯] তাই প্রয়োজনে অমুসলিমদের থেকে পার্থিব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা যাবে।

নারী শিক্ষার প্রতি ইসলাম শুরু থেকেই গুরুত্ব দিয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর স্ত্রীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য নবী (সা.) [সপ্তাহে বা মাসে] একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন। সেদিন তিনি তাদের মাঝে ওয়ায-নসীহত করতেন এবং শর'য়ী বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।[৫০]

জ্ঞান বিস্তারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দেখানো পথ ধরে সাহাবা, তাবেয়ী ও মুসলিম মনীষীগণ অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু আজকের মুসলিম উম্মাহ এক্ষেত্রে খুবই পশ্চাৎপদ।

---

৪৬. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, বাব কাওলি নাবী সাল্লালাহু 'আলআহি ওয়া সাল্লাম রুব্বা মুবাল্লাগিন আও'য়া মিনাস সামি', হাদীস নং ৬৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হাজ্জ, বাব হাজ্জাতি নাবী সাল্লালাহু 'আলআহি ওয়া সাল্লাম, হাদীস নং ১২১৮।

৪৭. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, বাব মা কানা নাবী সাল্লালাহু 'আলআহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতাখাওয়ালুহুম বিল মাওয়িযাতি ওয়াল 'ইলমি.., হা. নং ৬৯,*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব ফীল আমরি বিত তাইসীর..,হাদীস নং ১৭৩৪।

৪৮. ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা* (বৈরুত : দারু সাদির, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮), খ.০২, পৃ. ২২।

৪৯. আবদুল্লাহ ইবন বার, *জামি'উ বয়ানিল ইলম*,খ.০১, পৃ. ৪৮২, রিওয়ায়াত নং ৪৫৮।

৫০. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, বাব হাল ইয়াজ'আলু লিন-নিসা ইউমুন 'আলা হিদাতিন ফীল 'ইলমি, হাদীস নং ১০১, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, বাব ফাদলি মাই ইয়ামুতু লাহু ওয়ালাদ.., হাদীস নং ২৬৩৩।

তারা পূর্বসূরীদের আদর্শ থেকে অনেকটা বিচ্যুত। ফলে আজ তারা নব্য জাহেলিয়াতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এ অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন কথা-কাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া। তবেই আজকের নব্য জাহেলিয়াতের সকল অমানিশা দূর করা এবং জগতবাসীকে সত্যিকার আলোকিত করা সম্ভব হবে।

জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারের শিষ্টাচার

ইসলামী জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা বিস্তারের কিছু শিষ্টাচার রয়েছে। যেমনঃ ক). জ্ঞানার্জনের জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যাত থাকতে হবে। পার্থিব স্বার্থ, সুনাম অর্জন, বড়ত্ব প্রকাশ ইত্যাদি উদ্দেশে জ্ঞানার্জন না করা। খ).অর্জিত জ্ঞান বিশুদ্ধ সূত্র থেকে গ্রহণ করা। ত্রুটিপূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা। গ). জ্ঞানার্জনের পথে বিনয়, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা। ঘ). জ্ঞানীদের বক্তব্য ও সদুপদেশ ভালোভাবে শ্রবণ এবং তা মেনে চলা। অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা, জ্ঞানার্জনে লজ্জাবোধ না করা। ঙ). জ্ঞান অনুযায়ী 'আমল, আত্মগঠন ও সমাজকে পরিশীলিত করা, অন্যথায় সে জ্ঞান অর্থহীন।[৫১] চ). শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ধর্মবিদ্বেষী শিক্ষকদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই ছাড়া গ্রহণ না করা। আর দীনি জ্ঞান কোন বাতিল আকীদার অনুসারী, বিদ'আতি ও ফাসিক ব্যক্তি থেকে গ্রহণ না করা। ছ). জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে তা প্রচার করা এবং জ্ঞানের সাহায্য মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা। জ). কোন বিষয় ভালোভাবে না জেনে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কথা না বলা কিংবা কাজ না করা, বরং সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং সঠিকত্ব জানা।[৫২] কাউকে ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান না করা অথবা সত্য জ্ঞান গোপন না করা কিংবা জ্ঞানকে বিকৃত না করা– এ ধরনের কাজ করা বড় ধরনের খিয়ানত। ঝ). জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয়সমূহ জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষাদান করা, কম প্রয়োজনীয় বিষয়ে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ না করা এবং নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করা।

৫১. আল-কুরআন, ১৩ : ৩৭।

৫২. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি.

তারাবীহ নামায : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ*

[**সারসংক্ষেপ:** রামযান মাসে ইশার নামাযের পর প্রতি চার রাকাত অন্তর বিশ্রাম নিয়ে ২০ রাকাত তারাবীহ নামায আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় হিজরীতে রোযা ফরয হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অতিরিক্ত নফল নামায আদায় করার প্রথা চালু করেন। পরবর্তীতে হযরত উমার (রা.)-এর আমলে গুরুত্বের সাথে জামাআত সহকারে ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করার রেওয়াজ চালু হয়। হযরত উমার (রা.)-এর খেলাফত আমলে জামাআত সহকারে প্রতি চার রাকাআত অন্তর অন্তর বিশ্রাম নিয়ে তারাবীহ নামায আদায় করার রীতি চালু হয়ে অদ্যাবধি মক্কা শরীফের আল-মাসজিদুল হারাম ও মদীনা শরীফের আল-মাসজিদুন নাবভীসহ একই রীতি পৃথিবীর সবর্ত্র প্রচলিত রয়েছে। হযরত উমার (রা.)-এর খিলাফতের পূর্বে এটি জামাআত সহকারে আদায় করা হয়নি। তাই বর্তমানে কেউ কেউ ২০ রাকাত তারাবীহ নিয়ে প্রশ্ন উত্তাপন করেন। তাঁদের মতে, যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বাকার ছিদ্দিক (রা.)-এর আমলে এরূপ রীতির প্রচলন ছিলো না সেহেতু এটি বিদআত। তাঁরা আরও বলেন, তারাবীহ নামায পড়তে হলে ৮ রাকাত পড়তে হবে; ২০ রাকাত পড়া বিদআত। আলোচ্য প্রবন্ধে হযরত উমার, হযরত উসমান, হযরত আলী (রা.)সহ পরবর্তীতে চার মাযহাবের ইমামগণের অভিমত পর্যালোচনা করে উত্তাপিত দ্বন্দ্ব নিরসন করা হয়েছে। আর প্রমাণ করা হয়েছে যে, তারভীহ নামায ৮ রাকাত নয়; বরং ২০ রাকাত।]

ভূমিকা: রামযান মাস বরকতময় মাস। এ মাসে আল্লাহ তা'আলা রোযা ফরয করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য তারাবীহ্র নামায সুন্নাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রোযা পালন করলে যেরূপ অতীত জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়, তেমনি তারাবীহ্র নামায আদায় করলেও আল্লাহ তা'আলা অতীত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্‌ইহি ওয়াসাসল্লাম কখনো তারাবীহ্র নামায ২০ রাকাত আদায় করেছেন। আবার কখনো ৮রাকাত আদায় করেছেন বলে হাদীস সূত্রে জানা যায়। তবে হযরত উমার (রা.)-এর খেলাফত কাল থেকে ২০রাকাত তারাবীহ্র উপর সকল সাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেন। হযরত উসমান (রা.)ও হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত কালেও জামা'আতসহ তারাবীহ্র নামায ২০রাকাতআদায় করা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সুন্নাত যেরূপ তোমাদের জন্য পালনীয়, সেরূপ আমার খলিফাদের সুন্নাতও তোমাদের জন্য পালনীয়।[১] ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, মুয়াসসিতুর রিসালাহ, প্রকাশ ১৯৯৯ খ.২৮, পৃ. ৩৬৭

উম্মতের মধ্যে খোলাফায়ে কেরামের সুন্নাত মুতাবেক ২০ রাকাত তারাবীহ পালিত হয়ে আসছে। বর্তমানেকিছু আলিম বলছে- তারাবীহ্র নামায২০ রাকাত নয়, ৮রাকাত।[২]এ বিষয়ে ইমামগণের অভিমতসহ হাদীসের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হলো।

তারাবীহ্র নামকরণ:

আরবী তারাবীহ শব্দটি তারবীহাতুন এর বহুবচন। এর অর্থ আরাম করা বা বিশ্রাম করা। তারাবীহ নামাযের প্রতি চার রাকাত নামাযের অন্তর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়া হয় বিধায় এ নামাযকে তারাবীহ্র নামায বলা হয়। রামযান মাসে এশার নামাযের ফরয ও সুন্নাত আদায় করে এবং ভিতিরের নামাযের পূর্বে তারাবীহ্র নামায পড়া হয়। তারাবীহ্র নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। তারাবীহ্র নামায সিয়াম সাধনারই অংশ। আল্লাহ তা'আলা রমযান মাসে যে অগণিত রহমত, বরকত ও ফযীলত রেখেছেন তন্মধ্যে তারাবীহ্র নামায আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের এক বড় মাধ্যম।নাসাঈ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন-[৩]

إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه

অর্থ-'আল্লাহ তা'আলা রামযানের রোযা ফরয করেছেন; আমি তোমাদের জন্য তারাবীহ পড়া সুন্নাত করেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে'কিয়ামুল লায়ল' দ্বারা তারাবীহ্র নামায উদ্দেশ্য। প্রথম যুগে এটি কিয়ামুল লায়ল হিসেবে পরিচিত ছিল। পরে এটি তারাবীহ নামে প্রসিদ্ধ হয়। রামযান মাসের 'কিয়ামুল লায়ল'-কে সাহাবীগণ তারাবীহ্র নামায হিসেবে নাম করণ করার বিষয়টি হযরত আয়েশা (রা.)থেকে বর্ণিতহাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৪]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِى اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَتَرَوَّحُ ، فَأَطَالَ حَتَّى رَحِمْتُهُ فَقُلْتُ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ : أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟. تَفَرَّدَ بِهِ الْمُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادٍ. وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ. وَقَوْلُهُ : ثُمَّ يَتَرَوَّحُ. إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ أَصْلٌ فِى تَرَوُّحِ الإِمَامِ فِى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ.(السنن الكبرى للبيهقي)

অর্থ-হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরাতের বেলা চার রাকাত নামায পড়ে বিশ্রাম করতেন। এভাবে তিনি দীর্ঘক্ষণ নামায আদায় করতেন। তাঁকে বেশি নামায পড়তে দেখে আমার কষ্ট হতো। আমি

২ নাসের উদ্দিন, সালাতুত তারাভীহ, মাকতাবতুল মা'রিফ, রিয়াদ, প্রকাশ ১৪২১হি.

৩ আবূ আব্দুর রাহমান আন নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত প্রকাশ ১৯৯১, হাদীস নং ২৫২০ বাবু যিকরি ইখতিলাফি ইয়াহইয়া ইবন আবি কাছীর ওয়ান নাদর।

৪ আবূ বাকর আহমদ আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, মাজলিসু দায়িরাতুল মায়ারিফ আন নিযামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত প্রকাশ,১৩৪৪হি.

বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!(আপনি কেন এত বেশি নামায পড়েন?) আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের পরের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি কি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হবো না? ইমাম বায়হাকী বলেন, মুগীরা ইবন যিয়াদ এ হাদীস একাই বর্ণনা করেন। হাদীস শাস্ত্রানুযায়ী তিনি মজবুত রাভী নন। ইমাম বায়হাকী আরো বলেন, উপরিউক্ত হাদীসের 'ইতারাউয়াহু' (বা বিশ্রাম করা) শব্দ থেকে নামাযে তারাবীহ্‌র নামকরণ ও ভিত্তি গ্রহণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু রাতের নামাযে চার রাকাত অন্তর বিশ্রাম নিতেন সেহেতু এ নামাযের নামকরণ হয়েছে তারাবীহ্‌র নামায হিসেবে।[বায়হাকী, হাদীস নং ৪৮০৭]

পাঠক! রমযান মাসে রাতের বেলায় নামায পড়া, যাকে হাদীসের পরিভাষায় কিয়ামুল লায়ল বলা হয়েছে, সেটাই পরবর্তীতে তারাবীহ্‌র নামায হিসেবে পরিচিত হয়। তাই আমরা হাদীসের কিয়ামুল লায়ল শব্দের অনুবাদ তারাবীহ নামায হিসেবে উপস্থাপন করেছি।

তারাবীহ নামাযের ফযিলত

হাদীস শরীফে তারাবীহ নামাযের অনেক ফযিলত বর্ণিতহয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-এক.বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে-[৫]

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (صحيح البخاري-1910)

অর্থ-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রামযান মাসে বিশ্বাস নিয়ে এবং সাওয়াবের আশায় রোযা রাখল এবং লায়লাতুল কাদরে তারাবীহ আদায় করল আল্লাহ তা'আলা তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। [বুখারী শরীফ-হাদীস নং-১৯১০]

দুই. মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে-[৬]

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَفِىْ خِلاَفَةِ أَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلٰى ذٰلِكَ.(صحيح مسلم)

অর্থ-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতদেরকে রমযান মাসে কিয়ামুল লায়ল তথা তারাবীহ্‌র জন্য উৎসাহিত করতেন। তবে তিনি অত্যাবশ্যক হিসেবে নির্দেশ করতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও

৫ আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইবন কাছীর, ইমামা, বৈরুত খ. ২য় পৃ. ৬৭২

৬ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, আস সহীহ, দারুল জিয়াল, বৈরুত তাবিখ. ২য় পৃ. ১৭৭

সাওয়াবের আশায় তারাবীহ আদায় করে তার অতীত জীবনের গুনাহ মাফ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে পর্দাকরার সময়ওতারাবীহ্র হুকুম এরূপ ছিল এবং হযরত আবূ বকর ছিদ্দিক (রা.)-এর জীবনেও এরূপ ছিল এবং হযরত উমার (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দিকেও এরূপ ছিল। [সহীহ মুসলিমহাদীস নং ১৮১৬]

তিন. বায়হাকী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-[৭]

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنَّهَا، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ -رواه البيهقي

অর্থ-হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রামযান মাস প্রবেশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমর বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন। তিনি এমাসে রাতের বেলাঘুমানের জন্য বিছানায় যেতেন না। রামযান চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি এরূপ আমল করতেন। [বায়হাকী, হাদীস -৩৩৫২]

চার.বায়হাকী শরীফের আরেক হাদীসে তারাবীহ্র গুরুত্বের উপর হযরত আয়েশা(রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে-[৮]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَشْفَقَ مِنْهُ رواه البيهقي

অর্থ-হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রামযান মাস আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রং বদলে যেত। এসময় তিনি বেশি বেশি নামায পড়তেন, বেশি দুআ করতেন এবং বেশি কান্নাকাটি করতেন। [বায়হাকী ,হাদীস-৩৩৫৩]

পাঁচ. নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-[৯]

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه- رواه النسائي

অর্থ-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রামযানে রোযা ফরয করেছেন এবং আমি রামযানে তোমাদের জন্য তারাবীহ সুন্নাত করেছি। অতএব, যে রোযা পালন করবে এবং বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তারাবীহ আদায় করবে সে সদ্য জন্ম নেয়া শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। [নাসাঈ শরীফ, হাদীস-২৫২০]

তারাবীহ নামাযের রাকাত বিষয়ক হাদীস

ক. বুখারী শরীফের বর্ণিত হয়েছে-[১০]

---

৭ আহমদ ইবনুল হোসাইন আল বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ প্রকাশ ২০০৩, খ. ৫ম, পৃ. ২৩৪

৮ প্রাগুক্ত

৯ আন নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, প্রকাশ ১৯৯১ খ., ২য় পৃ.৭৯

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن رسول صلى الله عليه و سلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما أصبح قال (قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم) . وذلك في رمضان –صحيحالبخاري

অর্থ-হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে তারাবীহ্র নামায আদায় করেন। লোকেরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। পরের দিনও একইভাবে তিনি নামায আদায় করেন, তবে সেদিন লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতে অনেক লোকের সমাগম হয়; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হননি। সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা যা করেছ আমি তা দেখেছি । ঘর থেকে বের হতে আমাকে কিছুই বারণ করেনি বরং আমি এ ভয়ে বের হয়নি যে নিয়মিত আদায় করলে তা তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে[আর তোমাদের আদায় করতে কষ্ট হবে] । আর এটি ছিল রামযান মাসের ঘটনা। [বুখারী শরীফ হাদীস নং-৮৮২]

খ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্ন হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন-[১১]

واخرج العسقلاني في التلخيص أنه صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد خشيت ان تفرض عليكم فلاتطيقوها–تلخيصالحبير

অর্থ-হযরত ইব্ন হাজার আসকালানী তাঁর আত তাখলীছ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যে দুদিন সাহাবীদের নিয়ে তারাবীহ আদায় করেছেন সে দু'দিন তিনি বিশ রাকাত নামায আদায় করেছেন। তৃতীয় দিন যখন অনেক লোকের সমাগম হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর তারাবীহ ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে ঘর থেকে বের হন নি। কেননা, ফরয হয়ে গেলে তাদের সকলের পক্ষে তা আদায় করা সম্ভব হবে না।[তালখীছুল হাবীর খ.২য়, পৃ.৫৩]

গ. বুখারী শরীফের আরেক রেওয়ায়তে হাদীসটি আরো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে -[১২]

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا

---

১০ আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইবন কাছীর, ইমামা, বৈরুত খ. ১ম, পৃ. ৩৮০

১১ ইবন হাজর আল আসকালানী, আত তালখীছুল হাবীর, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ১৯৮৯, খ. ২য়, পৃ. ৫৩

১২ আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইবন কাছীর, ইমামা, বৈরুত খ.২য়, পৃ. ৭০৮

معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال (أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) . فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك .

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্য রাতে মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। লোকেরা তাঁর সাথে (জামায়াতসহ তারভীহর) নামায আদায় করলেন। সকাল বেলা লোকেরা তা বলাবলি করলে পরের দিন আরো অধিক লোকের সমাগম হলো। পরের দিন সকাল বেলা তারাও এ নিয়ে বলাবলি করলে তৃতীয় দিন মুসল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে মাসজিদে নামায আদায় করলেন, লোকেরাও তাঁর পিছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করলেন। চতুর্থ দিন এতবেশি লোকের সমাগম হলোযে, মাসজিদে আর জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না।

সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তারাবীহ্র নামায পড়ার জন্য বের হলেন না। লোকেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ফজর হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে নিয়ে ফজর নামায আদায় করে লোকদের মুখোমুখি হয়ে কালিমা শাহাদাত তেলাওয়াত করে বলেন, তোমাদের অবস্থান আমার কাছে গোপন নয়। যদি আমি নিয়মিত তোমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ্র নামায আদায় করি, তা তোমাদের জন্য ফরজ হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি।অথচ তোমরা তা আদায় করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ইন্তিকালের পূর্বে তিনি আর জামায়াত সহকারে রামযানে তারাবীহ আদায় করেন নি। [বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯০৮]

ঘ. মুসতাদারক হাকিমের মধ্যে উক্তহাদীসটি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে-[১৩]

حدثني أبو طلحة بن زياد الأنصاري قال : سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول : قمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شهر رمضان ليلة ثلاث و عشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس و عشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع و عشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع و عشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح و كنا نسميها الفلاح و أنتم تسمون السحور هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه و فيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة و قد كان علي بن أبي طالب يحث عمر رضي الله عنهما على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها

১৩ আল হাকিম নিসাপুরী, আলমুসতাদারক আলাস সহীহাইন, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত প্রকাশ ১৯৯০, খ.১ম, পৃ. ৬০৭

অর্থ: হযরত আবূ তালহা ইবন যিয়াদ আল আনসারী (রহ.) বর্ণনা করেন, আমি নুমান ইবন বশীর (রা.)-কে হিমসের মিম্বরে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রামযানের ২৩ তারিখ রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তারাবীহ (কিয়ামুল লায়ল)আদায় করি। ২৫ তারিখ আমরা রাতের অর্ধেকাংশ পর্যন্ত তাঁর সাথে তারাবীহ (কিয়ামুল লায়ল)আদায় করি। ২৭ তারিখও আমরা তাঁর সাথে অর্ধ রজনী পর্যন্ত তারাবীহ (কিয়ামুল লায়ল)আদায় করি। অতঃপর আমরা ২৯ তারিখও তাঁর সাথে তারাবীহ (কিয়ামুল লায়ল)আদায় করি এ পর্যন্ত যে, মনে হচ্ছিল আমরা ফালাহ (সেহরী) গ্রহণ করতে পারব না। আমরা এর নাম ফালাহ বলতাম আর তোমরা সেহরী বলো।

হাকিম নিশাপুরী বলেন, এ হাদীস ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ হাদীস; কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম কেউ এটি তাঁদের কিতাবে বর্ণনা করেন নি। তিনি আরো বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহ্‌র নামায মাসজিদে আদায় করা সুন্নাত। হযরত আলী (রা.) হযরত উমার (রা.)-কে তারাবীহ্‌র নামায জামায়াতে আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে হযরত উমার (রা.) তারভীহর নামায জামায়াতে আদায় করার রীতি চালু করেন। [আল মুসতাদারক হাদীস নং ১৬০৮]রাতের এক তৃতীয়াংশ, অর্ধেকাংশ ও সেহরীর পূর্ব পর্যন্ত এতো দীর্ঘসময়ে সাহাবীগণ অবশ্যই ২০রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন।

ঙ.সহীহ ইব্‌ন খুযাইমা ও ইবন হাব্বান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে-[১৪]

وكان رسول الله ﷺ يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة أمر فيقول من قام رمضانايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله ﷺ فكان الأمر كذالك في خلافة أبي بكر وصدرامن خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب وصلى بهم فكان ذلك أول ما اجتمع الناس على قيام رمضان

অর্থ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামযানে তারাবীহ্‌র (কিয়ামুল লায়লের) জন্য লোকদের উৎসাহিত করতেন। তবে অত্যাবশ্যক হিসেবে আদায় করার হুকুম দিতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তারাবীহ আদায় করবে তার পূর্বে জীবনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তারাবীহ্‌র এ নীতি অনুসরণ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে পর্দা করেছেন, একইভাবে হযরত আবূ বাকর ছিদ্দিক (রা.)-এর জামানায় অনুরূপ আমল হয়েছে এবং হযরত উমর (রা.)-এর প্রথম জীবনেও এরূপ আমল প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) হযরত উবাই ইবন কা'ব এর ইমামতিতে সকলকে একত্রিত করেন। তিনি লোকদের নিয়ে (২০ রাকাত তারাবীহর) নামায আদায়

১৪ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খোযাইমা, সহীহ ইবন খোযাইমা, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত প্রকাশ ১৯৭০ খ.৩য়, পৃ. ৩৩৮

করেন। এটি ছিল রামযানের তারাবীহ্র জন্য লোকদেরকে প্রথম একত্রিত করণ।[সহীহ ইব্ন খোযাইমা হাদীস নং ২২০৭]

চ. সুনান আবূ দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে-[১৫]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَإِذَا أُنَاسٌ فِى رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَؤُلاَءِ. فَقِيلَ هَؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّى وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ- أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا -رواه ابو داؤد

অর্থ-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন, রামযান মাসের এসময় লোকেরা মাসজিদের বিভিন্ন প্রান্তে নামায পড়ছিলেন। তিনি বললেন, এরা কী করছে? বলা হলো, এ লোকেরা কুরআনের কিছু জানে না, তাই উবাই ইবন কা'ব নামায পড়ছে আর তারা তাঁর পিছনে নামায আদায় করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা সঠিক কাজ করছে, এটি খুবই সুন্দর কাজ।[আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৩৭৯]এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামায়াত সহকারে ২০ রাকাত তারাবীহ্র নামায আদায় করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামানায় শুরু হয়েছে।যাদের পবিত্র কুরআন মুখস্থ নেই, তাদের জন্য কোন ইমামের পিছনে তারাবীহ আদায় করা উত্তম কাজ। আর রাসূলুল্লাহ সেটিকে ভাল কাজ হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়েছেন।

ছ. বায়হাকী শরীফে উপরিউক্ত হাদীসের সাথে নিম্নোক্ত অংশটিও বর্ণিত আছে-[১৬]

وفي رواية للبيقهي قَالَ : قَدْ أَحْسَنُوا ، أَوْ قَدْ أَصَابُوا. وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ لَهُمْ.

অর্থ- ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারা সুন্দর কাজ করেছে এবং সঠিক কাজ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি অপছন্দ করেন নি।[বায়হাকী শরীফ হাদীস নং ৪৭৯৪]

জ.বুখারী শরীফের আরেক বর্ণনায় এসেছে যা ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন-[১৭]

وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو

১৫ আবূ দাউদ সোলাইমান আস সিজিসতানী, সুনানু আবি দাউদ, দারুল কিতাব আল আরবী, বৈরুত, তাবি, খ. ১ম, পৃ. ৫২২

১৬ আবূ বাকর আহমদ আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, মাজলিসু দায়িরাতুল মায়ারিফ আন নিযামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত প্রকাশ,১৩৪৪হি.খ. ২য়, পৃ. ৪৯৫

১৭ ইমাম মালিক ইবন আনাস আল আসবাহী, মুয়াত্তা, দারু ইহয়াউত তুরাছ আল আরাবী, মিসর, তাবি, খ.১ম, পৃ.১১৪

جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله –(رواه البخاري ومؤطا مالك)

অর্থ-হযরত ইব্‌ন শিহাব হযরত উরওয়া ইবন যোবাইর থেকে তিনি হযরত আব্দুর রাহমান ইব্‌ন আব্দুল কারী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনিবলেন, একদা আমি হযরত উমার (রা.)-এর সাথে রামযান মাসে রাতের বেলায় মাসজিদের দিকে বের হই। তখন লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে নামায আদায় করছিল। কেউ নিজে নিজে নামায পড়ছিল। আবার কেউ কেউ অন্যের পিছনে জামায়াতে নামায আদায় করছিল। তখন হযরত উমার (রা.) বললেন, আমি যদি এদেরকে কোন এক কারীর পিছনে একত্রিত করি তবে খুবই ভাল হতো। তিনি সকলকে হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.)-এর পিছনে একত্রিত করলেন (সাহাবীগণ তাঁর পিছনে ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করেন)। অতঃপর আমি হযরত উমার (রা.)-এর সাথে দ্বিতীয় দিন রাতের বেলায় বের হলাম সেদিন লোকেরা একত্রিত হয়ে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.)-এর সাথে তারাবীহ আদায় করছিল, এমতাবস্থায় তাদের দেখে তিনি বললেন, এটি খুবই সুন্দার বিদআত। যারা নামায আদায় করছে তাদের চেয়ে যারা ঘুমাচ্ছে তারা খুবই ভাল; এদ্বারা তিনি তাদের শেষ ভাগের তারাবীহ্‌র কথা বুঝিয়েছেন। পূর্বে লোকেরা রাতের প্রথম দিকে তারাবীহ শেষ করত। [বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯০৬ ইমাম মালিকও এ হাদীসটি তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ২৫০]

ঝ. আল মুগনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে-[১৮]

عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وقال ابن قدامة في المغني وهذا كالاجماع –المغني

অর্থ-হযরত ইয়াযিদ ইবন রোমান (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, লোকেরা হযরত উমার (রা.)-এর জামানায় ভিতিরসহ মোট ২৩ রাকাত নামায আদায় করত (অর্থাৎ, ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত ভিতির)। ইব্‌ন কুদামা তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে বলেন ২০ রাকাত তারাবীহ্‌র উপর ইজমা হয়েছে। [আল মুগনী, খ.১, পৃ.৮৩৩]

ঞ. ইমাম মালিকের (রহ.) মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول :ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف –رواهمالكفيالمؤطا

১৮ ইবন কুদামা আল মুকাদ্দেসী, আল মুগনী ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ, দারুল ফিকর, বৈরুত প্রকাশ, ১৪০৫হি, খ. ১ম, পৃ. ৮৩৩

অর্থ-হযরত মালিক (রহ.) বর্ণনা করেন আমি দাউদ ইব্ন হুছাইন (রহ.)-এর কাছে শুনেছি তিনি প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত আরজ (রহ.) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে রামযান মাসে কাফেরদের লা'নত করতে শুনেছি। তিনি আরো বলেন, কারী প্রথম আট রাকাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেন। আর বাকী বার রাকাতে যখন ইমাম তাদের নিয়ে নামায পড়তেনতখন দেখা যেতো যে, ইমাম দ্রুত নামায আদায় করছেন।[মুয়াত্তা হাদীস নং ২৫৩]

ট.জামে তিরমিযীতে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন-[১৯]

عن أبي ذر : قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله ! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعى أهله ونسائه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح ؟ قال السحور قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري و ابن المبارك و الشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة.

অর্থ-হযরত আবূ যর গিফরী (রা.)থেকে বর্ণিত আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে রোযা রাখি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে নিয়ে ২২ তারিখ পর্যন্ত তারাবীহ্‌র নামায পড়েন নি। রামযান মাসের ২৩ তারিখ তিনি আমাদেরকে নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তারাবীহ্‌র নামায পড়েন। ২৪ তারিখ তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ পড়েন নি। পঁচিশ তারিখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্ধ রাত পর্যন্ত তারাবীহ্‌র নামায আদায় করেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের বাকী অংশ যদি আপনি আমাদেরকে এ নামায পড়িয়ে দিতেন? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহ আদায় করে ফিরে গেল; তার জন্য সারা রাত তারাবীহ পড়ার সাওয়াব লিখা হয়। এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ পড়েননি। তবে ২৭ তারিখ তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ আদায় করেন। তিনি তাঁর পরিবারের সকলকে ডেকে পাঠান এবং আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তারাবীহ পড়েন। মনে হচ্ছিল যে, ফালাহ(সেহরীর) গ্রহণের সময় হারাব। প্রশ্ন করা হলো ফালাহ কী? তিনি বলেন, সেহরী। [তিরমিযী হাদীস নং ৮০৬]ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।

---

১৯ আবূ ঈসা আত তিরমিযী, আল জামে আস সহীহ, দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত খ. ৩য়, পৃ. ১৬৯

আহলে ইলমের মাঝে রামযানেরতারাবীহ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তারাবীহ ভিতিরসহ ৪১রাকাত। এটি মাদীনা বাসীদের আমল। মাদীনাবাসীদের অভিমতও এটি। আর হযরত উমার (রা.) ও হযরত আলী (রা.)সহ অধিকাংশ সাহাবীর মতে তারাবীহ ২০রাকাত। হযরত সুফিয়ান সাওরী, ইব্ন মুবারক ও ইমাম শাফেঈ (রাহ.) এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম শাফেঈ (রাহ.) বলেন, আমি আমার প্রিয় শহর মক্কায় লোকদেরকে বিশ রাকাত তারাবীহ্র নামায আদায় করতে দেখেছি।

ঠ. আল মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত আছে-[২০]

عن ابن عباس رض قال ان النبي ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر –رواهابنابيشيبهفيالمصنف

অর্থ-হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরামযানে ভিতির ছাড়া ২০রাকাত তারাবীহ আদায় করতেন। [মুসান্নাফ, ইবন আবী শায়বা, খ.২ পৃ.১৬৪]

উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উমার (রা.)-এর খেলাফত কালে সকল সাহাবী ২০রাকাত করে তারাবীহ্র নামায আদায় করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর থেকে বর্ণিত হাদীস এর জবাব

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِى.

অর্থ-হযরত আবি সালমা ইবন আব্দির রাহমান (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রামযানে রাসূলুল্লাহর নামায কেমন ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামযান ও অন্যান্য সময়ে রাতে ১১ রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি খুব সুন্দরভাবে চার রাকাত করে নামায পড়তেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি আরো চার রাকাত নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নামায প্রশ্নাতীত সুন্দর ছিল। অতঃপর তিনি তিন রাকাত ভিতির পড়তেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভিতিরের পূর্বে ঘুমাবেন?তিনি বললেন, আমার চোখ ঘোমায় কলব ঘোমায়না।[২১] (বুখারী ও মুসলিম-১৭৫৭)

---

২০ ইবন আবি শায়বা, আবূ বাকর আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল কূফী, মুসান্নাফ, দারুস সালফিয়া আল হিনদিয়া, তাবি, খ.২য়, পৃ.১৬৪।

২১ বুখারী, আস সহীহ, বাবু ফাদলে মান কামা রামদান; মুসলিম,বাবু সালাতিল লাইল ফি রামদানা।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে ৮রাকাত তারভীহর কথা বলা হয়েছে। হযরত উমার (রা.)-এর জামানায় সকল মুহাজির ও আনসারী সাহাবীর ইজমার মাধ্যমে তা রহিত হয়। সকলই ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন। হযরত উমার (রা.)-এর জামানায় যেভাবে ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় হয়েছে সেভাবে হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর আমলে ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় হয়েছে।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফত আমলে তারাবীহ্র নামায:

হযরত উমার (রা.) খিলাফতের পর হযরত উসমান (রা.)-এর জামানায়ও লোকেরা ২০ রাকাত তারাবীহ্র নামায আদায় করেছেন-[২২]

عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال وكانوا يقرؤون بالمئتين وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شده القيام -البيهقي في سننه الكبرى

অর্থ-হযরত সায়েব ইবন ইয়াযিদ (রহ.) বর্ণনা করেন, লোকেরা হযরত উমার (রা.)-এর জামানায় রামযান মাসে ২০রাকাত তারাবীহ আদায় করতেন। তারা প্রায় দুইশত আয়াত তেলাওয়াত করতেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর জামানায় এত লম্বা তারাবীহ্র নামায হত যে, তারা লাঠির উপর ভর দিয়ে নামায আদায় করতেন। [বায়হাকী শরীফ হাদীস নং-৪৩৯৩, ৪৩৮৯]

হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত আমলে তারাবীহ্র নামায

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি তারাবীহ্র নামায হযরত উমারের (রা.) আমলে জামায়াত সহকারে ২০ রাকাত আদায় করার জন্য হযরত আলী (রা.) তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। যা মুসতাদারক হাকিম গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমার ও হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের পর হযরত আলী (রা.)-এর জামানায়ও লোকেরা তারাবীহ্র নামায ২০রাকাত আদায় করতেন-[২৩]

عن شبير بن شكل وكان من اصحاب علي رض أنه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث –رواهابنأبيشيبيهفيالمصنفوالبيهقيرقمالحديث 4395

২২ আবূ বাকর আহমদ আল বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, মাজলিসু দায়িরাতুল মায়ারিফ আন নিযামিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত প্রকাশ,১৩৪৪হি.,খ. ২য়, পৃ. ৪৯৬

২৩ প্রাগুক্ত

অর্থ-হযরত শাব্বীর ইবন শাকল (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীরা রামযান মাসে ২০ রাকাত তারাবীহ্‌র নামায আদায় করতেন। এরপর তারা ৩ রাকাত ভিতির আদায় করতেন।[মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বাহ ও বায়হাকী শরীফ হাদীস নং ৪৩৯৫]

عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث رواه ابن أبي شيبه في المصنف رقم الحديث 7690

অর্থ-হযরত সাঈদ ইবন উবাইদ (রহ.) বর্ণনা করেন, যে আলী ইব্‌ন রাবীয়া রামযান মাসে পাঁচ তারভীহা করে তারাবীহ্‌র নামায আদায় করতেন এবং পরে তিন রাকাত ভিতির আদায় করতেন। [মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা হাদীস নং ৭৬৯০]

খোলাফায়ে রাশেদুনের তিনজনের আমলে তারাবীহ্‌র নামায ২০ রাকাত করে ইমামের পিছনে আদায় করা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে উম্মতের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন- হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-[২৪]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (مسند الإمام أحمد بن حنبل)

অর্থ-হযরত আব্দুর রাহমান ইব্‌ন আমর আস সুলামী (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইরবাদ ইবন সারীয়া (রা.)কে বলতে শুনেছেন-তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খুব গুরুত্বের সাথে নসিহত করেন। যাতে আমাদের অশ্রু ঝরেছিল এবং আমাদের অন্তর সন্ত্রস্ত হয়েছিল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এটি বিদায়ী নসিহত মনে হচ্ছে। আপনি আমাদেরকে কী দায়িত্ব দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে উজ্জ্বল ধর্মের উপর রেখে যাচ্ছি, যার দিন রাত সমান উজ্জ্বল। ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাড়া এ ধর্ম থেকে কেউ বিচ্যুত হবে না। আমার পরে তোমরা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে এবং আমার হেদায়তপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাতের উপর আমল করবে। তাদের অনুসরণ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব। যদিও তাঁরা হাবশী গোলাম হয়। দাঁত কামড়ে এর উপর থাকবে। [মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৭১৪২]

মাযহাবের ইমামগণের মতে তারাবীহ্‌র নামায

২৪ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ, মুয়াসসিতুর রিসালাহ, প্রকাশ ১৯৯৯ খ.২৮, পৃ. ৩৬৭

১. হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আল মাবসুত গ্রন্থে বলা হয়েছে-[২৫]

الأمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا الروافض . فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا

অর্থ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উম্মত তারাবীহ্‌র নামাযের বৈধতা ও শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। রাফেজী ফেরকার লোকেরা ব্যতীত কেউ এর বিরোধিতা করেনি। হানাফীদের বিশুদ্ধ অভিমত হলো-ভিতির ব্যতীত তারাবীহ্‌র নামায ২০ রাকাত।[মাবসুত লিস সারাখসী, খ. ২য়, পৃ. ২৫৬]

২.মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবূল হাসান মালেকীর কিতাব কিফায়াতুত তালিবে এ বিষয়ে তাঁদের মাযহাব উল্লেখ করেন-[২৬]

(وكان السلف الصالح) وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (يقومون فيه) أي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (في المساجد بعشرين ركعة) وهو اختيار جماعة منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد والعمل الآن عليه (ثم) بعد قيامهم بالعشرين ركعة (يوترون بثلاث) أي ثلاث ركعات (ثم صلوا) أي السلف غير السلف الأول في زمن عمر بن عبد العزيز (بعد ذلك) أي بعد القيام بعشرين ركعة غير الشفع والوتر (ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر) وهذا اختيار مالك في المدونة.

অর্থ-সাহাবীগণ হযরত উমার (রা.)-এর সময়কালে মাসজিদে বিশ রাকাত নামায আদায় করেছেন। এ অভিমত ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ ও আহমদ গ্রহণ করেছেন। এর উপর এখনো উম্মতের আমল প্রচলিত আছে। বিশ রাকাত তারাবীহ্‌র পর তারা তিন রাকাত ভিতির আদায় করতেন। অতঃপর হযরত উমার ইব্‌ন আব্দুল আযিযের জামানায় ভিতির ছাড়া ৩৬ রাকাত তারাবীহ আদায় করা হয়। ইমাম মালিক এ অভিমত গ্রহণ করেন।[কিফায়াতুত তালিব, খণ্ড.১ পৃ.৫৮১] উল্লেখ্য, ৩৬ রাকাত তারাবীহ বলতে ২০রাকাত তারাবীহ ও ১২ রাকাত নফল নামায বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসী সাহাবীগণ ২০রাকাত তারাবীহ পড়ার সময় প্রতি চার রাকাত আদায় করে বিশ্রাম করার পরিবর্তে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতেন। আর মদীনাবাসী সাহাবীগণ তারাবীহ্‌র প্রতি চার রাকাত অন্তর বিশ্রামের সময় অতিরিক্ত চার রাকাত নফল আদায় করতেন। প্রথম চার তারভীহায় চার রাকাত করে নফল পড়লে মোট নফল নামায হয় ১৬রাকাত। তারা শেষ তারভীহায় নফল না পড়ে সাথে সাথে ভিতির আদায় করতেন।

শায়খ ইব্রাহীম ইয়াকুবী মালেকী মাযহাবের পরবর্তী আমল বর্ণনা করে তাঁর ফিকহুল ইবাদাত গ্রন্থে বলেন,

---

২৫ আস সারাখসী, শামসুদ্দিন আবূ বাকর, আল মাবসুত,দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ২০০০, খ.২, পৃ.২৫৬

২৬ আবূল হাসান আল মালেকী, কিফায়াতুত তালিব, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১২হি.,খ.১ম, পৃ. ৫৮১

التراويح : وهي قيام رمضان عددها : عشرون ركعة عدا الشفع والوتر ثم جعلت في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ست وثلاثون لكن الذي عليه السلف والخلف أنها عشرون والدليل ما روى البيهقي عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال : وكانوا يقومون بالمئين وكانو يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام (فقه العبادات-الشيخ إبراهيم اليعقوبي الحسني الجزائري المالكي)

অর্থ-হাদীস শরীফে রামযান মাসের যে কিয়ামুল লায়লের কথা বলা হয়েছে তাদ্বারা তারাবীহ্র নামায উদ্দেশ্য। ভিতির ও শফিউল ভিতির ছাড়া তারাবীহ্র নামায বিশ রাকাত। হযরত উমার ইবন আব্দুল আযীযের আমলে মদীনাবাসীরা তারাবীহ ৩৬ রাকাত আদায় করতেন। কিন্তু সকল ইমামের অভিমত হলো, তারাবীহ বিশ রাকাত। দলীল হিসেবে তিনি বায়হাকী শরীফে বর্ণিত হযরত সায়েব ইবন ইয়াযিদের হাদীসটি গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, হযরত উমার ইব্ন খাততাব (রা.)-এর যামানায় সকল সাহাবী বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন। তারা ১০০ আয়াত বিশিষ্ট সূরা তেলাওয়াত করতেন। হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ে তারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর সময় লাঠির উপর ভর দিতেন।[ফিকহুল ইবাদাত, খ.১ম পৃ.১৯৫]

৩.শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম শারবিনী আশ শাফেয়ী তাঁর আল ইকনা গ্রন্থে বর্ণনা করেন-[২৭]

(صلاة التراويح) وهي عشرون ركعة وقد اتفقوا على سنيتها وعلى أنها المرادة من قوله ﷺ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق معتقدا أفضليتهواحتسابا أي إخلاصا سميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون قال الحليمي والسر في كونها عشرين أن الرواتب المؤكدات في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير . ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم ولا يجوز ذلك لغيرهم كما قاله الشيخان لأن لأهلها شرفا بهجرته ودفنه ﷺ

অর্থ, ইমাম শারবিনী তাঁর আল ইক্না গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তারাবীহ বিশ রাকাত। তারাবীহ নামায সুন্নাত, সকল ইমাম এতে ঐকমত্য পোষণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী-'যে রামযান মাসে কিয়ামুল লায়ল আদায় করল বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায়, তার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।' বুখারী শরীফের এ হাদীস দ্বারা তারাবীহ নামাযই উদ্দেশ্য। এ নামাযকে তারাবীহ্র নামায বলার কারণ হলো, তারাবীহ শব্দটি বহুবচন, একবচন হলো, তারভীহাতুন। প্রতি চার রাকায়াতে এক তারভীহা। এ হিসেবে পাঁচ তারভীহায়

২৭ মুহাম্মদ আশ শারবিনী, আল ইকনা, মাকতাবুল বুহুস ওয়াদ দারাসাত, দারু ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১৫হি., খ. ১ম, পৃ. ১১৭

বিশ রাকাত আদায় হয়। ইমাম হালীমি বলেন, একজন ঈমানদারকে দৈনিক ১০ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করতে হয়। এ দশ রাকাতকে রামযানে দ্বিগুণ করা হয়েছে কেননা, এটি একনিষ্ঠতার সাথে বেশি ইবাদত করার মাস।

আর মদীনাবাসীরা ৩৬ রাকাত তারাবীহ আদায় করতেন। কেননা, প্রতি চার রাকাত পর মক্কাবাসীরা কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতেন। আর মদীনাবাসীরা প্রতি চার রাকাতের পর তারভীহা তথা বিশ্রামের সময় অতিরিক্ত চার রাকাত নফল আদায় করতেন। শায়খাইন বলেন, ৩৬ রাকাত তারাবীহ আদায় করা মদীনাবাসী ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। এটি কেবল মাদীনাবাসীদের জন্য বৈধ। তিনি বলেন, মাদীনাবাসীরা বিশেষভাবে সম্মানিত এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে হিজরত করেছেন এবং তিনি সেখানে দফন হয়েছেন।

৪.হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল মুকাদ্দেসী হাম্বলী বর্ণনা করেন-[২৮]

التراويح وهي عشرون ركعة بعد العشاء في رمضان" لأن النبي ﷺ قال: "من صام رمضان وأقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" . متفق عليه. وقام النبي ﷺ بأصحابه ثلاثا ثم تركها خشية أن تفرض فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبي بن كعب. [العدة شرح العمدة لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي]

অর্থ-এশার নামাযের পর তারাবীহ বিশ রাকাত। দলীল হিসেবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিম্নোক্ত হাদীসটি গ্রহণ করেছেন- 'যে ব্যক্তি রামযানের রোযা রাখল এবং রাতে কিয়ামুল লায়ল আদায় করল বিশ্বাস ও সাওয়াবের আশায় তার পূর্বের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।' (বুখারী ও মুসলিম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়ে তিন দিন জামায়াত সহকারে কিয়ামুল লায়ল তথা তারাবীহ আদায় করেছেন। উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন নি। পরর্বতীতে লোকেরা নিজেরা একাকী কিয়ামুল লায়ল বা তারাবীহ আদায় করতেন। হযরত উমার (রা.)-এর খিলাফত আমলে তিনি বিক্ষিপ্ত লোকদেরকে হযরত উবাই ইবন কা'বের (রা.) ইমামতিতে একত্রিত করে ২০ রাকাত তারাবীহ্র নামায আদায় করেন।

ইব্ন তাইমিয়ার অভিমতঃ

---

২৮ আল মুকাদ্দেসী, আবূ মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন, আল উদ্দাহ শারহুল উমদাহ,দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ২০০৫, খ.১ম, পৃ. ৮৩

আহলে হাদীস ফিরকার লোকেরা চার মাযহাবের ইমামগণের চেয়ে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ইব্ন তাইমিয়াকে বেশি পছন্দ করেন। তাদের এ ইমামও তাঁর ফতোয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন-[২৯]

وقال ابن تيمية في الفتاوى ثبت ان ابي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في رمضان ويوتر بثلاث فرأي كثيرا من العلماء ان ذلك هو السنة لانه قام بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر-مجموع فتاوى 191\1

অর্থ-ইব্ন তাইমিয়াহ তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, লোকেরা হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.)-এর পিছনে রামাযান মাসে ২০রাকাত তারাবীহ ও তিন রাকাত ভিতির আদায় করতেন। অধিকাংশ উলামা এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। কেননা, মুহাজির সাহাবী ও আনসার সাহাবী সকলই এরূপ নামায আদায় করেছেন। কেউ এর বিরোধিতা করেনি। [মজমুয়ে ফাতাওয়া, খণ্ড.১, পৃ.১৯১]

উপসংহার: আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে তাঁর সবিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করেছেন। রামযান মাসের ফযিলত, তারাবীহ নামাযের ফযিলত বিশেষতঃ লায়লাতুল কাদর-এর ফযিলত তিনি কেবল উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করেছেন। উপরে বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামযান মাসে পুরো রাত ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। তিনি উম্মতের গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য রামযান মাসে তারাবীহ্র নামায সুন্নাত করেছেন। তবে ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি এ নামায ধারাবহিকভাবে সাহাবীগণের সাথে আদায় করেননি। যা উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য হবে। হাদীস দ্বারা এও প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কখনো ২০রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন। আবার কখনো আট রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন। কিন্তু হযরত উমার (রা.)-এর জামানা থেকে উম্মত ২০ রাকাত তারাবীহ্র উপর ঐকমত্য পোষণ করেন।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী

১. আহমদ ইব্ন হাম্বল, ***মুসনাদ***, মুয়াসসিতুর রিসালাহ, প্রকাশ ১৯৯৯

২. আলবানী, নাসের উদ্দিন, ***সালাতুত তারাবীহ***, মাকতাবতুল মা'রিফ, রিয়াদ, প্রকাশ ১৪২১হি.

৩. আবূ আব্দুর রাহমান আন নাসাঈ, ***আস সুনানুল কুবরা***, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত প্রকাশ ১৯৯১

৪. আবূ বাকর আহমদ ইবনুল হোসাইন আল বায়হাকী, ***আস সুনানুল কুবরা***, মাজলিসু দায়িরাতুল মায়ারিফ আন নিযামিয়া,হায়দারাবাদ, ভারত প্রকাশ, ১৩৪৪হি.

---

২৯ তাকী উদ্দিন ইবন তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, দারুল ওয়াফা, প্রকাশ২০০৫ খ. ১ম, পৃ.১৯১

৫. আবূ বকর আহমদ ইবনুল হোসাইন আল বায়হাকী, ***শুয়াবুল ঈমান***, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ প্রকাশ ২০০৩

৬. আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারী, ***আল জামে আস সহীহ***, দারু ইবন কাছীর, ইমামা, বৈরুত

৭. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, ***আস সহীহ***, দারুল জিয়াল, বৈরুত তাবি

৮. ইবন হাজর আল আসকালানী, ***আত তালখীছুল হাবীর***, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ১৯৮৯

৯. আল হাকিম নিসাপুরী, ***আলমুসতাদারক আলাস সহীহাইন***, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত প্রকাশ ১৯৯০

১০. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খোযাইমা, ***সহীহ ইবন খোযাইমা***, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত প্রকাশ ১৯৭০

১১. আবূ দাউদ সোলাইমান আস সিজিসতানী, ***সুনানু আবি দাউদ***, দারুল কিতাব আল আরবী, বৈরুত তাবি

১২. মালিক ইবন আনাস আল আসবাহী, ***মুয়াত্তা***, দারু ইহয়াউত তুরাছ আল আরাবী, মিসর তাবি

১৩. ইবন কুদামা আল মুকাদ্দেসী,আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ,***আল মুগনী ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ***, দারুল ফিকর, বৈরুত প্রকাশ ১৪০৫হি.

১৪. আবূ ঈসা আত তিরমিযী, ***আল জামে আস সহীহ***, দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত

১৫. ইবন আবি শায়বা, আল কূফী, ***মুসান্নাফ***, দারুস সালফিয়া আল হিনদিয়া

১৬. আস সারাখসী, শামসুদ্দিন আবূ বাকর, ***আল মাবসুত***, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ২০০০.

১৭. আবূল হাসান আল মালেকী, ***কিফায়াতুত তালিব***, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১২হি.

১৮. মুহাম্মদ আশ শারবিনী, ***আল ইকনা***, মাকতাবুল বুহুস ওয়াদ দারাসাত, দারু ফিকর, বৈরুত, প্রকাশ ১৪১৫হি.

১৯. আল মুকাদ্দেসী, আবূ মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন, ***আল উদ্দাহ শারহুল উমদাহ***,দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, প্রকাশ ২০০৫

২০. তাকী উদ্দিন ইবন তাইমিয়া, ***মাজমুউল ফাতাওয়া***, দারুল ওয়াফা, প্রকাশ২০০৫ ।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা
৬০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি.

মানব সৃষ্টি, প্রকৃতি ও প্রবণতা : পরিপ্রেক্ষিত আল-কুরআন

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসাইন*

[**সারসংশ:** আল্লাহ তা'আলা মানুষের পথ চলার জন্য বিজ্ঞানময় কুরআন অবতীর্ণ করেছেন; যা তার প্রতি আল্লাহ্র এক অশেষ নিয়ামত; যার মধ্যে তিনি বান্দার জীবন চলার পথসহ তার সকল দিক ও বিভাগ আলোচনা করেছেন। মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। তার বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও প্রবণতাগুলোও বর্ণনা করেছেন। এগুলোর জন্য তিনি মানদণ্ডও (standered) দিয়েছেন। এগুলোর কোন্‌টি আল্লাহ চান কোন্‌টি চান না, কোন্‌টি মানুষের জন্য শোভন কোন্‌টি শোভন নয়, কোন কর্ম মানুষের জন্য বৈধ কোন্‌টি বৈধ নয়, কোন্‌টি কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর- এরূপ সকল দিক-নির্দেশনা রয়েছে এর মধ্যে। তাকে তার খারাপ স্বভাব ও খারাপ প্রবণতাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে বলা হয়েছে। তার দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার সীমারেখা বর্ণনা করা হয়েছে। তার অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সে যে অপরিসীম নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে এবং যা সে ভোগ করে আসছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সবের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে একজন উন্নত, পরিমার্জিত, পরিশীলিত, দূরদর্শি, সঠিক চিন্তার অধিকারী, দায়িত্বশীল ও কৃতজ্ঞ মানুষরূপে তথা তাঁর প্রকৃত বান্দায় পরিণত করতে চেয়েছেন। যার মাধ্যমে সে পারলৌকিক জীবনে মুক্তি পাবে, পৃথিবীতেও সে মডেল মানুষ হবে। এ সব কারণে পবিত্র কোরআনুল কারিমে বর্ণিত মানুষের কিছু সৃষ্টিগত পরিচয়, তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তার মানবীয় বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও প্রবণতাগুলো কী, সে সম্পদ পেলে, সুখে থাকলে কী করে; সম্পদ না পেলে, বিপদে-কষ্টে থাকলে কী করে, আল্লাহ তা'আলার দানগুলো উপলব্ধি করে কিনা এবং এ সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পছন্দের, নির্দেশিত ও বিধিবদ্ধ রূপটি কী, সে কীভাবে তা অর্জন করে আল্লাহ্র উত্তম বান্দায় পরিণত হবে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।]

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার।

মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ .ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ .ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ .

---

* জেলা শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী।

'যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা মাটি থেকে। এরপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'[১] আর দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি যাঁকে মহান আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর জন্য রহমাত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আরো দরূদ ও সালাম তাঁর পবিত্র পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী তাদের প্রতি।

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করে নেয়ামত বর্ষণ করেছেন। যে কুরআনে অগ্র-পশ্চাত কোন দিক থেকেই মিথ্যার অনুপ্রবেশের লেশমাত্র সুযোগ নেই। কুরআনের যে সকল আয়াতে মানুষের প্রসঙ্গ এসেছে সে সকল আয়াত চিন্তাশীল ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত হলে সে অভিভূত হবে এবং সে তা তুলনাবিহীন, অভাবনীয় একটি মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে দেখতে পাবে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সৃষ্টি, তার প্রকৃতি-প্রবণতা, দায়িত্ব-জবাবদিহিতা ও তার পরিণতির কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া, ইতিহাস ও রহস্য উল্লেখ করেছেন। এর ভেতরে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কল্যাণের বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষের জন্য যা ক্ষতিকর তা থেকে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। এর মাধ্যমে তাকে পরিমার্জিত, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ, সৎকর্মশীল ও বিশ্বাসী সত্তা হিসেবে তৈরি হতে তাগিদ করা হয়েছে এবং তাকে অকল্যাণকর পরিণতি থেকে সতর্ক করা হয়েছে। তাকে স্থায়ী, সুদুরপ্রসারি, কল্যাণকর পরিণতির দিকে আহ্বান করা হয়েছে। যা তার পার্থিব কর্মসমূহের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَہْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا .وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

'নিশ্চয়ই এ কোরআন পথ নির্দেশ করে সে পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার এবং যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[২]

মানুষ নিজকে অনেক শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর মনে করে, অথচ সে খুবই দুর্বল ও ক্ষমতাহীন। সে নিজকে অনেক বুদ্ধিমান ও কুশলী মনে করে, অথচ সে খুবই কম বুদ্ধির অধিকারী। সে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অপরিসীম নিয়ামত ভোগ করছে, অথচ সে তা উপলব্ধি করছে না, সে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে খুবই কম, এমনকি অনেকে

১ সূরা সাজদাহ, ৩২ : ৭-৯।

২ সূরা আল ইসরা, ১৭ : ৯-১০।

আদৌ স্বীকারই করতে চাইছে না। সে কুফরী করছে, শিরক করছে, জুলম করছে, সে খুবই অহংকার করছে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার অস্তিত্ব, অবস্থান, তার সৃষ্টির ইতিহাস ও প্রক্রিয়া, তার স্বভাব ও প্রবণতা, তার সীমাবদ্ধতা ও পরিণতির বিষয়গুলো বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়গুলো প্রত্যেক মানুষের জন্য জানা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ ছোট্ট প্রবন্ধে মানুষের সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই এ প্রবন্ধে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের আলোকে মানুষের সৃষ্টি, এর উদ্দেশ্য, মানুষের প্রকৃতি ও প্রবণতা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'লার পছন্দের দিকগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পৃথিবীকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ .

'আকাশ-পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা আছে এগুলো তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি।'[৩]

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ.

'আর মানুষকেও তিনি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করেননি।'[৪]

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

'মানুষকে পৃথিবীতে তিনি খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আর (স্মরণ করুন,) যখন আপনার রব ফিরিশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাবো,' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই আপনার প্রশংসা, গুণগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা জানি, যা তোমরা জান না'।'[৫]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে খলিফা (প্রতিনিধি) হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, যা ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহ্‌র কথপোকথনের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। এ দ্বারা বোঝা যায় যে খলিফার দায়িত্ব পালন করা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলিফা।

হাদীস শরীফে এসেছে,

---

৩ সূরা ছোয়াদ ৩৮: ২৭।

৪ সূরা আল মু'মিনূন ২৩: ১১৫।

৫ সূরা আল বাকারাহ ২: ৩০।

عن ابن مسعود وابن عباس: إني جاعل في الأرض خليفةً منّي يخلفني في الحكم بين خلقي. وذلك الخليفة هو آدمُ ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها، فمن غير خلفائه، ومن غير آدم ومن قام مقامه في عباد الله -لأنهما أخبرَا أن الله جل ثناؤه قال لملائكته- إذ سألوه: ما ذاك الخليفة؟: إنه خليفة يكون له ذُرّية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضًا. فأضاف الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذُرّية خليفته دونه، وأخرج منه خليفته.

'ইবনে মাসউদ (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ আ'আলা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার মাখলুকের মাঝে আইন পরিচালনায় আমার খলীফা নিয়োগ করব। সে খলীফা হবে আদম এবং ঐ সব বনী আদম যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করবে ও মাখলুকের মাঝে ইনসাফ কায়েম করবে। তবে ফাসাদ সৃষ্টি ও অন্যায় কাজ সংঘটিত হবে খলীফা ছাড়া অন্যদের দ্বারা এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য হতে যারা আদমের স্থলাভিষিক্ত হবে, এদের ব্যতীত অন্যদের দ্বারা।'[৬]

মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হলে তার কাজ কী? খলিফার কাজ হল- ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা, রক্তারক্তি ও অন্যায়-অত্যাচার রোধ করা।[৭] ইবনু জারীর তাবারী বলেন: "এই প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হইবে এই যে, 'খলিফা' জ্বিন-ইনসানের ভিতর আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার বিধান মোতাবেক ইনসাফ কায়েম করিবেন। তাই প্রথম খলিফা হইলেন আদম (আ) এবং পরবর্তী খলিফারাই হইলেন তাঁহার সেই সব উত্তরাধিকারী যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান মতে বনী আদমের ভিতর ইনসাফের অনুশাসন কায়েম করিবেন।"[৮]

সুতরাং পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হলে তাকে আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ, নির্দেশ-নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তাকে প্রদত্ত বিবেক-বোধ দিয়ে এখতিয়ার সম্বলিত যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে তারও জবাবদিহি করতে হবে। মানুষ পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত হয়ে কী কাজ করবে, কীভাবে তার বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করে জীবন পরিচালনা করবে তা আল্লাহ বলে দিয়েছেন।

অথবা মানুষ পৃথিবীতে জ্বিন জাতির প্রতিনিধি। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনায় এসেছে, পৃথিবীতে মানুষ পাঠানোর পূর্বে আল্লাহ জ্বিন জাতিকে পাঠিয়ে ছিলেন।[৯] আর জ্বিন জাতিকেও এ পৃথিবীতে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন।

---

৬ ইবনে জারীর তবারী, তাফসীরে তাবারী (দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বইরুত, ১৯৭১ খ্রি.), খণ্ড ১, পৃ. ২৩৭।

৭ তাফসীর ইবন কাছীর, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত, পৃ. ৩৭৫।

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

৯ ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড (প্রাগুক্ত), পৃ. ১২৭।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

'আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা আমার ইবাদাত (দাসত্ব) করবে।'[১০]

এখানে প্রতীয়মান হয় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো একমাত্র তাঁর ইবাদাত করা। হাদীস শরীফে এসেছে- হযরত আবু হোরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাত কর, আমি তোমার বক্ষকে ঐশ্বর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী করব। আর যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে আমি তোমার বক্ষকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করব এবং অন্যের প্রতি তোমার নির্ভরশীলতাও কখনও বন্ধ করব না।'[১১]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় খলিফার দায়িত্ব আর ইবাদাতের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিরাট জবাবদিহিতার দায়িত্ব প্রদান করেছেন, যে দায়িত্ব পালন করতে সাত আসমান ও জমিন এবং পর্বতরাজি বহন করতে চায়নি, অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে এবং ভীত হয়েছে। এ দায়িত্ব বহন করতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে তার বিশালত্বের কারণে, এর বোঝা ভারি হওয়ার কারণে এবং এর পরিণাম ভয়াবহ হওয়ার কারণে।

যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন :

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿۷۲﴾

'আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল; সে (কিছু মানুষ) তো খুবই যালিম, খুবই অজ্ঞ।'[১২] এখানে 'আমানত' দ্বারা বুঝানো হয়েছে এখতিয়ার সম্বলিত শরিয়তের অবশ্য পালনীয় বিধানাবলী ও জবাবদিহিতা। এ প্রসঙ্গে মুজাহিদ রহ., সাঈদ ইবনে যুবাইর রহ., যাহহাক রহ., হাসান বসরী রহ. এবং আরো অনেকে আয়াতের আল আমানাহ' বলতে ফারায়েযকেই বুঝাতেন।[১৩] কেউ কেউ বলেন- এর অর্থ আনুগত্য। কাতাদাহ

عن ابن عباس قال: أول من سكن الأرضَ الجنُّ فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضًا. فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم فأسكنه إياها، فلذلك قال:"إني جاعل في الأرض خليفة"

১০ সূরা যারিয়াত ৫১ : ৫৬।

১১ ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, লেবানন, বৈরূত, দারু এহইয়াতিত তুরাসিল আরাবী, ১৪২১ হিঃ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং ৩৫৮, তিরমিযী, খণ্ড ৭, হাদীস নং ১৬৬, ইবনে মাজাহ, খণ্ড ২, হাদীস নং ১৩৭৬। ইমাম তিরমিযী রহ. এটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

১২ সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭২।

১৩ তাফসীর ইবন জারীর (প্রাগুক্ত), খণ্ড ২০, পৃ. ৩৩৭।

(রা.) বলেন- আমানাত অর্থ হচ্ছে দীন, ফরয আমলসমূহ এবং নির্ধারিত শাস্তিসমূহ।[১৪] উপরোক্ত মতামতের ব্যাপারে আসলে কোন ভিন্নতা নেই। সব মতামতেই এটা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমানত হল এমন একটি বিষয় যা পালন করার অর্থ হল কোন বিষয় মেনে চলা এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে দূরে থাকা। যারা এ বিষয়সমূহ মেনে চলবে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার এবং যারা মেনে চলবে না তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।[১৫] সুতরাং এটি প্রতিয়মান হয় যে, এই আমানত খলিফার দায়িত্বের মধ্যেই সামিল।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি মানুষের বাস্তব জবাবদিহিতার প্রকাশ ঘটে তার ইবাদাত বা একনিষ্ঠ দাসত্বের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ দাসত্ব শুধু পরিচিত কিছু বিধি-বিধান পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ দাসত্ব নির্ভর করে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে মহান আল্লাহ্‌র পথে চলার উপর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তাঁর বিধি-নিষেধ, নির্দেশ-নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার উপর এবং কুফরী, শিরক, বিদআতসহ আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা, ঈমান গ্রহণ করে তাকওয়া অবলম্বন করাসহ সম্পূর্ণ জীবনটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মাফিক পরিচালনা করার উপর। তাকে বিবেক-বোধ দিয়ে এখতিয়ার সম্বলিত যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে তারও জবাবদিহিতা করা। কেননা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন :

وَنَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰىهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰىهَا .قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا. وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

'কসম (মানব) সত্তার এবং যিনি তা সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে। নিঃসন্দেহে সে সফল হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা (নাফ্‌স)-কে কলুষিত করেছে।'[১৬]

তাহলে কোন কাজগুলো করা উচিত বা কল্যাণকর এবং কোন কাজগুলো করা উচিত নয় বা অকল্যাণকর তা মানুষের অন্তরে তিনি অবচেতনভাবেই জাগিয়ে দেন। সুতরাং মানুষের জীবনের কোন কাজগুলো অন্যায় এবং কোন কাজগুলো ন্যায় তা আল্লাহ্‌র দেয়া বিবেক দ্বারাও বুঝতে পারে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তার লিখিত 'আল উবুদিয়াহ' নামক গ্রন্থে ইবাদাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : "ইবাদাত হলো ঐ সকল বিষয় সমষ্টির নাম যে সকল বিষয় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন, তা বক্তব্যমূলক হোক অথবা কর্তব্যমূলক, গোপন বা প্রকাশ্য বিষয় হোক না কেন যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ,

---

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯।

১৫ প্রাগুক্ত।

১৬ সূরা আশ শামস, ৯১ : ৭-১০।

সত্য কথন, আমানত আদায় করা, মাতা-পিতার প্রতি সদাচারণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, অঙ্গীকার পূরণ করা, ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা, কাফির ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, প্রতিবেশি, ইয়াতিম, মিসকিন, পথিক, অধিনস্ত মানুষ এবং পশু প্রভৃতির প্রতি ইহসান করা। দোয়া, আল্লাহ্র স্মরণ, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা, আল্লাহ্র ভয়, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন, দীনকে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ করা, তাঁর হুকুমের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা, তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া করা, তাঁর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর প্রতি ভরসা করা, তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করা এবং তাঁর আযাবকে ভয় করা ইত্যাদি।"[১৭]

যেহেতু আল্লাহ মানুষকে পথনির্দেশ করেছেন, তাঁর রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন, এ জন্য অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, মানুষের প্রতি তিনি কিতাব প্রেরণ করেছেন সেহেতু মহান আল্লাহ্র কাছে তার দায়িত্ব পালনের জবাবদিহিতাও রয়েছে। তাই এটি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হওয়া যৌক্তিক।

ইনসান (মানুষ) শব্দের ব্যুৎপত্তি

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে الإِنْسَان শব্দটি أنْس শব্দ থেকে এসেছে। যার মূল হলো إنْسيان। যা فعليان কিংবা إفعلان ওজনে এসেছে। কেননা আরবগণ তাসগীর হিসেবে أنَيسيان বলে থাকেন।[১৮] ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনায় বলেন: মানুষের নাম এজন্যেই إنْسان রাখা হয়েছে যে, সে ওয়াদা করে অতঃপর তা সে ভুলে যায়।[১৯] কেউ কেউ বলেন: الإِنْس শব্দটির অর্থ البشر (মানুষ) যার একবচন إنْسي যের বিশিষ্ট হামজা এবং সাকিন বিশিষ্ট নূন।[২০]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা আমার ইবাদাত করবে।'[২১] তাই এখানে الإِنْس দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আদম (আ) ও তাঁর সন্তান।[২২] মু'জামুল ওয়াজিজ গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'ইনসান' হলো 'জীনের' বিপরীত।[২৩]

---

১৭ ইবনে তাইমিয়াহ (র.), আল উবুদিয়াহ, তাহকীক : মুহাম্মদ মুনির আদ দিমাশকী (বুহুসুল ইলমিয়াহ ওআ দা'ওয়াহ অল ইরশাদ, রিয়াদ, ১৪০৪ হি.), পৃ. ৮।

১৮ ইবন মানযুর, লিসানুল আরাব, লেবানন, বৈরুত, দার আস সাদির, খণ্ড ৬, তা. বি, ১৪২১ হিজরী।

১৯ ইবন কাছীর, تفسير القرآن العظيم, খণ্ড ৩, বৈরুত- লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৪০৭ হি., পৃ. ১৭৬।

২০ মুহাম্মদ বিন আবি বকর আর রাজি, مختار الصحاح বৈরুত, দারুল কিতাব আল আরাবি, পৃ. ২৮।

২১ সূরা যারিয়াত, ৫১: ৫৬।

২২ ইবন মানযুর, লিসানুল আরাব (প্রাগুক্ত), মানুষ।

মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম Homo sapiens, আর বাংলায় 'মানুষ' শব্দটির বিশ্লেষণে পাওয়া যায়- মানুষ শব্দটি এসেছে 'মনুষ্য' বা 'মানব' শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে। যেমন: মনু+ষ্ণ্য (অপত্যার্থে)= মানব বা মনুষ্য। অর্থাৎ পৌরানিক 'মনব'রা ঋষি মনুর সন্তান। কিন্তু অন্যান্য ভাষার সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে ইংরেজি Man, জার্মান Mann ও Mensch, আবেস্তান Manu, প্রোটো-জার্মান Manwaz সবই একই ইন্দো-ইউরোপীয় উৎস থেকে।[২৪]

মানুষ সৃষ্টির উৎস ও প্রক্রিয়া

প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর তাঁর স্ত্রী হাওয়া আ: কে সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর একটি অংশ নিয়ে এবং তাদের উভয়ের থেকে মানুষের বিস্তার শুরু। মাঝখানে হযরত ইসা আ: কে পিতা ছাড়া বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। নিম্নে এ পর্যায়গুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

মানুষ সৃষ্টির প্রথম পর্যায়

মহান আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে কোন নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেন নি, তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যা বিভিন্ন আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়েছে। যেমন তিনি বলেন:

(১) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ 'মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মাটি হতে।'[২৫]

(২) وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ 'আর আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি গলিত কাদা মাটির শুকনো খণ্ড থেকে।'[২৬] হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং কাতাদাহ (রা.) আয়াতে উল্লেখিত صَلْصَلٍ দ্বারা শুকনো মাটিকে বুঝিয়েছেন এবং حَمَإٍ দ্বারা طين তথা মসৃন মাটিকে বুঝিয়েছেন।[২৭]

(৩) وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছো।'[২৮]

---

২৩ মাজমা' আল লুগাহ আল আরাবিয়াহ, المعجم الوجيز শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মিসর, ১৯৯৪ খ্রি.।

২৪ https://bn.wikipedia.org/wiki/ মানুষ।

২৫ সূরা আর রাহমান, ৫৫: ১৪।

২৬ সূরা আল হিজর, ১৫: ২৬।

২৭ ইবন কাছীর (প্রাগুক্ত), পৃ. ৫৭০।

২৮ সূরা রূম, ৩০ : ২০।

(৪) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَـ انَ مِن سُلٰلَةٍ مِّن طِيْنٍ 'আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।'[২৯]

(৫) الَّذِىٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَہٗ وَ بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ অর্থাৎ: 'যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং কাদা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন।'[৩০]

(৬) اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَۃِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ . فَاِذَا سَوَّيْتُہٗ وَ نَفَخْتُ فِيْہِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَہٗ سٰجِدِيْنَ 'স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। অতএব যখন আমি তাকে সুগঠিত করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিব, তখন তোমরা তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে যাবে।'[৩১] এমন আরো অনেক আয়াতে মানুষ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের সারকথা হলো প্রথমে আদমকে কাদা মাটি দ্বারা একজন মানুষের আকার-আকৃতি ও নকশা তৈরী করে অবয়ব নির্মাণ করেছেন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বানিয়ে তাতে বিভিন্ন দিকের আনুপাতিকতা দিয়ে তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। তারপরে তার মধ্যে স্বীয় রূহ ফুঁকে দিয়ে তার অস্তিত্ব দান করেছেন।[৩২]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহ.) আবু মুসা আশয়ারী (রা.) এর সনদ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে তাঁর হাতের এক মুষ্টি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা তিনি সারা পৃথিবী থেকে মুষ্টিবদ্ধ করে নিয়েছেন। অতঃপর আদম (আ) এর সন্তান জমিনের প্রকৃতি অনুযায়ী রূপ লাভ করে। এভাবেই মানুষ সাদা, লাল, কালো কিংবা এর মাঝামাঝি হয় এবং সহজ ও কঠোর প্রকৃতির, ভালো ও মন্দ হয়ে থাকে।[৩৩]

ইমাম গাযালী রহ. তার দাকায়েকুল আখবার গ্রন্থে পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ) এর সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন:[৩৪] 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বিভিন্ন দেশের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কাবা শরীফের মাটি হতে মস্তক, দোহনীর মাটি হতে বক্ষস্থল, ভারতবর্ষের মাটি হতে উদর ও পিঠ, হস্তদ্বয় পূর্বদেশের মাটি হতে এবং পদদ্বয় পশ্চিম দেশীয় মাটি হতে পয়দা করেছেন।"

---

২৯ সূরা মু'মিনূন, ২৩ : ১২।

৩০ সূরা সাজদাহ, ৩২ : ৭।

৩১ সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ৭১-৭২।

৩২ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, স্রষ্টা ও সৃষ্টি তত্ত্ব, পৃ. ৪১২।

৩৩ সুনান আত তিরমিযী, খণ্ড ৩, মিসর, মাকতাবা আত তারবিয়াতুল আরাবি লিদ দাওলিল খালিজ, ১৯৮৮ খ্রি., হাদীস নং ২৫৫, পৃ. ৩৬২।

৩৪ দাকায়েকুল আখবার, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (রহ), অনুবাদঃ আলহাজ্জ মাওলানা এ.কে.এম ফজলুর রহমান মুন্সী (বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, ৬, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০), পৃ. ১২।

হযরত ওয়াহহাব ইবনে মাম্বা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, 'আল্লাহ তা'আলা সপ্তস্তরের মৃত্তিকা হতে হযরত আদম (আ) এর সপ্তঅঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। যেমন প্রথম স্তরের মাটি হতে তাঁহার মস্তক, দ্বিতীয় স্তরের মাটি হতে তার ঘাড়, তৃতীয় স্তরের মাটি হতে তার বক্ষস্থল, চতুর্থ স্তরের মাটি হতে তার হস্তদ্বয়, পঞ্চম স্তরের মাটি হতে তার উদর ও পিঠ, ষষ্ঠ স্তরের মাটি হতে তার উরুদ্বয় ও নিতম্ব এবং সপ্তম স্তরের মাটি হতে তাঁর পদদ্বয় সৃষ্টি করেছেন।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরও বর্ণনা করেছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর মাথা বাইতুল মোকাদ্দাসের মাটি হতে এবং চেহারা মোবারক বেহেশতের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর দন্তরাজি হাউজে কাউসারের মাটি হতে, দক্ষিণ হস্ত কাবা শরীফের মাটি হতে, বাম হস্ত পারস্যের মাটি হতে, হাড়সমূহ পাহাড়ের মাটি হতে, লজ্জাস্থান বাবেল দেশের মাটি হতে, পার্শ্বদেশ ইরাকের মাটি হতে, হৃদয় ফেরদাউসের মাটি হতে, নয়ন-যুগল হাউজে কাউসারের মাটি হতে এবং জিহ্বা তায়েফের মাটি হতে পয়দা করেছেন।' তার মস্তক বাইতুল মোকাদ্দাসের মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলিয়া উহা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও আলাপ আলোচনার স্থান হয়েছে। বেহেশতের মাটি হতে তাঁর মুখমণ্ডল তৈরী হয়েছে বলিয়া উহা সুন্দর, মনোহর ও লাবণ্যময় হয়েছে। তার দন্তরাজি কাউসারের মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলিয়া উহারা স্বাদের ও আস্বাদনের স্থান হয়েছে। তার দক্ষিণ হস্ত কাবা শরীফের মাটি হতে তৈরী হয়েছে বলিয়া উহা সাহায্যের স্থান হয়েছে। তার পিঠ ইরাকের মাটি হতে তৈরী হয়েছে বলিয়া উহা শক্তি ও সামর্থ্যের স্থান হয়েছে। তার লজ্জাস্থান বাবেল দেশের মাটি হতে তৈরী হয়েছে বলিয়া উহা কাম-স্থান হয়েছে। তার হাড্ডি পাহাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলিয়া উহা শক্ত ও সুদৃঢ় হয়েছে। তার অন্তর ফেরদাউসের মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলিয়া উহা ঈমান ও বিশ্বাসের স্থান হয়েছে। আর তাঁর জিহ্বা তায়েফের মাটি হতে তৈরী হয়েছে বলে তা সাক্ষ্যদানের স্থান হয়েছে। পরম কৌশলী আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর দেহে সর্বমোট নয়টি দরজা রেখেছেন।

তন্মধ্যে সাতটি হল মস্তকে, যেমন- (১) দুই চক্ষু, (২) দুই কর্ণ, (৩) দুই নাসিকার ছিদ্র এবং (৪) মুখগহ্বর। অবশিষ্ট দুইটি কোমরের নীচে বাহ্যনালী ও প্রস্রাব-নালী শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। আর আল্লাহ পাক চক্ষুদ্বয়ে দর্শন শক্তি, কর্ণদ্বয়ে শ্রবণ শক্তি, নাসিকায় ঘ্রাণশক্তি, জিহ্বায় আস্বাদন শক্তি, হাতদ্বয়ে স্পর্শ শক্তি এবং পদদ্বয়ে চলন শক্তি প্রদান করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম (আ) কে রূহ দান করতে ইচ্ছা করলেন, তখন রূহকে আল্লাহ তাঁর মুখে বা মস্তকে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিলেন। উহা মস্তকে প্রবেশ করতঃ দুইশত বৎসর পর্যন্ত হযরত আদম (আ) এর মস্তকে বিচরণ করে চক্ষুদ্বয় অবতরণ

করে। তখন হযরত আদম (আ) স্বীয় দেহ-কাঠামোর প্রতি নজর করে সমস্ত শরীর অবলোকন করলেন।

আর যখন রূহ কর্ণে প্রবশ করল তখন তিনি ফেরেশতাগণের তাসবীহ পাঠ শ্রবণ করলেন। অতঃপর রূহ নাসিকায় প্রবেশ করে হাঁচি দিতে না দিতে পুনরায় মুখ ও কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করল। তখন আল্লাহ পাক তাকে 'আলহামদুলিল্লাহ' অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য বলিতে শিখালেন।

আর হযরত আদম (আ) এর হামদ শ্রবণ করে আল্লাহ পাক তাঁকে এ 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাকে রহম করবেন বলে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করলেন। তারপর রূহ্ বক্ষস্থলে প্রবেশ করলে হযরত আদম (আ) তাড়াতাড়ি দণ্ডায়মান হতে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু কিছুতেই দণ্ডায়মান হতে পারলেন না। এ জন্যই আল্লাহ পাক বলেছেন- وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا (ওয়া কানাল ইনছানু আজুলা) অর্থাৎ 'মানুষ অত্যন্ত চপলমতি ও জলদিবাজ।'

অতঃপর রূহ যখন তার উদরে প্রবেশ করিল, তখন হযরত আদম (আ) খাদ্য ভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

অতঃপর রূহ দেহে প্রবেশ করলে দেহ রক্ত, মাংস, শিরা-উপশিরায় পরিণত হল। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) এর শরীরকে নখের আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। তাই তাঁর দেহের সৌন্দর্য ও লাবণ্য দিন দিন অধিকতর বর্ধিত হতে থাকে; কিন্তু ভুল পথে পদক্ষেপের ফলে আল্লাহ পাক শাস্তি স্বরূপ তার সেই নখের আবরণকে চামড়ার আবরণে পরিবর্তিত করিয়া দেন, আর পূর্বাবস্থার চিহ্নরূপ হস্ত-পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে সামান্য একটু নখ রাখিয়া দেন।

দয়াময় আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) এর সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া তাহাকে রূহদান করলেন এবং তাঁকে বেহেশতের পোশাকে সুসজ্জিত করলেন। তখন নূরে মোহাম্মদী (সা) তাঁর মুখমণ্ডলে ও পেশানিতে পূর্ণিমার উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় চমকাতে থাকে। তারপর যখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে মস্তক উত্তোলন করলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে স্কন্ধে উঠায়ে নিল।

আর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ করলেন, 'হে ফেরেশতাগণ! তোমরা হযরত আদম (আ)-কে আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহের দর্শক হিসাবে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করাও। তা হলে তার ঈমান আরও সুদৃঢ় হবে।' ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আদম (আ)-কে স্কন্ধে স্থাপন করে প্রায় দুশত বৎসর পর্যন্ত সমুদয় নভোমণ্ডল পর্যটনে অতিবাহিত করলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর সওয়ারী বা বাহনের নিমিত্ত 'মাইমুনা' নামক এশটি ঘোটকী তীব্র সুগন্ধবিশিষ্ট মেশক দ্বারা সৃষ্টি করেন। উহার দুই পাখা মণিমুক্তা দ্বারা তৈরী করে তিনি তাঁকে তাতে উপবেশন করতে বললেন।

হযরত জিব্রাইল (আ) তার লাগাম ধরেন আর হযরত মিকাইল (আ) তার ডানে এবং হযরত ইস্রাফিল (আ) তার বামে থেকে হযরত আদম (আ) কে সমস্ত আকাশে ঘুরতে

লাগলেন। তার সাথে ফেরেশতাদের সাক্ষাত হতেই তিনি তাদেরকে السلام عليكم (আস্‌সালামু আলাইকুম)। অর্থাৎ 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক' বলে সন্তোষ প্রকাশ করলেন আর তারাও প্রত্যুত্তরে وعليكم السلام ورحمة الله (ওয়া আলাইকুমুচ্ছালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ)। অর্থাৎ তোমাদের উপরও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক বলে তাকে সম্ভাষণ জানালেন।

তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, 'হে আদম! এইরূপ সালামই আমি তোমাকে এবং তোমার বিশ্বাসী বংশধরগণের নিমিত্ত উপঢৌকন স্বরূপ দান করলাম। তোমরা উহাদ্বারা একে অপরকে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাষণ করবে।' বিঃ দ্রঃ হাদীস শরীফে আছে, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের সহিত কথা বলিবার পূর্বে প্রথমে সালাম প্রদান করিবে।'

হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি

'হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে নারী ব্যতিরেকে পুরুষের (আদম (আ) এর) পাঁজরের বক্র হাড় থেকে (خلقت حواء من ضلع)। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তার (আদম) থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবী কর, এবং স্বজনদের সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[৩৫] এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসখানি প্রণিধানযোগ্য:

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমরা নারীদেরকে সদুপদেশ দাও। কেননা নারী পাজরের বক্র হাড় থেকে সৃষ্টি। পাঁজরের হাড়ের উপরের অংশ বেশি বক্র। যদি একে সোজা করতে চাও তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তার বক্রতাকে ঐরূপে রেখে দাও তাহলে বক্র হতেই থাকবে। সুতরাং নারীদেরকে নসিহত করো।[৩৬]

৩৫ সূরা আন নিসা, ৪ : ১।

৩৬ ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড., কিতাবুল আহাদীসুল আম্বিয়া, বাব খলকু আদাম ওয়াজুররিয়াতিহি, হাদীস নং ২৩৩১,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ﷺ : استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء"

নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা দ্বারা হাওয়া (আ) কে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদীস থেকে জানা যায়: خلقت حواء من ضلعه القضب 'হাওয়া (আ) কে আদমের পঁজরের ক্ষুদ্র বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে'।[৩৭]

পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ সৃষ্টি

আদম ও হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টির পর তাঁদের মাধ্যমে বংশ পরমপরায় আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যা পূর্বোল্লেখিত আয়াতে কারিমায় সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রথম মানব মানবী সৃষ্টির পর পরবর্তী সৃষ্টি প্রক্রিয়া হলো নারী পুরুষের যৌন মিলনের মাধ্যমে নারীর রেহেমে কতগুলো পর্যায় অতিক্রম করে একটি মানুষ পৃথিবীতে আসে।

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির উৎস ও ধারাবাহিক প্রকৃয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ . ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ .ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ . ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ .

'আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কাদামাটির নির্যাস থেকে। এরপর আমি তা বীর্যবিন্দুরূপে স্থাপন করেছি এক নিরাপদ স্থানে। এরপর আমি বীর্যবিন্দুকে পরিণত করেছি 'আলাকা'য়। অতঃপর 'আলাকা'কে পরিণত করেছি 'মুদগা'য়। 'মুদগা'কে পরিণত করেছি হাড়ে। অতঃপর হাড়কে ঢেকে দিয়েছি গোস্ত দিয়ে। অতঃপর তাকে গড়ে তুলেছি অন্য এক সৃষ্টিতে। অতএব বরকতময় আল্লাহ যিনি সর্বস্রষ্টা। এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে, এরপর কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তোমাদের পুনর্জীবিত করা হবে।'[৩৮]

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا 'আল্লাহ মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন'।[৩৯] মাতৃগর্ভে মানবশিশু বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে পরিপূর্ণতা লাভ করে। যা কেবল মহান রবের সার্বক্ষণিক রহমতের উপস্থিতিতেই সংগঠিত হতে থাকে। আল কোরআনের সূরা মু'মিনুন এর ১২-১৫ নং আয়াতে মানব শিশু জন্মের স্তরগুলো যেভাবে এসেছে তা নিম্নের সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো :

মাতৃগর্ভে স্তরসমূহ	আল কোরআনের ভাষ্য	বিজ্ঞানের পরিভাষা
১ম স্তর	সুলালাহ[৪০] (মাটির নির্যাস)	Sperm(n)+Ovum(n) (প্রজনন অণু)

৩৭ ইবনে মাযা, তাহারাত, বাব ৭৭, হাদীস নং ৫২৫।

৩৮ সূরা মু'মিনূন, ২৩: ১২-১৬।

৩৯ সূরা নূহ, ৭১: ১৪।

৪০ 'সুলালাহ' অর্থ কুল, বংশ, পরিবার, সন্তান, বংশধর, নির্যাস, ও সারাংশ ইত্যাদি।

২য় স্তর	নুৎফা[৪১] (অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট প্রজনন কোষ)	Zygote (নিষিক্ত কোষ)
৩য় স্তর	আলাকা[৪২] (জমাট রক্তপিণ্ড)	Blastocyst (রক্ত পিণ্ড)
৪র্থ স্তর	মুদগাহ[৪৩] (মাংস পিণ্ড)	Somites (বগুকোষী মাংসপিণ্ড)
৫ম স্তর	ইযাম[৪৪] (অস্থি)	Skeleton (কংকাল বা অস্থি তন্ত্র)
৬ষ্ঠ স্তর	লাহম[৪৫] (মাংসপেশী)	Muscles (মাংস পেশী)
৭ম স্তর	রূহ (প্রাণ)	Foetue (মানব শিশু)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ -خُلِقَ مِن مَّآء دَافِقٍ -يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ .

'অতএব মানুষের চিন্তা করে দেখা উচিত, তাকে (মানুষকে) কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দ্রুতবেগে নির্গত পানি থেকে। যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাঁড়ের মধ্য থেকে।'[৪৬] خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 'তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।'[৪৭]

وَ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهْرًا ؕ وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا.

'আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তোমার রব হল প্রভূত ক্ষমতাবান।'[৪৮]

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষকে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে কখনো মাটি থেকে, কখনো মাটির নির্যাস থেকে, কখনো জমাটবাধা রক্তপিণ্ড (আলাক্ব) থেকে, কখনো সবেগে নির্গত পানি (مَّآء دَافِقٍ) থেকে, কখনো সংমিশ্রিত শুক্র (নুতফা) থেকে । এ বিভিন্নতার কারণ

৪১ নুৎফা শব্দের অর্থ ফোঁটা, শুক্র, বীর্য, অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট অতি সূক্ষ প্রজনন কোষ, নিষিক্ত কোষ ইত্যাদি।

৪২ আলাকা অর্থ নুৎফা বা বীর্য থেকে জমাট রক্ত বা 'আলাক' এর সৃষ্টি। এ শব্দটির তিনটি অর্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ১) জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড ২) জোঁক সদৃশ বস্তু এবং ৩) ঝুলন্ত দেহবস্তু।

৪৩ মুদগাহ অর্থ চর্বিত বস্তু, মাংস খণ্ড, চিবানো বস্তু যা মাংসপিণ্ডের মত, দুই মাসের ভ্রুণ। আলাকার পরের স্তরটি হচ্ছে মুদগাহ বা বহুকোষী মাংসপিণ্ড।

৪৪ ইযাম অর্থ অস্থি, হাড় বা কংকাল।

৪৫ লাহাম অর্থ হাড়ের পরের স্তর হচ্ছে মাংসপেশীর সৃষ্টি যা হাড় ও মাংস এর সংমিশ্রণ

৪৬ এখানে الصُّلْبِ বলতে صُلْبِ الرجل বা পুরুষের পৃষ্ঠদেশ (মেরদন্ড) এবং التَّرَآئِبِ বলতে تَّرَآئِب المرأة বা নারীদের বক্ষদেশ বুঝানো হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃষ্ঠাঃ ৪১৭। এখানে الصُّلْبِ বলতে صُلْبِ الرجل বা পুরুষের পৃষ্ঠদেশ (মেরদণ্ড) এবং التَّرَآئِبِ বলতে تَّرَآئِب المرأة বা নারীদের বক্ষদেশ বুঝানো হয়েছে।

৪৭ সূরা আলাক, ৯৬: ২।

৪৮ সূরা ফুরকান, ২৫: ৫৪।

হলো প্রথম মানুষকে (আদমকে) সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে, পরবর্তী পর্যায়ের সৃষ্টির ব্যাপারে এক এক স্থানে এক এক পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। তবে এ স্তরগুলো ধারাবাহিক ভাবে পূর্বোক্ত সূরা আল মোমিনুন এর আয়াত ১২ থেকে ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ এরূপ অন্যত্র বলেন :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ
ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ . هُوَ
الَّذِىْ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এর পর বীর্যবিন্দু থেকে এরপর 'আলাকা' থেকে এরপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, এরপর যাতে তোমরা উপনীত হও যৌবনে, এরপর যাতে তোমরা হয়ে যাও বৃদ্ধ, আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে তার পূর্বেই এবং যাতে তোমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌঁছো, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তাকে কেবল বলেন 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।'[৪৯]

এ প্রসঙ্গটি আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَ نُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ
الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۗ وَ تَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ .

'হে মানুষ! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাকো তবে নিশ্চয়ই জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাকা[৫০] থেকে, তারপর পূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট অথবা অপূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট গোশ্ত থেকে। তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার নিমিত্তে। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থিত রাখি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু দেয়া হয় এ বয়সেই, আবার কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানে। তুমি যমীনকে

---

৪৯ সূরা মু'মিন, ৪০: ৬৭-৬৮।

৫০ علقة মানে যুক্ত ও ঝুলন্ত বস্তু। পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের অনেকে এর অর্থ করেছেন রক্তপিণ্ড। তবে আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা পরে জরায়ু গাত্রে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এ জন্য 'আলাকা শব্দের অনুবাদ এখন করা হয়, এমন কিছু যা যুক্ত হয়ে থাকে।

দেখতে পাও শুষ্কাবস্থায়, অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ।'[৫১]

এ ভাবেই আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তার মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যহত রেখেছেন।

ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ) বিশেষভাবে সৃষ্ট

আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ)-কে পিতা ব্যতিরেকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। এটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ক্ষমতা ও নিদর্শন। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টি সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَ اذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا . فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۫ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا . قَالَتْ اِنِّىٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا . قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا. قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا. قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا.

'বর্ণনা করুন এ কিতাবে উল্লেখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল, তারপর তাদের থেকে সে পর্দা করল অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহকে (জিব্রাইল আ.) পাঠালাম, সে তার কাছে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মারইয়াম বলল, আল্লাহকে ভয় কর যদি তুমি 'মুত্তাকী হও', আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সে বলল, 'আমি তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।' মারইয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?' সে বলল, 'এ রূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এজন্যে সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার কাছ থেকে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরকৃত ব্যাপার।'[৫২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَ الَّتِىٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

'আর স্মরণ করুন সে নারীকে, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, তারপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক

---

৫১ সূরা আল হাজ্জ ২২ : ০৫।

৫২ সূরা মারইয়াম ১৯ : ১৬।

নিদর্শন।'[৫৩] সুতরাং ঈসা (আ)-এর সৃষ্টি ব্যতিক্রম, আল্লাহ্‌র এক বিশেষ নিদর্শন। এটি সাধারণ নিয়ম নয়।

মানুষের প্রকৃতি - প্রবণতা

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য-প্রকৃতি, কতগুলো প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কতগুলো মানবীয় স্বভাব দিয়েছেন। তার ইচ্ছা, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা দিয়েছেন। যেগুলো তিনি মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এজন্য যে, সে তার নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তার করণীয় ঠিক করতে পারবে। খারাপ প্রবণতাগুলো নিয়ন্ত্রণে রেখে সে একজন পরিমার্জিত পরিশীলিত উন্নত মানুষ হবে, আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় বান্দা হবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ কোনটি, পছন্দনীয় গুণ কোনটি তা জেনে সে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে পারবে। কুরআনের আলোকে নিম্নে মানুষের কতগুলো বৈশিষ্ট্য-প্রকৃতি এবং কতগুলো প্রবণতা তুলে ধরা হলো।

মানুষ দুর্বল। তাকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا.

'আল্লাহ তোমাদের থেকে (বিধান) সহজ করতে চান, আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে।'[৫৪] মানুষকে অনেক শক্তিশালি মনে হলেও মূলত সে খুবই দুর্বল প্রাণি। একটি মানুষ যখন ভূমিষ্ট হয় তখন সে এতটাই অসহায় থাকে যে, সে নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে পারে না। সে নিজের অসুবিধা, ক্ষুধা, চাহিদা, শীত, গরম, ব্যথা ইত্যাদি কিছুই বলতে পারে না, চলা-ফেরা করতে পারেনা, সে কাউকে চিনতেও পারে না। তার শুধু একটি মাত্র ভাষা থাকে, তা হলো কান্না। তাকে একটি পিপড়াও যদি আঘাত করে তাও সে তাড়াতে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে অন্য অনেক প্রাণি যেমনঃ গরু, ছাগল, হাতি, ঘোড়া, হাঁস, মুরগী জন্মের পর কিছুক্ষণের মধ্যেই হাটতে পারে, দৌড়াতে পারে। সাপের বাচ্চাতো ভয়াবহ রূপ ধরেই ডিমের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। মানুষ তার পরিণত বয়সেও প্রচণ্ড শীত, গরম, ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করতে পারে না। তার পাকস্থলি এতটা দুর্বল থাকে যে, কোন ময়লা বা জীবানুযুক্ত খাবার সহ্য করতে পারে না। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ হয়ে পরে ভীষণ দুর্বল। চলা-ফেরায় কখনও কখনও সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে। মানুষের পক্ষে খাওয়া ছাড়া তিন দিন বেঁচে থাকা কঠিন, অথচ জোঁক, শামুক এরূপ অনেক প্রাণি আছে যারা ছয় মাসের অধিক সময় পানাহার ছাড়া স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে পারে। প্রচণ্ড গরমে মরুভূমির বুকে উট পানি ছাড়া অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে। যা মানুষ পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বপরি আল্লাহ মানুষকে অতীব দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন।

---

৫৩ সূরা আম্বিয়া ২১ : ৯১।

৫৪ সূরা আন-নিসা ৪ : ২৮।

তারপরও মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব– বুদ্ধি, ইলম ও প্রজ্ঞার কারণে। তার শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় কারণ, আল্লাহ তাকে অহি দ্বারা নির্দেশনা দিয়েছেন। একজন মানুষকে জীবন চলার পথে সর্বদা তার দুর্বলতার কথা লক্ষ রাখতে হবে যেন তার থেকে কোন প্রকার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রকাশ না পায়। তার উচিত হবে না কোন রকম অহংকার প্রদর্শন করা, অত্যাচার করা, শিরক করা, কুফরী করা, আন্তরিকতা প্রদর্শন করা এবং তার উচিত হবে না দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার চিন্তা করা।

মানুষ ত্বরাপ্রবণ। ত্বরাপ্রবণতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে সব কিছু দ্রুত চায়। সবকিছু কম সময়ে করতে চায়। বিশ্বাসীরা পুরস্কার দ্রুত চায়। অবিশ্বাসীরা শাস্তি দ্রুত দেখতে চায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَ يَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاۤءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا .

'আর মানুষ অকল্যাণ প্রার্থনা করে এমনভাবে যেভাবে সে কল্যাণ প্রার্থনা করে। আর মানুষ খুবই ত্বরাপ্রবণ।'[৫৫]

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ .

'মানুষকে ত্বরাপ্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। শিঘ্রই তোমাদেরকে আমি আমার নিদর্শনাবলি দেখাবো। সুতরাং তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলো না।'[৫৬]

وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ .

'আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন যেভাবে তারা কল্যাণ দ্রুত পেতে চায়, অবশ্যই তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যেত। সুতরং যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, আমি তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেই।'[৫৭]

وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ .

'রাসূল (সা)-কে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাবের দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য (শাস্তি) আমাদেরকে দিয়ে দাও।'[৫৮]

وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ .

---

৫৫ সূরা আল ইসরা, ১৭: ১১

৫৬ সূরা আম্বিয়া, ২১: ৩৭

৫৭ সূরা ইউনুছ, ১০ : ১১

৫৮ সূরা সা'দ, ৩৮ : ১৬

'কল্যাণের পূর্বে তারা আপনাকে অকল্যাণ তাড়াতাড়ি করতে বলে। অথচ তাদের পূর্বে অনুরূপ শাস্তি গত হয়েছে। তেমনি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ও তারা দ্রুত করতে চায়, দ্রুত ফল পেতে চায়, পুরস্কার পেতে চায়।'[৫৯]

মানুষ অস্থিরচিত্ত, ধৈর্যহারা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী[৬০]

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا. وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا.

'নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির চিত্ত রূপে। যখন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে বিচলিত হয়ে পড়ে আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ।'[৬১]

বস্তুত মানুষের জন্য এটি শোভনীয় নয়, সঙ্গতও নয় যে, সে তাড়াহুড়ো করবে, সে ধৈর্যহারা হবে, সে কল্যাণ পেলে কৃপণ হবে, সাময়িক চিন্তা করে স্থায়ী ও দূরদর্শী ভাবনা থেকে বিরত থাকবে। সে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর কাছে কিংবা তাঁর পক্ষে যিনি দাওয়াত দেন, তার কাছে আল্লাহ্র শাস্তি বা আখিরাতের কোন বিষয় কিংবা অলৌকিক কিছু তাৎক্ষণিক ভাবে দেখতে চাইবে, অথচ আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজের বিনিময় বা পুরস্কার সময়মত দেন এবং সময়মতই দিবেন। এমতাবস্থায় মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, পরিচয় দিতে হবে ধৈর্যশীলতার।

মানুষ অতি সুন্দর। তাকে অতি উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার আকার, আকৃতি ও গঠন অতি সুন্দর, তার মুখমণ্ডল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ সবকিছুই সুন্দর, আকর্ষণীয়, মোহনীয় করে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ . ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ.

'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে, অতঃপর আমি তাকে হীনদের হীনতম স্তরে ফিরিয়ে দেই। কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে।'[৬২] যে মানুষ সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি, সে মানুষই আবার নিকৃষ্টতম সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। আল্লামা ইবনে কাসীর আয়াতের ব্যখ্যায় বলেন : 'সে জাহান্নামের অধিবাসী হয়, যদি সে আল্লাহ ও তাঁর

---

৫৯ সূরা রা'দ ১৩ : ৬।

৬০ সূরা মা'রিজ ৭০ : ১৯-২১।

৬১ সালাত আদায়কারীরা ব্যতীত– যারা সালাতে সদা তৎপর এবং যাদে ধন-সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের নির্ধারিত অধিকার রয়েছে, যারা বিচার দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে ভীত থাকে, যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী, যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা সাক্ষ্যদানে অটল। সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ২২-৩৩।

৬২ সূরা আত-ত্বীন, ৯৫ : ৪-৫।

রাসূল (সা)-এর আনুগত্য না করে থাকে। এ কারণেই যারা ঈমান এনেছে ও ভালো কাজ করেছে তাদেরকে পৃথক করে নেয়া হয়েছে।'[৬৩]

'আল্লাহ যাকে দীর্ঘায়ু করেন তাকে সৃষ্টিগত দিক দিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেন।'[৬৪] অর্থাৎ মানুষ অতিরিক্ত বয়োবৃদ্ধ হলে সে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, আকৃতির দিক থেকেও খর্ব হয়, শুকিয়ে যায়, স্বাস্থ্যহীন হয় এবং মেধা ও স্মৃতি দুর্বল থেকে অতি দুর্বল হয়ে পড়ে, চলা-ফেরায় অক্ষম হয়ে যায়, সে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় এ মানুষটি অতি আপনজনের কাছেও হয় অপাংক্তেয়। বিশ্বাসগতভাবে বা প্রকৃতিগতভাবেও সে যদি অধঃপতিত হয়, তাহলে সে মানুষটি নেমে যায় নিকৃষ্টতম সৃষ্টিতে। তার এ নিকৃষ্টতম হওয়া থেকে রক্ষা পেতে হলে তাকে দু'টি কাজ করতে হবে : ঈমান আনতে হবে এবং সৎ কাজ করতে হবে।

ঈমান আনলে এবং সৎকাজ করলে সে বাহ্যিকভাবেও যেমন পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে, পরিমার্জিত জীবন যাপন করে, ভাল কথা বলে এবং অশালীন আচারণ করে না; মিথ্যা, প্রতারণা, শঠতা, ঠকবাজি, গিবত, শত্রুতা, পরনিন্দা করে না; ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে না; হত্যা, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি করে না; তেমনি অন্তর্নিহিত ভাবেও সে ভাল থাকে, সে সব সময় উন্নত ও কল্যাণ চিন্তা করে, পরোপকারের চিন্তা করে; সে অন্যায় কাজ থেকে, অন্যের ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকে; সে সব সময় মানুষকে ন্যায়ের পথে, শান্তির পথে, কল্যাণের পথে তথা আল্লাহ্র পথে আনার চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

মানুষের জীবন চেষ্টা-পরিশ্রম সাপেক্ষ, কষ্ট সাপেক্ষ। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে।'[৬৫] এখানে كَبَدٍ এর অর্থ শ্রম ও কষ্ট, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্য থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এর অর্থ মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকার কষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন : حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا 'তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে।'[৬৬] মানুষ জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে মায়ের দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি-এ সমুদয়

---

৬৩ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৮ খ, পৃ. ২০৯।

৬৪ সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৬৮।
سُبْحَـنَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ ، وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ - وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَـا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيْمِ .

৬৫ সূরা আল বালাদ, ৯০ : ৪।

৬৬ সূরা আহকাফ ৪৬ : ১৫।

শ্রমের বিভিন্ন পর্যায় যা মানুষের বিভিন্ন পর্যায় অতিবাহিত হয়।"[৬৭] আর মুজাহেদ বলেন : فِيْ كَبَدٍ এর অর্থ হলো সকল প্রকার কষ্ট।[৬৮]

লিসানুল আরবে উল্লেখ আছে فِيْ كَبَدٍ অর্থ : মানুষ এমন একটি সৃষ্টি যে দুনিয়া এবং আখিরাতে কষ্টের সম্মুখিন হতে হবে এবং আরো বলা হয়েছে, সে কঠোরতা এবং কষ্টের সম্মুখিন। এর অর্থ হলো এই যে, মানুষ তার পার্থিব জীবনে এবং তার জীবন চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বা তার ভালো মন্দ বুঝ হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানাবিধ কষ্টের মুখামুখী হতে হয়। রাসূল (সা.) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, একজন ঈমানদার ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে কিন্তু এতেও তার জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে। কেননা ইহা তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে সাহায্য করে, তাকে শোকর ও বিনয় প্রকাশ ও সর্বদা ইবাদাত করতে সাহায্য করে।

প্রত্যেকটি কাজের জন্য তাকে পরিশ্রম করতে হয়, তার রিযক চেষ্টা সাপেক্ষ, পশু-পক্ষি ও অন্যান্য প্রাণি সারা বছরের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে না, প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু মানুষের খাদ্য সংরক্ষণ করতে হয়। তার দৈনন্দিন জীবনের জন্য অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়। অন্য প্রাণিদের তেমন প্রয়োজন হয় না।

وَكَانَ الْإِنْسَـانَ كَفُوْرًا 'মানুষ অকৃতজ্ঞ'।[৬৯] إِنَّ الْإِنْسَـانَ لَكَفُوْر 'মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।[৭০] لَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ 'তবে অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ"।[৭১] إِنَّ الْإِنْسَـانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ 'সে অস্বীকার করে, সে তার প্রতিপালকের অকৃতজ্ঞ'।[৭২], إِنَّ الْإِنْسَـانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ 'মানুষ সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ'।[৭৩]

وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَـانَ كَفُوْر

'সে কৃতকর্মের জন্য মন্দ বা বিপদ আসলে সে অকৃতজ্ঞ হয়। দয়া আস্বাদনের পর তা প্রত্যাহার করলে সে অকৃতজ্ঞ হয়।[৭৪] আল্লাহ তা'আলা তাকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন যার মধ্যে সে ডুবে আছে। তার জন্ম, তার বেড়ে ওঠা, পানাহার, তার বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত

---

৬৭ মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪৫৭।

৬৮ ইবন কাছীর (প্রাগুক্ত), খ. ৮, পৃ. ২০৯।

৬৯ সূরা ইসরা, ১৭ : ৬৭।

৭০ সূরা আল হাজ্ব, ২২ : ৬৬।

৭১ সূরা ইউনুস, ১০ : ৬০।

৭২ সূরা আদিয়াত, ১০০ : ৬।

৭৩ সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১৫।

৭৪ সূরা আশ শূরা, ৪২: ৪৮।

পরিবেশ নিয়ে প্রতিনিয়ত অগণিত নেয়ামত সে ভোগ করছে। মহান আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করেছেন।

মাটি, পানি, আলো, বাতাস, আগুন ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। তার জন্য রিযক ফল-মূল, ফসলাদি,পশু,পাখি,মৎস ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে সে অসংখ্য নিয়ামত গ্রহণ ও ভোগ করছে। মানুষ মহান আল্লাহ তা'আলার কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করতে পারে? কোন অনুগ্রহইতো অস্বীকার করতে পারে না। এ সবের জন্য তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু মানুষ তা করছে না এবং অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না। আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে, শিরক করে, সে তাঁর আয়াতকে অস্বীকার করে। আকাশ-পৃথিবীতে আল্লাহ্র অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, এতদসত্ত্বেও আনেক মানুষ আল্লাহ্র সে নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন।

মানুষের প্রবণতা হলো আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ ও নেয়ামতরাজির তাৎপর্য সে বুঝতে চায় না এবং এর সঠিক ব্যবহার করে না। বস্তুত সম্পদ ও আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ মানুষের পরীক্ষা হিসেবে গণ্য। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে কিনা, ব্যবহার করে কিনা এবং তার নেয়ামতের এমনভাবে শুকরিয়া আদায় করে কিনা যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন- সেটিই বিবেচ্য বিষয়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিয্ক সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে,

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّیْۤ اَكْرَمَنِ . وَ اَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّیْۤ اَهَانَنِ .كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ . وَ لَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا . وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا .

'আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন'। কক্ষনো না, বরং তোমরা ইয়াতিমদের সম্মান করো না। আর তোমরা মিসকিনদের খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না এবং তোমরা উত্তারাধিকার সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলো এবং তোমরা ধন-সম্পদকে খুব বেশি ভালোবাসো।"[৭৫]

আল্লাহ তা'আলার এ আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র এটা মানুষের সম্মান বা অসম্মানের পরিচায়ক নয়। বরং এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। সম্পদশালী ব্যক্তি কীভাবে তার সম্পদের ব্যবহার করে, সে ইয়াতিম, মিসকিন, অসহায়দের দান করে কিনা, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে কিনা, অন্যদেরকে দানে উৎসাহিত করে কিনা। সম্পদগুলোকে খুব বেশি ভালোবেসে সব নিজের জন্য পুঞ্জিভূত করে রাখে আর ভোগ করে সুখের

৭৫ সূরা আল ফাজর, ৮৯: ১৪-১৯।

ঢেকুর তুলে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে দায়িত্ব শেষ করে, নাকি এর সঠিক ব্যবহার করে? মহান আল্লাহ দেখতে চান সম্পদশালী ব্যক্তির আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ্র রাস্তায় তার যাকাত দেয়া, সাদকা দেয়া, অভাবি ও অসহায়দের সহযোগিতা করা ইত্যাদি। আর তিনি দরিদ্র ব্যক্তির কাছ থেকেও আনুগত্য চান, সে অভাবগ্রস্ত কঠিন অবস্থায় কীভাবে ধৈর্য ধরে ঈমানের উপর টিকে থেকে আল্লাহ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এ অবস্থায় সে আল্লাহ্র উপর আস্থাহীন হয়ে অকৃতজ্ঞ হয়, নাকি তাঁর উপর আস্থা রেখে তাঁর পরীক্ষাটি উপলব্ধি করে তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা-ই প্রত্যক্ষ করতে চান, তার অনুভূতি দেখতে চান।

وَكَانَ الْإِنْسَـانُ أَكْثَرَ شَـيْءٍ جَدَلًا .

'মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিতর্কপ্রবণ।'[৭৬]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَـدِلُ فِى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

'কিছু মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে'।[৭৭]

هَاَنْتُمْ هٰـؤُلَاءِ حٰجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِه عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

'আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, সে কিতাব ও জ্ঞান ছাড়াই বিতর্ক করে। কিছু ইলম থাকলে সে বিতর্ক করে, ইলম না থাকলেও বিতর্ক করে।[৭৮] অথচ তার ইলম অর্জন করে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী দেখে গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত ছিল; আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল (সা.), তাঁর আয়াত এবং আখিরাতে বিশ্বাস করা উচিত ছিল।

এ ছাড়াও মানুষের অনেক প্রবণতার কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন: মানুষ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ 'অহংকারী হয়'[৭৯], وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا 'মানুষ কৃপণ'[৮০],

هَآ أَنْتُمْ هٰـؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُواْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ .

'মানুষ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কৃপণতা করে'[৮১], وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ 'সম্পদের প্রতি মানুষের প্রচণ্ড লালসা'[৮২],

৭৬ সূরা আল কাহাফ, ১৮: ৫৪।
৭৭ সূরা আল হাজ্জ, ২২: ৩ - ৭।
৭৮ সূরা আলে ইমরান, ৩: ৬৬।
৭৯ সূরা হূদ, ১১ : ১০।
৮০ সূরা ইসরা, ১৭ : ১০০।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ .

'মানুষ আসক্ত- নারী, সন্তান-সন্ততি, স্তুপিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদী পশু, ক্ষেত-খামার এরূপ দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রীর প্রতি'।[৮৩] إِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ 'মানুষ জালিম'[৮৪],

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰـهُ بَيْنَـهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَأَبٰى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا.

'মানুষ আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামতরাজিকে অস্বীকার করে'[৮৫],

إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

'অধিকাংশ মানুষ কোরআনে বিশ্বাসী হয় না'[৮৬],

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيْ إِنَّه □ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ.

'দুঃখের পরে নেয়ামত আস্বাদন করলে মানুষ উৎফুল্ল হয়'[৮৭],

وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ.

'আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন হয়'[৮৮],

وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ .

'অধিকাংশ মানুষ পাপাচারী'[৮৯],

فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

'বিপদ থেকে উদ্ধারের পর মানুষ বাড়াবাড়ি করে'[৯০],

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ .

'বিপদে মানুষ আল্লাহকে ডাকে ও অনুগ্রহ লাভের পরে ভুলে যায়'[৯১],

وَ اِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ .

---

৮১ সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮।
৮২ সূরা আল আদিয়াত, ১০০ : ৮।
৮৩ সূরা: আলে ইমরান, ৩ : ১৪।
৮৪ সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ৩৪।
৮৫ সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ৫০।
৮৬ সূরা হূদ, ১১ : ১৭।
৮৭ সূরা হূদ, ১১ : ১০।
৮৮ সূরা ইউনুছ, ১০ : ৯২।
৮৯ সূরা আল মায়িদা, ৫ : ৪৯।
৯০ সূরা ইউনুছ, ১০ : ২৩।
৯১ সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৮।

'মানুষ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বিমুখ হয়'[৯২]।

আবার বিশ্বাসগতভাবেও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরন আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কতক কাফির এবং কতক মু'মিন। আর তোমরা যে আমল করছ আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।'[৯৩]

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তার কিতাবের উপরে বিশ্বাস করে কেউ হয় মু'মিন আবার কেউ এগুলোকে অবিশ্বাস করে হয় কাফির। আবার কেউ আছে যারা মুখে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয় কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাস করে এবং ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের ভিতর-বাহির সম্পর্কে গভীর ভাবে জানেন। আবার কিছু মানুষ আছে দ্বিধাগ্রস্থ। যারা বিশ্বাসে অটল নয়। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

'মানুষের মধ্যে আরো কেউ আছে যারা প্রান্তে থেকে আল্লাহ্‌র এবাদত করে (দ্বিধার সাথে)। অতঃপর তাকে যদি কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে সে তাতে প্রশান্ত হয়। আর তাকে যদি পরীক্ষা বা ফিতনা স্পর্শ করে তাহলে সে তার মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'[৯৪]

আবার মানুষের মধ্য এমন লোকও আছে যারা মনমুগ্ধকর কথা বলে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। যারা আল্লাহ্‌র নামে কসম খায়। যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে অসত্যের দিকে নিয়ে যায়।

নিম্নোক্ত আয়াতে যে প্রসঙ্গটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ

'মানুষের মধ্যে এমনও আছে যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার হৃদয়ে যা আছে সে ব্যাপারে সে আল্লাহকে সাক্ষী বানায়। অথচ সে তোমার প্রচণ্ড বিরোধী, যখন সে তোমার কাছ থেকে ফিরে যায়।'[৯৫] এর বিপরীতে আবার এমন মানুষ আছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। যেমন আল্লাহ্‌র বানী :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ .

---

৯২ সূরা হা-মীম, ৪১ : ৫১।

৯৩ সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ২।

৯৪ সূরা আল হাজ্জ, ২২: ১১।

৯৫ সূরা আল বাকারাহ, ২: ২০৪।

'মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় তার নিজকে বিক্রি (উৎসর্গ) করে দেয়। আল্লাহ এ ধরনের বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হন।'[৯৬]

আর মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে বিচলিত হয়ে পড়ে অতঃপর তাকে দুর্বলতা ও সংকীর্ণতা পেয়ে বসে। তখন সে মহান আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় কামনা করে সে তাঁর রহমতের আশায় এবং যে সমস্যার সম্মুখিন তা দূর হওয়ার কামনায় এবং এর মাধ্যমে সে আল্লাহ্‌র সাথে সুস্পষ্ট বিরতিহীনভাবে উত্তমরূপে যোগাযোগ রক্ষা করে যতক্ষণ পর্যন্ত তার চিন্তিত বিষয়টি তাকে বিনিদ্র রাখে। কিন্তু যখন তার কষ্ট দূর হয়ে যায় তখন শয়তান তাকে ভুলিয়ে দেয় পূর্বে যে অবস্থা তার জন্য বিরাজমান ছিল। এভাবে আস্তে আস্তে আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ক দূর হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগের কারণ (ইবাদাত) ছিন্ন হয়ে যায়। পুনরায় সে গাফলতিতে নিয়োজিত হয়। এমনকি সে আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের একাধিক যায়গায় মানুষের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যখন সে কোন কঠিন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۤئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

'আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে থাকে। তারপর আমি যখন তার দুঃখ-দৈন্য দূর করি, সে এমন পথ অবলম্বন করে, যেন তাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করেছিল তার জন্য সে আমাকে ডাকেইনি। যারা সীমালংঘন করে তাদের কাজ তাদের কাছে এভাবেই শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে।'[৯৭]

এ আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা এসেছে ঐ মানুষের জন্য যে বিপদে পতিত হয় বা কষ্টের ভিতরে নিপাতিত হয় এবং সর্বদা সে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করেন। আর যখন আল্লাহ তা'আলা তার এই বিপদকে দূর করে দেন যে বিপদ তাকে ঘিরে ছিলো সে সবকিছু ভুলে যায় এবং পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যায়।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ . وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَاۤءَ بَعْدَ ضَرَّاۤءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ .

৯৬ সূরা আল বাকারাহ, ২ : ২০৭।

৯৭ সূরা ইউনুছ, ১০ : ১২।

'আর যদি আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমত আস্বাদন করাই, অতঃপর তার থেকে তা কেড়ে নেই, তাহলে সে নিশ্চয় নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়বে। আর দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে নি'আমত আস্বাদন করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, আমার থেকে বিপদ-আপদ দূর হয়ে গেছে, আর সে হবে অতি উৎফুল্ল ও অহংকারী।'[৯৮]

আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদের থেকে তার নেককার ধৈর্যশীল নিয়মিত আনুগত্যকারী গুনাহ বর্জনকারী লোকদেরকে আলাদা করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা এবং পুণ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ .

'তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।'[৯৯]

এ কারণেই ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য আল্লাহ্র আনুগত্য করা, সুখে-দুঃখে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাওয়া, নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা এবং কাজ-কর্মে ইসলামী আকিদার উপরে দৃঢ় থাকা। আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দুরে থাকা যেগুলো আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূল (সা) তার হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট করেছেন।

উপসংহার

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও পর্যায় নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তা'আলার এক রহস্যময় অলৌকিক নিদর্শন। কাদামাটি থেকে সর্বপ্রথম মানব আদম (আ) এর সৃষ্টি, তারপর তার থেকে হাওয়া (আ) এর সৃষ্টি। অতঃপর তাদের উভয়ের মাধ্যমে মাতৃজঠরে শুক্র বিন্দু থেকে শুরু করে রুহ পর্যন্ত সাতটি স্তর অতিক্রমের পর পরিপূর্ণতা লাভ করে মানব শিশুর জন্ম। এ ছাড়া ঈসা (আ) এর সৃষ্টি এক ব্যতিক্রম সৃষ্টি, বিশেষ নিদর্শন। এ সকল কিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার এক উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন। আল্লাহ তা'আলা এগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করে তার জবাবদিহিতার ব্যপারেও সতর্ক করেছেন। নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি ও খারাপ প্রবণতা। আর তাদের জন্য দিয়েছেন অগণিত নেয়ামত। মানুষ আল্লাহ তা'আলার দেয়া নেয়ামতরাজি ভোগ করতে থাকে কিন্তু সে নিয়ামতগুলোর সদ্ব্যবহার করতে চায় না। সেগুলোর হক যেভাবে আদায় করতে বলা হয়েছে সেভাবে সে আদায় করে না। সে একাই সব ভোগ করতে চায়। সে যখন সুখে থাকে তখন সে

---

৯৮ সূরা হূদ, ১১: ৯।

৯৯ সূরা হূদ, ১১: ১১।

আল্লাহকে ভুলে যায় কিন্তু বিপদে পড়লে তখন সে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। কিন্তু যখন তার বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায় ঠিক তখনই আবার দূরে সরতে থাকে। যখন সে পার্থিব জীবনে বিভিন্ন কঠিন ধাপগুলো মোকাবেলা করে, তখন তাকে দুর্বলতা ও সংকীর্ণতা হতাশায় পেয়ে বসে। সে অস্থির হয়। অথচ তার উপরে দায়িত্ব ছিলো যে, আল্লাহ ত'আলার শুকরিয়া আদায় করে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করা, কঠিন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহ উপর ভরসা করে তাঁর নির্দেশ অনুসারে কাজ করা। তার কর্তব্য ছিল তার খারাপ প্রবণতা ও কুপ্রবৃত্তিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে একজন মানুষ হিসেবে মহান আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশায় থেকে স্বীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা। তাকে আল্লাহ তা'আলা যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সে মর্যাদা রক্ষা করে সংযমী, পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে আল্লাহ্র পছন্দের বান্দায় পরিণত হওয়া। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দিন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি.

আল-কুরআনে সংখ্যাবিজ্ঞান : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম*

[Abstract : Al Quran is the source of the entire wisdom. Diverse sources and principles of the general knowledge and the science are derived from Al Quran. Of all the essentialities of human being, nothing has remained absent in Al Quran, even the art of calculation. Al Quran comprises all the numbers required to operate daily human activities. Thus, the use of numbers or the mathematical analysis has been encompassed in the wording of Al Quran. The control of the exchange, the protection of the wealth, the payment of the loan and the distribution of the estate of the deceased are only manageable by the use of numbers. Even the numbers are essential in the astrology, land survey and medical sciences. Therefore, the understanding of truth is meant to be seeded into the brain of any person who discovers this knowledge at the initial phase of learning. Consequently, that person recognizes truth as the way of life, because the problem-solving technique here is crystal-clear. Hence, in this article, I will analyze about the application and the usefulness of the cardinal and the ordinal numbers among the vocabularies of Al Quran, about fractural numbers and a clear idea about plus, minus and multiple math.]

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'[১] উপাধিতে যিনি ভূষিত, তাঁর উপর এটা নাযিলকৃত। এটা সকল জ্ঞান ও মূলনীতির আধার। সবকিছু এ কুরআন থেকেই উৎসারিত। মানব জাতির প্রয়োজনীয় সকল বিষয় এতে সন্নিবেশিত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন- مَا فَرَّطْنَا فِىْ الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ "কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি" (সূরা আনআম : ৩৮)। তাই আল-কুরআনে শব্দ হিসেবে সংখ্যার যে ব্যবহার তথা

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ . "আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)।

গণিতের[২] বিষয়টিও বাদ পড়েনি। এ সংখ্যা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি বলে থাকি। সংখ্যার ব্যবহারে আজকের এই পর্যায়ে পৌঁছতে মানুষের বহুকাল লেগেছে। গণিতবিদ ও দার্শনিকদের বহু হাজার বছরের অব্যাহত সাধনার বিনিময়ে আজকের এই সংখ্যা পদ্ধতি বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন কালে মানুষ হাতের আঙ্গুল বা আঙ্গুলের কর, নুড়িপাথর, কড়ি, বাঁশের কাঠি, শস্যের দানা, দড়িতে গিঁট দেয়া, মাটিতে দাগ টানা ইত্যাদির সাহায্যে সংখ্যা ও এর সমষ্টি প্রকাশ করতো।[৩] সভ্যতার অগ্রগতির ধাপে ধাপে মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটতে থাকে। মানুষ ক্রমন্বয়ে গণনার কাজে নানা ধরনের চিহ্ন বা প্রতীকের ব্যবহার শুরু করে। প্রাচীন ব্যাবিলনের মানুষ দুই ধরনের গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করতো। ক্ষুদ্র সংখ্যার জন্য তারা ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করতো এবং বৃহৎ সংখ্যার জন্য ব্যবহার করতো ৬০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি।[৪]

মিসরবাসী জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ব্যাবিলন, কাল্‌দানী এবং ফিনিশিয়দের উপর নির্ভরশীল ছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতায় প্রাচীনকালে ব্যাবিলনীয়রাই শ্রেষ্ঠ ছিলো। অপরদিকে গ্রিকরা ছিলো মিসরবাসীর উপর নির্ভরশীল। রোমান এবং ভারতীয়রা গ্রিক জাতির পূর্ববর্তীদের কাছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঋণী। আরবরা এদের কাছ থেকেই মূলত সংখ্যার ধারণা লাভ করে। আর ইউরোপবাসী সংখ্যাবিজ্ঞানের জ্ঞান আরবদের কাছ থেকে অর্জন করে।[৫] ব্যাবিলনীয়দের পর প্রাচীন মিসরিয়রা এই সংখ্যা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেন খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ শতকে। মিসরিয়দের সাথে গ্রিকদের যোগাযোগ ছিলো আগ থেকেই। সে সুবাধে তারা মিসরিয়দের থেকে এই সংখ্যা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করে। গ্রিকদের যোগাযোগ ব্যাবিলনীয়দের সাথেও ছিলো। মিসরিয়দের থেকে গ্রিকরা যা নিয়েছে তার সাথে আরো কিছু যুক্ত করে এই বিজ্ঞানকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। তাদের এই জ্ঞানের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয়দেরও অবদান ছিলো।

---

২. গণিত এমন জ্ঞান, যাতে যাবতীয় পরিমাপ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। এটা সকল বিজ্ঞানের প্রবেশ দ্বার এবং এর পূর্ণতাদানের নিয়ামক। কারণ, বিজ্ঞানের মূল ভাষা হচ্ছে গণিত (মুস্তফা ইবন আব্দিল্লাহ ওরফে হাজী খলীফা, *কাশফুজজুনূন আন-আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, বৈরূত: দারুল উলূমিল হাদীসা, তা.বি., খণ্ড ২, পৃ. ৬৬৩)। সুতরাং যে শাস্ত্র সংখ্যা, প্রতীকমূলক ভাষায় বিমূর্ত চিন্তন এবং প্রয়োজনীয় ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে তাই গণিত (আহমাদ ইবন মুস্তফা, *মিফতাহুস সাদাত ওয়া মিসবাহুস সিয়াদাত ফী মাওদূআতিল উলূম*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সং. ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৮)।

৩. বুতরুস আল-বুস্তানী, *দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. বি.), খণ্ড ৬, পৃ. ৩৭৩

৪. প্রাগুক্ত, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৭৩

৫. কাদরী হাফেজ তুকান, *তুরাছুল আরাবীল ইলমী ফির রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল ফালাক* (কায়রো : মাতবাআতু লাজনাতিত তালিফ ওয়াত তরজমা ওয়ান নাশর, ১৯৫৪ খ্রি.), টীকা নং ১, পৃ. ২৭

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যভট্ট (৪৭৬-৫৫০) এবং খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮-৬৭০) ভারতীয় গণিতবিদগণের পুরোধা। তাদের কাছে এই সংখ্যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিত্র এবং ধরন ছিলো। গণিত শাস্ত্রে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।[৬]

উল্লেখ্য যে, ফিনিশিয়দের থেকে লেখার প্রচলন শুরু হলেও আরবী লেখা আরবের আন্‌বার (الأنبار) গোত্রের লোকেরা শুরু করে।[৭] তাদের মধ্যে মুরামার ইবন মুর্‌রা (مرامر بن مرة) প্রথম আরবী লেখা শুরু করেন। প্রাচীন ইয়াদ গোত্রের আন্‌বারের একদল লোক প্রথমত ألف, ب, ت এবং ث ইত্যাদি আরবী বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। তাদের থেকে আরবরা লিখনশিল্প শিক্ষা গ্রহণ করে।[৮] অপরদিকে দক্ষিণ আরবের লোকেরা ১ (এক) সংখ্যা বুঝাতে একটা রেখা টেনে দিতো, ২ (দুই) সংখ্যা বুঝাতে দুইটা রেখা টেনে দিতো। ৩ সংখ্যা বুঝাতে লম্বা তিনটা রেখা টেনে দিতো। এভাবে তারা গাণিতিক সংখ্যা নির্ধারণ করতো। নিম্নোক্ত ছক থেকে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। [৯]

রেখাচিত্র-১

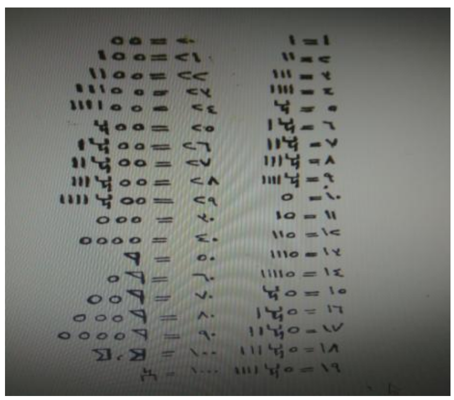

৬. মুহাম্মদ হাসান আল ইয়াসীন, *আল আরকামুল আরাবিয়্যাহ মাওলুদুহা, নাশআতুহা, তাতাওওয়ারুহা* (বাগদাদ : মাতবাআতুল মাজমাআতিল ইলমি আল ইরাকী, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১-৪; *তুরাছুল আরাবীল ইলমী ফির রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল ফালাক*, পৃ. ২৮-৩৭

৭. এ কথা সত্য যে, নবী হুদ (আ.) এর কাতেবে ওয়াহী ছিলেন খাফলুজান ইবনুল ওয়াহ্‌ম। কোনো এক ব্যক্তি তাঁর থেকে লেখা শিক্ষা করে ইয়ামান যায়। হিরাবাসী তার থেকে লেখা শিখে। তাদের থেকে আন্‌বার গোত্রের লোকেরা লিখন শিল্প আয়ত্ব করেন। এভাবেই গোটা আরবে লেখার প্রচলন শুরু হয় (ড. জাওয়াদ আলী, *আল মুফাস্‌সাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, সাআদাত জামিআতু বাগদাদ আলা নাশরিহি, ১৯৯৩ খ্রি., খণ্ড ৮, পৃ. ১৬৪)।

৮. ড. জাওয়াদ আলী, *আল মুফাস্‌সাল ফী তারীখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, (সাআদাত জামিআতু বাগদাদ আলা নাশরিহি, ১৯৯৩ খ্রি.), খণ্ড ৮, পৃ. ১৬০

৯. *আল আরকামুল আরাবিয়্যাহ মাওলুদুহা, নাশআতুহা, তাতাওওয়ারুহা*, পৃ. ৬; *আল মুফাস্‌সাল ফী তারীখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খণ্ড ৮, পৃ. ২২৬

পরবর্তীতে তারা ৫ (পাঁচ) সংখ্যা বুঝাতে আরবী خ বর্ণ এবং ১০ (দশ) সংখ্যা বুঝাতে ع বর্ণ ব্যবহার করতো। কোনা কোনো গোত্রের লোক এই গাণিতিক সংখ্যা বুঝাতে নুক্তা (.) ব্যবহার করতো। ফিনিশিয় এবং ইরাম জাতি ১ (এক) থেকে ৯ (নয়) পর্যন্ত রেখা টেনেই গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করতো। ৫ (পাঁচ) সংখ্যাকে তারা ল্যাটিন সংখ্যার কাছাকাছি অর্থাৎ দেখতে অনেকটা ইংরেজি পাঁচ সংখ্যার মতো। আর ল্যাটিন অক্ষর y এর মান ৫ (পাঁচ)। তারা ৬ (ছয়) বুঝাতে ৫ (পাঁচ) এর পর একটা লম্বা রেখা টেনে দিতো। অর্থাৎ ৫ + । (y ׀) এর সমষ্টি হলো ৬ (ছয়)। অনুরূপভাবে তারা ৯ (নয়) সংখ্যা পর্যন্ত এই রেখা টেনেই তাদের দৈনন্দিন জীবনে গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করে কাজ সমাধা করতো। ১০ (দশ) সংখ্যা বুঝাতে নুক্তা ব্যবহার করতো; ২০ (বিশ) বুঝাতে ২ (দুই) এর পরে নুক্তা (.) দিতো। ৪০ (চল্লিশ) সংখ্যা বুঝাতে দুইবার ২০; ৬০ (ষাট) সংখ্যা বুঝাতে তিনবার ২০; ৮০ (আশি) বুঝাতে চারবার ২০ সংখ্যা এবং ১০০ (এক শত) সংখ্যা বুঝাতে তারা।° বা ·> বা ب এই চিহ্ন ব্যবহার করতো।[১০]

ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশে আরবরা এই ভারত উপমহাদেশে আসে। তারা ভারতের গাণিতিক সংখ্যা এবং এর বিন্যাস সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। ভারতীয়দের কাছে সংখ্যার বিভিন্ন আকার ও ধরন ছিলো একথা আমরা আগেই বলেছি। আরবরা তাদের কাছ থেকে গাণিতিক সংখ্যার জ্ঞান অর্জন করে। পরে তারা সেগুলোর বিন্যাস এবং পরিমার্জন করে। সেগুলোকে তারা দুটি ধারায় বিভক্ত করে। একটার নাম দেয় 'আল আরকামুল হিন্দিয়্যাহ' (হিন্দিসংখ্যা পদ্ধতি), যা আরব ভূখণ্ড এবং এর আশপাশের লোকদের মাঝে প্রচলিত হয়। অন্যটির নাম দেয় 'আল আরকামুল গুবারিয়্যাহ' (তক্তার উপর ধূলা ছড়িয়ে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি), যা পাশ্চাত্য এবং স্পেনের লোকেরা ব্যবহার করে। এই আরবদের থেকেই ইউরোপে সংখ্যাবিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে।[১১] ভারতীয়রা শূন্য বুঝাতে নুক্তা (.) ব্যবহার করতো। এরপর তারা গোল (০) চিহ্ন ব্যবহার করলো। কিন্তু এই গোল চিহ্ন আরবী (৫) এর মত মনে হয় বিধায় তারা সেফর[১২] বা শূন্যকে নুক্তা (.) দিয়েই ব্যবহার করে। এ কথা সত্য যে, হিন্দি সংখ্যায় নুক্তাকে শূন্যের স্থলে ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে আল আরকামুল গুবারিয়্যার ক্ষেত্রে মধ্যখান ফাঁকা গোল চিহ্ন দিয়েই ব্যবহার করে, যা ইউরোপ আমেরিকাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে আজও প্রচলিত।[১৩]

---

১০. *আল মুফাস্সাল ফী তারীখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, খণ্ড ৮, পৃ. ২৪২- ২৪৭

১১. *তুরাছুল আরাবীল ইলমী ফির রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল ফালাক*, পৃ. ৩৮

১২. ভারতীয়রা শূন্যকে হিন্দি শব্দ সুনিয়া (سونيا) বলতো। আরবরা যাকে সেফর বলে। পরে এই সুনিয়া শব্দটি সেফর শব্দে পরিবর্তিত হয়। এখান থেকেই ফরাসিরা তাদের ভাষায় Cipher, Chiffre। এ সেফর শব্দ থেকেই Zyphyr, Cipher। এরপর একে সংক্ষিপ্ত করে ব্যবহার করা হয় Zero (*তুরাছুল আরাবীল ইলমী ফির রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল ফালাক*, পৃ. ৩৯-৪০)।

১৩. *তুরাছুল আরাবীল ইলমী ফির রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল ফালাক*, পৃ. ৩৮

মুসলিম পাশ্চাত্যের (আল মাগরিবীর) লোকেরা সংখ্যা বুঝাতে চিত্র ব্যবহার করতো। তারা ১ বুঝাতে এক কোণবিশিষ্ট রেখা, ২ বুঝাতে দুই কোণবিশিষ্ট রেখা বা চিত্র ব্যবহার করতো। অর্থাৎ গাণিতিক সংখ্যা বুঝাতে তারা জ্যামিতিক রেখার মতো করে ব্যবহার করতো। আবার অনেকে বলেছেন, আরবী গাণিতিক সংখ্যার স্রষ্টা হলো মরক্কবাসী। এদের যোগাযোগ ভারতের সাথে ছিলো না; ছিলো গ্রিক এবং রোমানদের সাথে। গ্রিকদের কাছে এই সংখ্যার বিন্যাস ছিলো না, ছিলো রোমানদের কাছে। কারণ রোমান জাতি সংখ্যার বিন্যাস জানতো।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর আগমনের পূর্বে ইয়ামান, ইরাক এবং সিরিয়ার আরবরা সংখ্যার প্রতীক হিসেবে অক্ষর তথা أ, ب, ج ইত্যাদি আরবী বর্ণমালা ব্যববহার করতো। যেমন خ দ্বারা ৫ (পাঁচ) সংখ্যা, ع দ্বারা ১০ (দশ) সংখ্যা এবং م দ্বারা ১০০ (একশত) সংখ্যা বুঝাতে- ইত্যাদি আরবী বর্ণমালাকে- তারা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে গাণিতিক মান হিসেবে ব্যবহার করতো। তারা এর নাম দেয় 'আল হুরুফুল আবজাদিয়্যাহ' (الحروف الأبجدية)। অর্থাৎ أبجد ، هوز، حطي، كلمن سعفص، قرشت، ثخذ وضظغ। আবজাদ (أبجد), হাওওয়াজ (هوز) এবং হুত্তি (حط) এই নয়টি অক্ষর তারা এক থেকে নয় এর প্রতীক বা গাণিতিক সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করতো। তার পরের নয়টি অক্ষরকে তারা দশক সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করতো। এটা তারা করতো নব্বই পর্যন্ত। বাকি নয়টা অক্ষর তারা একশ সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহার করে। সর্বশেষ غ কে তারা ১০০০ (এক হাজার) গানিতিক মান বুঝাতে ব্যবহার করতো। রাসূলুল্লাহ (স.) এর সময়ও মুসলমানরা এভাবে গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করতো।[১৫] নিম্নোক্ত ছকে এর ধরন উল্লেখ করে দেখানো হলো :[১৬]

ছক-২

অক্ষর	অক্ষরের গাণিতিক মান	অক্ষর	অক্ষরের গাণিতিক মান
أ	১	س	৬০
ب	২	ع	৭০
ج	৩	ف	৮০
د	৪	ص	৯০

১৪. সালেহ ইবন ইবরাহীম আল হাসান, *আরকামুনাল আরাবিয়্যাহ* (মাজাল্লাতুল দেরইয়্যাহ, আস সানাতুস ছানিয়াহ, আল আদাদুস ছামেন, শাওয়াল ১৪২০ হি.); মুহাম্মদ আর সিররাজ, *আত তবিউল আরাবী ফিল আরকামিল আরাবিয়্যাহ* (আল লিসানুল আরাবী, আদাদুছ ছালেছ), পৃ. ৬৭

১৫. সালেহ ইবন ইবরাহীম আল হাসান, *আরকামুনাল আরাবিয়্যাহ* (মাজাল্লাতুল দেরইয়্যাহ, আস সানাতুস ছানিয়াহ, আল আদাদুস ছামেন, শাওয়াল ১৪২০ হি.); আলী আব্দুল্লাহ আদ দাফ্ফা, *আল মুজিয ফিত তুরাছিল ইলমী আল আরাবীল ইসলামী* (নিউ ইয়ার্ক, তা.বি.), পৃ. ৫৭

১৬. *তুরাছুল আরাবীল ইলমী ফির রিয়াদিয়্যাতি ওয়াল ফালাক*, টীকা নং ১, পৃ. ৩৮

ه	৫	ق	১০০
و	৬	ر	২০০
ز	৭	ش	৩০০
ح	৮	ت	৪০০
ط	৯	ث	৫০০
ي	১০	خ	৬০০
ك	২০	ذ	৭০০
ل	৩০	ض	৮০০
م	৪০	ظ	৯০০
ن	৫০	غ	১০০০

সুতরাং প্রাচীন কাল থেকে সংখ্যার ব্যবহার প্রচলন থাকলেও মূলত 'অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদের খলীফা আল-মানসূরের রাজত্বকালেই মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যার ব্যবহার এবং গণিত শাস্ত্র[১৭] সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা শুরু হয়। এ সময়ের কয়েকজন গণিতবিদের নাম আবূ ইয়াহ্ইয়া, আবূ ইসহাক আল-ফারাজী এবং তৎপুত্র দ্বিতীয় ফারাজী'।[১৮] ফারাজীদের উৎসাহে ভারতীয় পণ্ডিতগণ, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ কংক ব্রহ্মগুপ্তের *সিদ্ধান্ত* নামক জ্যোতির্বিদ্যার বই ৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে আনেন এবং সিন্দহিন্দ নামে প্রথম সংখ্যা লিখন পদ্ধতি আরবদেশে প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে এটাই আরবী লিখন পদ্ধতি (Arabic Numerals) নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। উল্লেখ্য যে, বিশেষ করে শূন্যের ব্যবহারে ভারতীয়দের

১৭. কবে এবং কোথায় গণিতের সৃষ্টি হয়েছিল, এর উৎপত্তির আদিম ইতিহাস সম্বন্ধে নিশ্চিত মন্তব্য করা অসম্ভব। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীন সভ্যদেশগুলো অর্থাৎ মিসর, ব্যাবিলন, চীন এবং ভারতে খ্রিস্টপূর্ব দুই তিন হাজার বছর আগে গণিত চর্চা হতো (নন্দলাল মাইতি, *গ্রীক গণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিতহাস*, কলকাতাঃ ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ১)। প্রাচীন মিসরীয়রা সংখ্যানির্দেশক শব্দ চিত্রলিপি দিয়ে প্রকাশ করলেও রোমানরা ২০০০ বছর আগে ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহার করতো, যা রোমান চিহ্ন হিসেবে পরিচিত (বিনয় মজুমদার, *মানুষ কি করে গুনতে শিখল*, কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় সং ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৪, ৮-৯)। ব্যাবিলনে একক বুঝানো হতো একটি খাড়া তীর চিহ্ন দিয়ে, দুই বুঝানো হতো দুটো খাড়া তীর চিহ্ন দিয়ে, এভাবে তারা নয় পর্যন্ত খাড়া তীর চিহ্ন ব্যবহার করতো (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)।

১৮. এ, এফ, এম, আব্দুর রহমান, *মাদ্রাসা গণিত পাটী গণিত* (নবম দশম শ্রেণীর জন্য), কারিকুলাম এণ্ড টেক্সট বুক উইং বাংলাদেশ মাদ্রারা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (চকবাজার, ঢাকা-১১: মেহাম্মদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১১৭; *দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ*, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৭৩; আল-মাজমূআতুল কামিলাহ লি মুআল্লাফাতিল উসতায আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, *হাদারাতুল ইসলাম* (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-লুবনানী), ১ম সং ১৯৭৮ খ্রি., খণ্ড ১০, পৃ. ২৪

অবদানের কথা স্বীকার করতেই হবে।[১৯] মুহাম্মদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিজমী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *হিসাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা* গ্রন্থেই প্রথম হিন্দি সংখ্যা ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তাঁর বই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং ইউরোপ ও উন্নত বিশ্বে ইন্দো-আরবীয় গণনা পদ্ধতি প্রচলিত হয়।[২০] আজকের আধুনিক ইউরোপীয়গণ আরবদের কাছ থেকে সংখ্যার ধারণা গ্রহণ করে।[২১] সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনে কথায় মৌল সংখ্যা, ক্রমবোধক সংখ্যা, ভগ্নাংশ জ্ঞাপক সংখ্যা, যোগ অংক, বিয়োগ অংকের সুস্পষ্ট ধারণা এবং গুণ অংকের ব্যবহার তুলে ধরাসহ সংখ্যার উপকারিতা আমি আমার এ প্রবন্ধে উল্লেখ করবো।

আরবীতে মূল সংখ্যা ১২ টি। যথাঃ ওয়াহিদ (وَاحِد) এক; ইছনান (اِثْنَانِ) দুই; ছালাছাহ (ثَلاَثَةٌ) তিন; আরবা'আ (أَرْبَعَةٌ) চার; খাম্‌সা (خَمْسَةٌ) পাঁচ; সিত্তা (سِتَّةٌ) ছয়; সাব'আ (سَبْعَةٌ) সাত; ছামানিয়া (ثَمَانِيَةٌ) আট; তিস'আ (تِسْعَةٌ) নয়; 'আশারা (عَشَرَةٌ) দশ; মিয়া (مِائَةٌ) একশত এবং আল্‌ফ (أَلْفٌ) হাজার।[২২] মানুষ দৈনন্দিন জীবনে কার্য নির্বাহের জন্য যেই সব সংখ্যার প্রয়োজনবোধ করে, এর সবই আল-কুরআনে বিদ্যমান। মৌল সংখ্যা (Cardinal Number), ক্রমবোধক সংখ্যা (Ordinal Number) এবং ভগ্নাংশ জ্ঞাপক সংখ্যা আল-কুরআনে বক্তব্য ব্যপদেশে যা উল্লেখ আছে, তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলোঃ

মৌল সংখ্যা (Cardinal Number)

আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে মৌল সংখ্যা, ক্রমবোধক সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ জ্ঞাপক গাণিতিক সংখ্যাগুলো সংখ্যায় প্রকাশ না করে কথায় প্রকাশ করেছেন।

১. ওয়াহিদ (وَاحِدٌ) বা এক (১)। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط 0

"যারা বলে, আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন তারা তো কুফরী করেছে যদিও **এক** ইলাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই" (আল-কুরআন, ৫ : ৭৩)।

قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِىْ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ.

১৯. *দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ*, খণ্ড ৬, পৃ.৩৭৩; আল-মাজমূআতুল কামিলাহ লি মুআল্লাফাতিল উসতায আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, *হাদারাতুল ইসলাম* (বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-লুবনানী), ১ম সং ১৯৭৮ খ্রি., খণ্ড ১০, পৃ. ২৪; *মাদ্রাসা গণিত পাটী গণিত* (নবম দশম শ্রেণীর জন্য), পৃ. ১১৭

২০. *কাশফুজ জুনূন আন-আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, খণ্ড ২, পৃ. ৬৬৪; *দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ*, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৭৪

২১. *আল-মাওসূ'আতুল আরাবিয়্যাহ আল-মুইয়াসসারা*, খণ্ড ১, পৃ. ৮৭৮

২২ . জামালুদ্দীন ইবন হাজিব, *কাফিয়া* (ঢাকা, চক বাজারঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ১৮৬

"বলো, তিনি তো **এক** ইলাহ্ এবং তোমরা যে শরীক করো তা থেকে আমি অবশ্যই মুক্ত" (সূরা আনআম : ১৯)।

এতদ্ভিন্ন আল কুরআনুল কারীমে আরো বহু আয়াতে (বাকারা : ৬১, ১১৩, ১৬৩; নিসা : ১, ৩, ১১, ১২, ১০২, ১৭১; মায়িদা : ৪৮; আনআম : ৯৮; আ'রাফ : ১৮৯; তাওবা : ৩১; ইউনুস : ১৯; হূদ : ১১৮; ইউসুফ : ৩৯, ৬৭; রা'দ : ৪, ১৬; ইবরাহীম : ৪৮, ৫২; নাহল : ২২, ৫১, ৯৩; কাহ্ফ : ১১০; আম্বিয়া : ৯২, ১০৮; হাজ্জ : ৩৪; মুমিনূন : ৫২; নূর : ২; আনকাবূত : ৪৬; লুকমান : ২৮; সাবা : ৪৬; ইয়াসীন : ২৯, ৫৩; সাফ্ফাত : ৪, ১৯; সাদ : ৫, ১৫, ২৩, ৬৫; যুমার : ৪, ৬; মুমিন : ১৬; হামীম আস-সাজদা : ৬; শূরা : ৮; যুখরুফ : ৩৩, ৫৪; হাক্কা : ১৪; নাযিআত : ১৩)। ওয়াহিদ (وَاحِدٌ) শব্দটা 'এক (১)' সংখ্যাবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ওয়াহিদ (واحد) এর স্ত্রীলিঙ্গ ওয়াহিদাতুন (وَاحِدَةٌ) এর ব্যবহার পাওয়া যায় ৩১ টি আয়াতে। আহাদ[২৩] (أَحَدٌ) এর স্ত্রীলিঙ্গ ইহ্দা (إِحْدى) একক ও সম্বন্ধবাচক রূপে ৭৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ইছনান (اِثْنَانِ) বা দুই (২)। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

يَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ **اثْنَانِ** ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ،

"হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে **দুইজন** ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে" (সূরা মায়িদা : ১০৬)।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ **مَثْنى** وَثُلاثَ وَرُبَاعَ.

"তোমরা যদি আশংকা করো, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, **দুই**, তিন অথবা চার" (সূরা নিসা : ৩)।

أَلْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولي أَجْنِحَةٍ **مَّثْنى** وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.

"সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্রই, যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশতাদেরকে যারা **দুই দুই**, তিন তিন অথবা চার চার পাখাবিশিষ্ট" (সূরা ফাতির : ১)।

উপরোক্ত দুটি আয়াতে মাছনা (مَثْنَى) তথা দুই দুই, ছুলাছা (ثُلاَثَ) তথা তিন তিন ও রুবা' (رُبَاعَ) তথা চার চার সংখ্যাবোধক তিনটি শব্দই আ'দাদে মুকাররারা (Repitative

২৩. ওয়াহিদ (**وَاحِدٌ**) ও আহাদ (**أَحَدٌ**) শব্দদ্বয় আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে একই অর্থ বহন করে। তবে আহাদ (**أَحَدٌ**) শব্দটা আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কারও জন্য গুণবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয় না (ড. ইব্রাহীম মাদকূর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসায়নিয়া, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ১০১৬)।

Number) পুনঃপুনঃ উক্ত শব্দ হতে উদ্ভূত। এ তিনটি শব্দই আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রমতে গায়রু মুনসরিফ (غَيْرُ مُنْصَرِفٌ)। কেননা, এগুলো মা'দূল (مَعْدُوْلٌ) এবং এগুলোর অর্থের মধ্যে গুণবাচকতা বিদ্যমান। কারণ, এই শব্দগুলোর সৃষ্টিই হয়েছে গুণবাচকরূপে (বরং এ শব্দগুলোর গুণবাচকতাও হচ্ছে আরিদী (عَارِضِىْ) বা ব্যতিক্রমিক)। ইছনানি (اِثْنَانِ) ও ইছনায়নি (اِثْنَيْنِ) বা দুই (২) সংখ্যাবোধক শব্দটা আরও যে সকল আয়াতে পাওয়া যায় তা হলোঃ আনআম : ১৪৩, ১৪৪; তাওবা : ৪০; হূদ : ৪০; রা'দ : ৩; নাহল : ৫১; মুমিনূন : ২৭; ইয়াসীন : ১৪; বাকারা : ৬০; আ'রাফ : ১৬০; নিসা : ১১, ১৭৬; মুমিন : ১১।

৩. ছালাছ (ثَلاَثٌ) এর স্ত্রীলিঙ্গ ছালাছা (ثَلاَثَةٌ) বা তিন (৩)। এটা আল-কুরআনে **১৯** বার ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ **ثَلاَثَ** لَيَالٍ سَوِيًّا.

"যাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কারো সাথে **তিন** দিন বাক্যালাপ করবে না" (সূরা মারয়াম : ১০)।

এতদ্ভিন্ন আল-কুরআনুল কারীমে আরো বহু আয়াতে যেমন : বাকারা : ১৯৬, ২২৮; আলে ইমরান : ৪১, ১২৪; নিসা : ১৭১; মায়িদা : ৭৩, ৮৯; তাওবা : ১১৮; হূদ : ৬৫; কাহ্ফ : ২২, ২৫; নূর : ৫৮ (২বার); যুমার : ৬; ওয়াকিয়া : ৭; মুজাদালা : ৭; তালাক : ৬৫ : ৪; মুরসালাত : ৩০ ইত্যাদি আয়াতে ছালাছ (ثَلاَثٌ) শব্দটা 'তিন' সংখ্যাবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. আরবা'আ (أَرْبَعٌ) চার (৪)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ **أَرْبَعُ** شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّه لَمِنَ الصّادِقِيْنَ.

"এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি (যেনার) অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্র নামে **চার**বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী" (সূরা নূর : ৬)।

এ আয়াতে আরবা'উ (أَرْبَعٌ) শব্দটা 'চার' সংখ্যাবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবা'উন (أَرْبَع) বা আরবা'আতুন (أَرْبَعَةٌ) সংখ্যাবোধক শব্দটা আল-কুরআনে মোট বারো বার এসেছে। যেমন, বাকারা : ২৩, ২২৬, ২৬০; নূর : ১৩, ৪৫, ৬৮; তাওবা : ২, ৩৬; হা মীম আস-সাজদা : ১০।

৫. খাম্সাতুন (خَمْسَةٌ) পাঁচ (৫)। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلاَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ **خَمْسَةٌ** سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ.

"কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর এবং কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল **পাঁচজন**, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর, অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে" (সূরা কাহ্‌ফ : ২২)।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ **خَمْسَةٍ** إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ.

"তুমি কি লক্ষ করো না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং **পাঁচ** ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেনো। অতঃপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত" (সূরা মুজাদালাঃ ৭)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে খাম্‌সাহ (خَمْسَةٌ) শব্দটা পাঁচ সংখ্যাবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. সিত্তাতুন (سِتَّةٌ) ছয় (৬)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ **سِتَّةِ** أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ.

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী **ছয়** দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন" (সূরা আ'রাফ : ৫৪)।

এতদ্ভিন্ন আল কুরআনুল কারীমে আরো বহু আয়াতে (ইউনুস : ৩; হূদ : ৭; ফুরকান : ৫৯; আলিফ লাম-মীম-আস-সাজদা : ৩২ : ৪; কাফ : ৩৮; হাদীদ : ৪) সিত্তাহ শব্দটা ছয় সংখ্যাবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭. সাব'উন (سَبْعٌ) এর স্ত্রীলিঙ্গ সাব'আতুন (سَبْعَةٌ) অর্থ সাত (৭)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَيَقُوْلُوْنَ **سَبْعَةٌ** وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّيْ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيْلٌ.

"আবার কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল **সাতজন**, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলো, আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন; তাদের সংখ্যা খুব কম লোকেই জানে " (সূরা কাহ্‌ফ : ২২)।

এতদ্ভিন্ন আল কুরআনুল কারীমে আরো বহু আয়াতে অর্থাৎ বাকারা :২৯, ১৯৬, ২৬১; ইউসুফ : ৪৪ (তিন বার), ৪৬ (তিন বার), ৪৭, ৪৮; হিজর : ৪৪, ৮৭; বাণী ইসরাঈল : ৪৪; মুমিনূন : ১৭, ৮৬; লুকমান : ২৭; হা মীম আস-সাজদা : ১২; তালাক : ১২; মুলক : ৩; হাক্কা :

৭; নূহ : ১৫; নাবা : ১২ ইত্যাদি আয়াতে সাব'উন (سَبْعٌ) শব্দটা সাত (৭) সংখ্যাবোধক অর্থ বুঝিয়েছে।

৮. ছামানিয়াতুন (ثَمَانِيَةٌ) আট (৮)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ **ثَمَانِيَةَ** أَزْوَاجٍ .

"এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন **আট** প্রকার গবাদিপশু [২৪]" (সূরা যুমার : ৬।)।

আরও যে সকল আয়াতে (ثَمَانِيَةٌ) আট অর্থবোধক শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো: আনআম : ১৪৩; হাক্কা : ৭, ১৭; কাসাস : ২৭।

৯. তিস'আ (تِسْعَةٌ) বা নয় (৯)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَكَانَ فِيْ الْمَدِيْنَةِ **تِسْعَةُ** رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ.

"আর সেই শহরে ছিল এমন **নয়** ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং সৎকর্ম করতো না" (সূরা নামল : ৪৮)।

এ আয়াতে তিস'আ (تِسْعَةٌ) নয় সংখ্যাবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. বাণী ইসরাঈল : ১৪১; নামল : ১২; সাদ : ২৩; কাফ : ২৫।

১০. 'আশারা (عَشَرَةٌ) অর্থ দশ (১০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ، فَكَفَّارَتُه إِطْعَامُ **عَشَرَةِ** مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ، كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করো সে সকলের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। অতঃপর এর কাফ্ফারা **দশজন** দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্যদান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের আহার করাও, অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যার সামর্থ্য নাই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো" (সূরা মায়িদা: ৮৯)।

এ আয়াতে 'আশারা (عَشَرَةِ) শব্দটা 'দশ' (১০) সংখ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও যে সকল আয়াতে 'আশারা (عَشَرَةٌ) শব্দ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ: বাকারা : ১৯৬, ২৩৪; ফাজর : ২; আনআম : ১৬০; আ'রাফ : ১৪২; হূদ : ১৩; ত্বহা : ১০৩; কাসাস : ২৭।

---

২৪. এ আয়াতে 'আনআম' দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল, এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায়; যথা: হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি, কিন্তু ঘোড়া, গাধা এর অন্তর্ভুক্ত নয় (ই.ফা.বা প্রকাশিত *আল-কুরআনুল করীম*, পৃ. ১৫৭, টীকা নং, ৩৪০)।

১১. আহাদা 'আশারা (أَحَدَ عَشَرَ) এগার (১১)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يَاأَبَتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ.

"স্মরণ করো, ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, হে আমার পিতা! আমি তো দেখেছি **এগারটি** নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে; দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়" (সূরা ইউসুফ : ৪)।

১২. ইছনাতা 'আশারা (اِثْنَتَا عَشَرَةَ) অর্থ বার (১২)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَإِذِ اسْتَسْقى مُوْسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ **اثْنَتَا عَشَرَةَ** عَيْنًا.

"স্মরণ করো, যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলো, আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো। ফলে তা থেকে **বারটি** প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো" (সুরা বাকারা : ৬০)।

আরও যে সকল আয়াতে **১২** সংখ্যাটা বিভিন্নরূপে এসেছে তা হলো: আ'রাফ : **১৬০** (اِثْنَتَيْ عَشَرَ) ও (اِثْنَتَا عَشَرَ); তাওবা : ৩৬ (اِثْنَا عَشَرَ); মায়িদা : **১২**।

১৩. তিসআতা 'আশারা (تِسْعَةَ عَشَرَ) অর্থ উনিশ (১৯)।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

"এর (সাকারের) তত্ত্বাবধানে রয়েছে **উনিশজন** প্রহরী" (সূরা মুদ্দাছ্ছির : ৩০)।

১৪. 'ইশরুন (عِشْرُوْنَ) অর্থ বিশ (২০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالَ، إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ **عِشْرُوْنَ** صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْا أَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ.

"হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো; তোমাদের মধ্যে **কুড়িজন** ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুই শত জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই" (সূরা আনফাল : ৬৫)।

এ আয়াতে 'ইশরুনা (عِشْرُوْنَ) শব্দটা 'বিশ' সংখ্যা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫. ছালাছূনা (ثَلاَثُوْنَ) বা ত্রিশ (৩০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَوَاعَدْنَا مُوْسى **ثَلاَثِيْنَ** لَيْلَةً وَّأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّه أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

"স্মরণ করো, মূসার জন্য আমি **ত্রিশ** রাত নির্ধারণ করলাম এবং আরও দশ দ্বারা তা পূর্ণ করলাম। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত[২৫] পূর্ণ হয় " (সূরা আ'রাফ : ১৪২)।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْه كُرْهًا، وَحَمْلُه وَفِصَالُه **ثَلاَثُوْنَ** شَهْرًا، حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّه وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰيه وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ، إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে **ত্রিশ** মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ করো; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা আহ্কাফ : ১৫)।

উপর উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ছালাছীনা (ثَلاَثِيْنَ) ও ছালাছূনা (ثَلاَثُوْنَ) শব্দদ্বয় দ্বারা ত্রিশ (৩০) সংখ্যা বুঝানো হয়েছে।

১৬. আরবা'ঈনা (أَرْبَعِيْنَ) অর্থ চল্লিশ (৪০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوْسٰى **أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً**

"যখন মূসার জন্য **চল্লিশ** রাত নির্ধারণ করেছিলাম" (সূরা বাকারা : ৫১)।

এ আয়াতে আরবা'ঈনা (أَرْبَعِيْنَ) শব্দটা চল্লিশ (৪০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র . মায়িদা : ২৬; আ'রাফ : ১৪২; আহকাফ : ১৫।

১৭. খামসীনা (خَمْسِيْنَ) অর্থ পঞ্চাশ (৫০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِه فَلَبِثَ فِيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ **خَمْسِيْنَ** عَامًا، فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظَالِمُوْنَ.

---

২৫. হযরত মূসা (আ.)কে তাওরাত প্রাপ্তির জন্য প্রথমে ৩০ দিন পরে আরও ১০ দিন বৃদ্ধি করে মোট চল্লিশ দিন সিয়ামসহ ই'তিকাফের ন্যায় একই স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতে হয়েছিল (ই.ফা.বা. কর্তৃক প্রকাশিত *আল-করআনুল করীম*, পৃ. ২৪৯, টীকা নং, ৪৭৯)। আরও দ্র . আল-কুরআন, ২ : ৫১

"আমি তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল **পঞ্চাশ** কম হাজার বছর। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে; কারণ তারা ছিল সীমালংঘনকারী" (সূরা 'আনকাবূত: ১৪)।

এ আয়াতে খামছীনা (خَمْسِيْنَ) শব্দটা পঞ্চাশ (৫০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮. সিত্তীনা (سِتِّيْنَ) অর্থ ষাট (৬০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ **سِتِّيْنَ** مِسْكِيْنًا.

"যে তাতেও অসমর্থ, সে **ষাটজন** অভাবগ্রস্তকে আহার করাবে" (সূরা মুজাদালা : ৪)।

এ আয়াতে সিত্তীনা (سِتِّيْنَ) শব্দটা ষাট (৬০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯. সাব'উনা (سَبْعُوْنَ) অর্থ সত্তর (৭০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ. ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ. ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا **سَبْعُوْنَ** ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْه.

"ধরো তাকে, তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করো জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করো **সত্তর** হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে" (সূরা হাক্কা : ৩০ - ৩২)।

এ আয়াতে সাব'উনা (سَبْعُوْنَ) শব্দটা সত্তর (৭০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. আ'রাফ : ১৫৫; তাওবা : ৮০।

২০. ছামানীন (ثَمَانِيْنَ) অর্থ আশি (৮০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ **ثَمَانِيْنَ** جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

"যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে **আশিটি** কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্য ত্যাগী" (সূরা নূর : ৪)।

এ আয়াতে ছামানীন (ثَمَانِيْنَ) শব্দটা আশি (৮০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

২১. তিস'উও ওয়া তিস'উনা (تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ) অর্থ নিরানব্বই (৯৯)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

إِنَّ هذَا أَخِيْ لَه **تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ** نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِيْ الْخِطَابِ.

"এই ব্যক্তি আমার ভাই, এর আছে **নিরানব্বইটি** দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও, এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে" (সূরা সোয়াদ: ২৩)।

এ আয়াতে তিস'উও ওয়া তিস'উনা (تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ) শব্দটা নিরানব্বই (৯৯) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

২২. **মিয়াহ (مِائَةٌ) অর্থ এক শত (১০০)**। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

أَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا، قَالَ أَنّٰى يُحْيِي هٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَمَاتَهُ اللهُ **مِائَةَ** عَامٍ ثُمَّ بَعَثَه، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ

"অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে[২৬] দেখোনি, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বললো, মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে **এক শত** বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন, পরে তাকে পুনরর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, তুমি কত কাল অবস্থান করলে? সে বললো, এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, না, বরং তুমি **এক শত** বছর অবস্থান করেছ।" (সূরা বাকারা : ২৫৯)।

এ আয়াতে মিয়াহ (مِائَةٌ) শব্দটা এক শত (১০০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. আনফাল : ৬৫, ৬৬; নূর : ২।

২৩. **মিয়াতায়ন (مِائَتَيْنِ) অর্থ দুই শত (২০০)**। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ، إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا **مِائَتَيْنِ**، وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْا أَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ.

"হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা **দুই শত** জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে এক শত জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই" (সূরা আনফাল : ৬৫)।

এ আয়াতে মিয়াতায়ন (مِائَتَيْنِ) শব্দটা দুইশত (২০০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. আনফাল : ৬৬।

২৪. **ছালাছু মিয়াহ (ثَلاَثُ مِائَةٍ) অর্থ তিনশত (৩০০)**। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ **ثَلاَثَ مِائَةَ** سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا.

"তারা তাদের গুহায় ছিল **তিনশত** বছর, আরও নয় বছর" (সূরা কাহ্ফ : ২৫)।

এ আয়াতে ছালাছু মিয়াহ (ثَلاَثُ مِائَةٍ) শব্দটা তিনশত (৩০০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

২৬. অনেকের মতে ইনি ছিলেন ইসরাঈলী নবী 'উযায়র (আ.); আরও দ্র. আল-কুরআন, ৯ : ৯ (ই.ফা.বা. কর্তৃক প্রকাশিত *আল-কুরআনুল করীম*, পৃ. ৬৭, টীকা নং ১৭৮)।

২৫. আল্ফ (أَلْفٌ) বা এক হাজার (১০০০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ **أَلْفِ** شَهْرٍ

"মহিমান্বিত রাত **হাজার** মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" (সূরা কাদ্‌র : ৩)।

এ আয়াতে আল্ফ (أَلْفٌ) শব্দটা এক হাজার (১০০০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. বাকারা : ৯৬; আনফাল : ৯, ৬৫, ৬৬; হজ্জ : ৪৭; 'আনকাবূত : ১৪; সাজ্‌দা : ৫।

২৬. আলফায়ন (أَلْفَيْنِ) বা দুই হাজার (২০০০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَّغْلِبُوْا **أَلْفَيْنِ** بِإِذْنِ اللهِ، وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

"আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহ্‌র অনুজ্ঞাক্রমে তারা **দুই হাজারের** উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন" (সূরা আনফাল: ৬৬)।

এ আয়াতে আলফায়ন (أَلْفَيْنِ) শব্দটা দুই হাজার (২০০০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে

২৭. ছালাছাতু আলাফ (ثَلاَثَةُ آلاَفٍ) বা তিন হাজার (৩০০০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন

إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ أَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ **بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ** مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ.

"স্মরণ করো, যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক-প্রেরিত **তিন হাজার** ফেরেশ্‌তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন" (আল ইমরান : ১২৪)।

এ আয়াতে ছালাছাতু আলাফ (ثَلاَثَةُ آلاَفٍ) শব্দটা তিন হাজার (৩০০০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৮. খামসাতু আলাফ (خَمْسَةُ آلاَفٍ) পাঁচ হাজার (৫০০০)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

بَلٰى إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ **بِخَمْسَةِ آلاَفٍ** مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

"হাঁ, নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং সাবধান হয়ে চলো, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ্ **পাঁচ হাজার** চিহ্নিত ফেরেশ্‌তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন" (সূরা আলইমরান: ১২৫)।

এ আয়াতে খামসাতু আলাফ (خَمْسَةُ آلاَفٍ) শব্দটা পাঁচ হাজার (৫০০০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে

২৯. খামসীনা আল্ফ (خَمْسِيْنَ أَلْف) অর্থ পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০)।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُه **خَمْسِيْنَ أَلْفَ** سَنَةٍ.

"ফেরেশ্‌তা এবং রূহ্ আল্লাহর দিকে উর্ধবগামী হয় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ বা দৈর্ঘ্য পার্থিব **পঞ্চাশ হাজার** বছর" (সূরা মাআরিজ : ৪)।

এ আয়াতে খামসীনা আল্ফ (خَمْسِيْنَ أَلْف) শব্দটা পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০. মিয়াতু আল্ফ (مِائَةُ أَلْفٍ) অর্থ এক লক্ষ (১,০০,০০০)।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلى **مِائَةِ أَلْفٍ** أَوْ يَزِيْدُوْنَ.

"তাকে (ইউনুসকে) আমি **এক লক্ষ** বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম" (সূরা সাফ্ফাত: ১৪৭)।

এ আয়াতে মিয়াতি আল্ফ (مِائَةِ أَلْفٍ) শব্দটা এক লক্ষ (১,০০,০০০) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩১. উলূফ (أُلُوْفٌ) অর্থ হাজার হাজার। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَّهُمْ **أُلُوْفٌ** حَذَرَ الْمَوْتِ.

"তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যারা মৃত্যুভয়ে **হাজারে হাজারে** স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল" (সূরা বাকারা : ২৪৩)।

এ আয়াতে উলূফ (أُلُوْفٌ) শব্দটা 'হাজার হাজার' সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসেও কথায় সংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

إن لله **تسعة وتسعين** اسمًا، من أحصاها دخل الجنة.

"আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করবে সে জান্নাতে যাবে।"[২৭]

এই হাদীসে তিস'উও ওয়া তিস'উনা (تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ) শব্দটা নিরানব্বই (৯৯) সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা এখন ক্রমবোধক সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ক্রমবোধক সংখ্যা (Ordinal Number)

আল্লাহ্ তাআলা যে সকল ক্রমবোধক সংখ্যা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন নিম্নে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. আওওয়াল (أَوَّلٌ) প্রথম (১ম)। এটা আল-কুরআনে ২৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَآمِنُوْا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُوْنُوْا **أَوَّلَ** كَافِرٍ بِهِ.

---

২৭. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (বৈরুত, দামেশ্‌ক: দারু ইবন কাছীর, ২০০৬ খ্রি.), কিতাবুশ শুরুত, বাব: মা ইয়াজুজু মিনাল ইশতিরাত ওয়াছ ছুনায়া ফিল ইশরার ওয়াশ শূরুত আল্লাতি ইয়াতাআরাফুহান নাসু বায়নাহুম, পৃ. ৬৭৫, হাদীস নং ২৭৩৬; আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইবন আল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম* (লুবনান, বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.), কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া ওয়াত তাওবাতি ওয়াল ইসতেগফার, বাব : ফী আসমাইল্লাহি তাআলা ওয় ফাদলি মান আহসহা, খণ্ড ৪, পৃ. ২০৬২-২০৬৩, হাদীস নং ২৬৭৭

"আমি যা নাযিল করেছি তোমরা তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের নিকট যা আছে তার প্রত্যয়নকারী। আর তোমরাই এটার **প্রথম** প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না।" (সূরা বাকারা : ৪১)।

এ আয়াতে আওওয়াল (أَوَّلٌ) শব্দটা 'প্রথম (১ম)' ক্রমিক সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. আলে-ইমরান : ৯৬; আনআম : ১৪, ৯৪, ১১০, ১৬৩ ইত্যাদি।

২. ছানী (ثَانِيْ) অর্থ দ্বিতীয় (২য়)।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا **ثَانِيَ** اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِيْ الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا.

"যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো, তবে আল্লাহ্ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন। যখন কাফিররা তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের **দ্বিতীয়** জন যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সঙ্গে আছেন" (সূরা তাওবা : ৪০)।

এ আয়াতে ছানী (ثَانِيْ) শব্দটা 'দ্বিতীয় (২য়)' ক্রমিক সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. ছালিছ (ثَالِثٌ) অর্থ তৃতীয় (৩য়)।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ.

"যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দুইজন রাসূল তখন তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। অতঃপর আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম **তৃতীয়** একজন দ্বারা। তারা বলেছিল, আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি" (সূরা ইয়াসীন : ১৪)।

এ আয়াতে ছালিছ (ثَالِثٌ) শব্দটা 'তৃতীয় (৩য়)' ক্রমিক সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. নাজম : ২০; মায়িদা : ৭৩।

৪. রাবি'উন (رَابِعٌ) অর্থ চতুর্থ (৪র্থ)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ **رَابِعُهُمْ** وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ .

"তুমি কি লক্ষ করো না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে **চতুর্থজন** হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না।" (সূরা মুজাদালা : ৭)।

এ আয়াতে রাবি'উ (رَابِعٌ) শব্দটা 'চতুর্থ (৪র্থ)' ক্রমিক সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. কাহফ : ২২।

৫. খামিস (خَامِسٌ) অর্থ পঞ্চম (৫ম)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَ**الْخَامِسَةُ** أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ.

"এবং **পঞ্চম** বারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর অভিশাপ" (সূরা নূর : ৭)।

এ আয়াতে খামিস (خَامِسٌ) শব্দটা 'পঞ্চম (৫ম)' ক্রমিক সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. সূরা নূর : ৯।

৬. সাদিস (سَادِسٌ) অর্থ ষষ্ঠ (৬ষ্ঠ)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلاَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ **سَادِسُهُمْ** كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ .

"কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল তিনজন, তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর এবং কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল পাঁচজন, তাদের **ষষ্ঠটি** ছিল তাদের কুকুর, অজানা বিষয়ে অনুমাদের উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের তাদের কুকুর।" (সূরা কাহ্ফ : ২২)।

এ আয়াতে সাদিস (سَادِسٌ) শব্দটা 'ষষ্ঠ (৬ষ্ঠ)' ক্রমিক সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. মুজাদালা : ৭।

৭. ছামিন (ثَامِنٌ) অর্থ অষ্টম (৮ম)। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّ**ثَامِنُهُمْ** كَلْبُهُمْ.

"আবার কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল সাতজন, তাদের **অষ্টমটি** ছিল তাদের তাদের কুকুর।" (সূরা কাহ্ফ: ২২)। আরও দ্র. কাহফ : ২২।

এখন ভগ্নাংশ জ্ঞাপক সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

ভগ্নাংশ জ্ঞাপক সংখ্যা

আল-কুরআনুল কারীমের যে সকল আয়াতে ভগ্নাংশ জ্ঞাপক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. নিসফ (نِصْفٌ) অর্থ অর্ধেক এবং **২. ছুলুছ (ثُلُث) অর্থ এক তৃতীয়াংশ**। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ **نِصْفَه** وَ**ثُلُثَه** وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ، وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

"তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও **অর্ধাংশ** এবং কখনও **এক-তৃতীয়াংশ** এবং জেগে থাকে তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমাণ" (সূরা মুয্যাম্মিল : ২০)।

আরও দ্র. বাকারা : ২৩৭; নিসা : ১১, ১২, ২৫, ১৭৬; মুজ্জাম্মিল : ৩। এ আয়াতে নিসফ (نِصْفٌ) শব্দটা অর্ধেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ছুলুছ (ثُلُث) শব্দটা এক তৃতীয়াংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র. নিসা : ১১; ১২।

৩. ছুলুছায়, ছুলুছানি ও ছুলুছা (ثُلُثَيْ، ثُلُثَانِ وثُلُثَا) অর্থ দুই-তৃতীয়াংশ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُنَّ **ثُلُثَا** مَا تَرَكَ.

"আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের **দুই-তৃতীয়াংশ**" (সূরা নিসা : ১১)।

এ আয়াতে ছুলুছা (ثُلُثَا) শব্দটা দুই-তৃতীয়াংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. রুবু'উ (رُبُعُ) অর্থ এক চতুর্থাংশ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ **الرُّبُعُ** مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে আর তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের **এক-চতুর্থাংশ**; তাদের ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর" (সূরা নিসা : ১২)।

এ আয়াতে আর-রুবু'উ (الرُّبُعُ) শব্দটা এক চতুর্থাংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. খুমুস (خُمُسُ) অর্থ এক পঞ্চমাংশ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْئٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ **خُمُسَه** وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِىْ الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

"আরও জেনে রাখো, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করো তার **এক-পঞ্চমাংশ** আল্লাহ্‌র, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের।" (সূরা আনফাল : ৪১)।

এ আয়াতে খুমুস (خُمُسُ) শব্দটা 'এক পঞ্চমাংশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. সুদুস (سُدُسُ) অর্থ এক ষষ্ঠাংশ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

فَإِنْ كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ **السُّدُسُ** مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

"তার ভাই-বোন থাকলে মায়ের জন্য **এক-ষষ্ঠাংশ**; এ সবই সে যা ওসিয়াত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর" (সূরা নিসা : ১১)।

এ আয়াতে সুদুস (سُدُسُ) শব্দটা 'একষষ্ঠাংশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও দ্র . নিসা : ১২।

৭. **ছুমুন (ثُمُنٌ) অর্থ এক অষ্টমাংশ**। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ **الثُّمُنُ** مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

"আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের **এক-অষ্টমাংশ;** তোমরা যা ওসিয়াত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর" (সূরা নিসা : **১২**)।

এ আয়াতে ছুমুন (ثُمُنٌ) শব্দটা 'এক অষ্টমাংশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর যোগ অংকের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

আল-কুরআনে কথায় যোগ অংকের ব্যবহার

আল-কুরআনে যোগ অংকের ব্যবহারও পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ **ثَلاَثَةِ** أَيَّامٍ فِيْ الْحَجِّ وَ**سَبْعَةٍ** إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ **عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ**.

"কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় **তিন** (৩) দিন এবং গৃহে ফিরে আসার পর **সাত** (৭) দিন - এই **পূর্ণ দশ** (১০) দিন সিয়াম পালন করতে হবে।" (সূরা বাকারা : **১৯৬**)। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যোগ [অর্থাৎ তিন (৩) + সাত (৭) = দশ (১০)] করে দেখিয়েছেন।

وَوَاعَدْنَا مُوْسى **ثَلاَثِيْنَ** لَيْلَةً وَّأَتْمَمْنَاهَا **بِعَشْرٍ** فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّه **أَرْبَعِيْنَ** لَيْلَةً.

"স্মরণ করো, মূসার জন্য আমি **ত্রিশ** (৩০) রাত্রি নির্ধারণ করি এবং আরও **দশ** (১০) দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় **চল্লিশ** রাত্রিতে[২৮] পূর্ণ হয়" (সূরা আ'রাফ: **১৪২**)।

এ আয়াতেও আল্লাহ্ তাআলা ৩০ (ত্রিশ) + ১০ (দশ) = ৪০ (চল্লিশ যোগ করে দেখিয়েছেন।

বিয়োগ অংকের সুস্পষ্ট ধারণা

আল-কুরআনে বিয়োগ অংকের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلى قَوْمِه فَلَبِثَ فِيْهِمْ **أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا**.

"আমি তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম হাজার বছর (১০০০-৫০ = ৯৫০ সাড়ে নয়শত বছর)।" (সূরা 'আনকাবূত : **১৪**)।

এ আয়াতে পঞ্চাশ কম হাজার বছর দ্বারা = সাড়ে নয়শত বছর বুঝানো হয়েছে। এটা তো বিয়োগ অংকের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

---

২৮. হযরত মূসা (আ.) কে তাওরাত প্রাপ্তির জন্য প্রথমে ৩০ দিন + আরও পরে ১০ দিন বৃদ্ধি করে মোট = ৪০ (চল্লিশ) দিন সিয়ামসহ ই'তিকাফের ন্যায় একই স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতে হয়েছিল (ই.ফা.বা প্রকাশিত *আল-কুআনুল করীম* পৃ. ২৪৯, টীকা নং ৪৭৯)।

হাদীসেও কথায় বিয়োগ অংকের ধারণা পাওয়া যায়। যেমন আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

إن لله تسعة وتسعين اسمًا ، مائةً إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة.

"আল্লাহ্‌র এক কম একশটি (১০০-১) অর্থাৎ নিরানব্বইটি (৯৯টি) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে।"[২৯]

গুণ অংকের ব্যবহার

আল-কুরআনে গুণ অংকের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه **عَشْرُ أَمْثَالِهَا** وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزى إلاَّ مِثْلَهَا.

"কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার **দশগুণ** পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।" (সূরা আনআম : ১৬০)।

কেউ কোন সৎকাজ করলে তার প্রতিদানস্বরূপ সে দশটি (১০টি) নেকীর সাথে আরও দশটি নেকী (১০টি) গুণ করলে যা হয় তা তার আমলনামায় জমা হবে। অর্থাৎ ১০ × ১০ = ১০০ টি নেকী তার আমলনামায় জমা হবে। এ আয়াত থেকে আমরা গুণ অংকের ব্যবহার পেয়ে থাকি। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ **سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ**، وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি (৭টি) শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে এক শত (১০০) শস্যদানা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" (সূরা বাকারা : ২৬১)।

কেউ যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে তাহলে তার দানের উপমা হলো একটি বীজ, আর বীজটিতে সাতটি (৭টি) শীষ গজায়। আবার প্রত্যেক শীষে একশটি (১০০টি) শস্যদানা থাকে। অর্থাৎ আমরা ঐ একটি বীজ থেকে পাই ১×৭×১০০ = ৭০০ টি শস্যদানা। এ আয়াত থেকেও আমরা গুণ অংকের শিক্ষা পেয়ে থাকি। এখন এই সংখ্যার উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

সংখ্যার উপকারিতা

সংখ্যার উপকারিতা সম্পর্কে আরব মণীষীগণ বলেন, লেনদেনের নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের হেফাযত, ঋণ পরিশোধ এবং মীরাছের সম্পদের বণ্টন, সংখ্যা দ্বারাই হয়ে থাকে। এমন কি জ্যোতির্বিদ্যা, ভূমি জরিপ ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সংখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার অনেকেই বলে থাকেন, যে ব্যক্তি এই জ্ঞান সর্বপ্রথম শিক্ষা লাভ করে থাকে তার মস্তিষ্কে সত্যের শিক্ষা

---

২৯. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া ওয়াত তাওবাতি ওয়াল ইসতেগফার, বাব : ফী আসমাইল্লাহি তাআলা ওয় ফাদলি মান আহসহা, খণ্ড ৪, পৃ. ২০৬৩, হাদীস নং ২৬৭৭

গ্রথিত হয়ে যায় এবং সত্যকে মাযহাব হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ, এর সমস্যা এবং সমাধান খুবই সুস্পষ্ট।[৩০]

পরিশেষে বলবো, আল-কুরআন হলো সকল জ্ঞানের আকর। এ আল-কুরআনে কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এমনকি গণনাও। আল-কুরআনে গণনা ও হিসাবের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَه مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ،

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো" (সূরা ইউনুস : ৫)।

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ

"তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয়, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেসা করুন" (সূরা মুমিনূন : ১১৩)।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا . وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

"এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি তা উপস্থিত করবো; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট" (সূরা আম্বিয়া : ৪৭)।

এ সকল আয়াত থেকে আমরা গণিতের কথাই জানতে পারি। আর বিশেষজ্ঞ মুসলিম পণ্ডিতগণ আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বাণী থেকে জ্ঞানচর্চার প্রতি অনুপ্রেরণা পেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তথা জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, গণিত এবং নতুন নতুন আবিষ্কারে এবং গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। উপরোক্ত বিষয়াদিতে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা হলেন আল-ফারগানী, আল-খাওয়ারিজমী, আল-কিন্দী, আবু জাফর মোহাম্মাদ, আবুল কাসেম আহমদ, আল-হাসান ইবন মূসা ইবন শাকির, আল-মাহানী, ছাবিত ইবন কোরা, হোনায়েন ইবন ইসহাক, আল-বাত্তানী, আবুল ওয়াফা, আবু কামিল, আল-কারখী, আল-বিরুনী, ইবনে সীনা, ইবনে ইউনুস, ইবনুল হায়ছাম, কবি ওমর খৈয়াম, মোহাম্মদ ইবন রুশদ, জাবির ইবন আফলাহ, নাসির উদ্দীন আল-

---

৩০. মুহাম্মদ শফীক গিরবাল, *আল-মাওসূ'আতুল 'আরাবিয়্যাহ আল-মুইয়াসসারা*, বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি., খণ্ড ১, পৃ. ৬৬৩; মুস্তফা ইবন আব্দিলাহ, *কাশফুজজুনূন 'আন-আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন*, বৈরূতঃ দারুল 'উলূমিল হাদীসা, তা. বি., খণ্ড ২, পৃ . ৬৬৩; আহমদ ইবন মুস্তফা, *মিফতাহুস সাদাত ওয়া মিসবাহুস সিয়াদাহ ফী মাওদূ'আতিল 'উলূম*, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা ১ম সং, ১৪০৫ হিঃ / ১৯৮৫ খ্রি., খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৮; *তারীখু ইবন খালদূন*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৮৩।

তূসী, সাকেরী, মহীউদ্দীন আল-মাগরিবী, উলূগবেগ এবং গিয়াস উদ্দীন আল-কাশী প্রমুখ।[৩১] পঞ্চদশ শতাব্দীর পর মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় মন্থরতা দেখা দিলেও বিংশ শতাব্দীতে তা আবার নতুন করে জেগে ওঠে। এ সময় 'ফলিত গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যানের বিভিন্ন শাখায় এই উপমহাদেশের প্রফেসর আব্দুস ছালাম, ডঃ রাজিউদ্দীন ছিদ্দিকী, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ আতিকুল্লাহ, ডঃ আব্দুল কাদির, মিসরের ড. রাশেদ খলিফা, ড. হামদী তাহা, মরক্কোর ড. আলী কিস্তানীর নাম বিশ্ববিদিত'।[৩২]

৩১. *মাদ্রাসা গণিত পাটী গণিত*, পৃ. ১১৯- ১৩৬

৩২. *মাদ্রাসা গণিত পাটী গণিত*, পৃ. ১৩৭

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি.

রমযান : পরিচিতি, প্রবর্তন ও উদ্‌যাপন

ড. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা*

[**সারসংক্ষেপ:**রমযানমাস আল্লাহ্ তা'য়ালার অপূর্ব রহমতের বারিধারায় সমৃদ্ধ একটি মহিমান্বিত মাস। এই মাস মু'মিন ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। রমযান মাসে ইবাদতের অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান থাকে। রহমত ও জান্নাতের দুয়ার খোলা থাকে, জাহান্নাম বন্ধ থাকে আর শয়তান থাকে বন্দি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত কল্যাণের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ঘোষণা আসতে থাকে। আল্লাহ্তা'য়ালাতাঁর বান্দার ইবাদতের সাওয়াব বাড়িয়ে দেন। ক্ষমা ও অনুগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি করেন। প্রতিদিন ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। এসবের প্রভাবে মানুষের মধ্যে উত্তম কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মায় এবংআল্লাহ্ভীতি সৃষ্টি হয়। এমন পরিবেশে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে যথার্থভাবে রমযান মাস উদ্‌যাপন করাই মু'মিন বান্দার একান্ত কাম্য। কাজেই রমযানকে গতানুগতিক ধারায় নয়,বরং আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যেই অতিবাহিত করতে হবে। এমাসে রোযা ও তারাবীহ নামায আদায়, কুরআন তেলাওয়াত ও সংযত জীবন যাপন করে মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ্তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করে। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় এবং সারা বছরের আধ্যাত্মিক পাথেয় অর্জন করে। এরপর রমযানের আনুষ্ঠানিক প্রতিদান দিবস ঈদের দিন সবাই একসাথে ঈদের নামায আদায়ের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি তৈরি হয়। ভেদাভেদ ভুলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভালোবাসার সমাজ নির্মিত হয়। এসবই মূলত রমযানের দাবি।]

০১. রমযানমাস

হিজরী বারো মাসের নবম মাস হলো রমযান। **প্রথমত,** মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্তা'য়ালার প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন মজীদ রমযান মাসে নাযিল হয়েছে। কুরআন নাযিলের সূত্র ধরেই রমযান মাস শ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে মহিমান্বিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ .

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে" (সূরা বাকারা, ২: ১৮৫)।

দ্বিতীয়ত :রোযার মত আমলের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা এই মাসকেই নির্ধারণ করেছেন। এ মাসের ফযীলত এর চেয়ে আর বেশি কী হতে পারে? মহান আল্লাহ্ বলেন,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .

"সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোযা পালন করে"। (সূরা বাকারা, ২: ১৮৫)।

---

*সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তৃতীয়ত,হাজার মাস (৮৩ বছর ৪ মাস) অপেক্ষাও অধিক উত্তম মহিমান্বিত কদরের রাত এই রমযান মাসেই। আল্লাহ্ বলেন-

وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"আর আপনি কি জানেন কদরের রাত কি? কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ রাতে ফেরেশতা ও রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক কল্যাণময় বস্তু নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে। (এ রাতের) শান্তিই শান্তি যা ফজর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে"।(সূরা কদর, ৯৭: ২- ৫)।

এছাড়া রমযান মাসে আল্লাহ্র রহমত ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিশপ্ত ও অবাধ্য শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়। সারা মাস জুড়ে দু'আ কবুল হয়। রোযাদার আল্লাহ্র সমীপে যে দু'আ করে আল্লাহ্ তা কবুল করেন। রোযাদারের দু'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রমযান মাসে আল্লাহ্তা'য়ালা তাঁর ক্ষমা ও দয়াকে সুপ্রসারিত করেন। ফলে অসংখ্য লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।সব সময়ই আল্লাহ্তা'য়ালা বান্দার আমলের সাওয়াব কমপক্ষে দশগুণ বাড়িয়ে দেন। রমযানে এ বৃদ্ধির মাত্রা আরো সম্প্রসারিত হয়।

০২. রোযা পরিচিতি

রোযা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। আল্লাহ্তা'য়ালাঅন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি থেকে রোযাকে ভিন্নতর মর্যাদা দিয়েছেন। রোযার পুরস্কার ও প্রতিদান উল্লেখ করার মত বিষয়। রোযার সমমর্যাদার আর কোনো আমল নেই। রোযা কেবলই আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ্তা'য়ালা কোনো মাধ্যম ছাড়া নিজেই রোযার প্রতিদান প্রদান করবেন। রোযাদারের মুখের ঘ্রাণও আল্লাহ্র কাছে মিশকে আম্বরের ঘ্রাণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ও প্রিয়। রোযা পাপ থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ। রোযা রোযাদারের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। রোযাদারের জন্য জান্নাতের একটি বিশেষ দরজা থাকবে যার নাম 'রাইয়্যান'। আরবী সাওম ও সিয়াম শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে রোযা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রোযা ফারসী থেকে বাংলায় এসেছে। পবিত্র কুরআন মজীদে সাওম শব্দটি এক জায়গায় (সূরা মারইয়াম, ১৯: ২৬) আর সিয়াম শব্দটি নয় জায়গায়[১] ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে শব্দ দুটির প্রচুর ব্যবহার রয়েছে।

০৩. ইসলাম পূর্ব যুগে রোযা

আল্লাহ্তা'য়ালাবলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

---

১ আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২: ১৮৩, ১৮৭ (২বার), ১৯৬(২বার); সূরা নিসা, ৪: ৯২; সূরা মায়েদা, ৫: ৮৯, ৯৫; সূরা মুজাদালা, ৫৮: ৪।

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ওপর রোযার বিধান দেয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো" (সূরা বাকারা, ২: ১৮৩)।

ইসলামে রোযা ফরয হওয়া সংক্রান্ত এআয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম পূর্ব যুগসমূহেওরোযার বিধান ছিল। হযরত আলী (রা) ও হাসান বসরী(র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আ)- এর যুগ থেকে শুরু করে সব উম্মতের উপরই রোযা ফরয ছিল।[২]

মূসা (আ)-এর রোযা প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন,

وَ وٰعَدْنَامُوْسٰى ثَلٰثِيْنَلَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّمِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَلَيْلَةً .

"স্মরণ করো, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত নির্ধারিত করি এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে পূর্ণ হয়"। (সূরা আরাফ, ৭: ১৪২)।

মূসা (আ) তাওরাত প্রাপ্তির জন্য প্রথমে ৩০ দিন, পরে আরো ১০ দিন বাড়িয়ে মোট ৪০ দিন রোযাসহ ই'তিকাফ অবস্থায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

ইহুদীরা আশুরার রোযা পালন করতো। যেমনহাদীস শরীফে এসেছে:

عن بن عباس انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة واليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنتم أولى بموسى فصوموه .

"হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করে দেখলেন যে, ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করে। তিনি তাদেরকে এদিনের রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললো, এদিনে মূসা (আ) ফিরাউনের উপর বিজয়লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা (মুসলমানরা) মূসা(আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। কাজেই তোমরাও রোযা পালন করো"।[৩]

আর হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা ছিল এক দিন পর একদিন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ النَّفْسُ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ بِي قَالَ مِسْعَرٌ يَعْنِي قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى

২ মাওলানা রফিক আহমদ, *ইযাহুল মিশকাত*, ২য় খণ্ড, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যাহ, চট্টগ্রাম ১৪২৬ হি., পৃ. ৬৫৬।

৩ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আদ-দারিমী, *সুনান আদ-দারিমী*, ২য় খণ্ড, দারু কিতাবিল আরাবী, বৈরুত ১৪০৭ হি., অধ্যায়: রোযা,অনুচ্ছেদ: আশুরার রোযা, পৃ. ৩৬, হাদীস নং ১৭৫৯।

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নলআস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)আমাকে বললেন, তুমি কি সব সময় রোযা রাখো আর রাতভর নামায পড়ো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এরূপ করলে তোমার চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। যে বছরজুড়ে রোযা রাখলো সে যেন রোযাই রাখলো না। আর তুমি প্রতি মাসে তিন দিন করে রোযা রাখো তাই বছরজুড়ে রোযা রাখা বা বছর জুড়ে রোযা রাখার মত। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর রোযা রাখো। তিনি একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন রোযা ছেড়ে দিতেন। তিনি শত্রুর সম্মুখীন হলে পালায়ন করতেন না"।[৪]

০৪. ইসলামে রোযা ও রমযানেরপ্রবর্তন

ইসলাম পূর্ব যুগে রোযার বিধান থাকলেও সেসব শর্ত, প্রকৃতি ও ধারাবাহিকতায় ইসলামে রোযা ফরয হয়নি। বরং ইসলামে রোযা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণের আধার। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতে সমৃদ্ধ। স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভরপুর মাসব্যাপী এই রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয করা হয়। রাসূলুল্লাহ(সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার দ্বিতীয় বছরে শা'বান মাসের শেষ দশকে রমযানের রোযা আদায়ের নির্দেশনা আসে।[৫]

মহান আল্লাহ্তা'য়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْتَعْلَمُوْنَ .شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য রোযার বিধান দেয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। রোযা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পুরো করে নিতে হবে। তা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্য়া- একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ কাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর রোযা পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা

---

৪ ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, দারু ইব্ন কাসির, বৈরুত ১৪০৭ হি., ১৯৮৭ খ্রি., অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: দাউদ (আ) এর রোযা, পৃ. ৬৯৮, হাদীস নং ১৮৭৮।

৫ মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধালবী, *সিরাতুল মুস্তফা*, ১ম খণ্ড, দারুল কিতাব, দেওবন্দ তা. বি., পৃ. ৪৭১।

জানতে। রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোযা পালন করে। আর কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পুরো করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না। এজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।" (সূরা বাকারা, ২: ১৮৩- ১৮৫)।

অবশ্য রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে আশুরার রোযা (১০ মুহাররম) এবং আইয়ামে বিয তথা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা ফরয ছিল। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর সেসব রোযার বিধান নফলে পরিণত হয়েছে।রমযানের প্রবর্তন প্রসঙ্গ একটি হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ - وَقَالَ فِى الصَّوْمِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (طَعَامُ مِسْكِينٍ) فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَهَذَا حَوْلٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) إِلَى (أَيَّامٍ أُخَرَ) فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِىَ وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لاَ يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

হযরত মুয়ায ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায তিন ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে এবং রোযাও তিন ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে। রোযার তিন ধাপের তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রথম ধাপ: রাসূলুল্লাহ্(সা) প্রতি মাসে তিন দিন (আইয়ামে বিয তথা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা) এবং আশুরার রোযা (১০ মুহাররম) পালন করতেন।

দ্বিতীয় ধাপ: এরপর নাযিল হয়- "হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য রোযার বিধান দেয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল....একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করা" পর্যন্ত। তখন যে চায় রোযা রাখে আর যে চায় রোযা না রেখে এর পরিবর্তে ফিদ্‌য়া- প্রতিদিন একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করে। এভাবে এক বছর যায়।

তৃতীয় ধাপ: এরপর নাযিল হয়- "রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে কুরআন নাযিল হয়েছে.... অন্য সময় এই সংখ্যা পুরো করবে" পর্যন্ত। তারপর থেকে রমযান মাস উপস্থিত হলে রোযার অবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

আর মুসাফিরদের জন্য কাযা আদায় এবং রোযা আদায়ের সামর্থ্য নেই এমন বৃদ্ধদের জন্য ফিদ্‌য়া প্রদানের সুযোগ বহাল থাকে।[৬]

০৫. সাহরী

সাহরী হলো ভোরের খাবার বা রাতের শেষভাগে খাওয়া হয় এমন খাবার। মহান আল্লাহ্‌তা'য়ালা রোযার উদ্দেশে ভোর রাতেসাহরী খাওয়ার বিধান দিয়েছেন। সাহরীগ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ(সা) উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এটিকে বরকতময় বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাহরী খাওয়া সুন্নত। এটি মুসলিমদের বৈশিষ্ট্যও বটে। সাহরী খাওয়ার মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর সুন্নাতের ওপর আমল করা হয়, রোযা রাখা সহজ হয় এবং রোযার ক্ষতি হওয়ার আশংকা কমে যায়। আবার কর্মশক্তিও অটুট থাকে। শুধু পানি পান করলেও সাহরীর সওয়াব লাভ করা যাবে।

সাহরীর সময়:মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, রাতের অর্ধাংশের পর থেকেই সাহরীর সময় শুরু হয় এবং ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।[৭]সাহরীর সময় শুরু হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও এর সমাপ্তির ব্যাপারে সবাই একমত। তা হলো সুবহে সাদিক তথা ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া মাত্রই সাহরীর সময় শেষ হয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ثُمَّاَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ.

"আর তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ রাতের কালো রেখা থেকে ঊষার সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো"। (সূরা বাকারা, ২: ১৮৭)।

আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়াকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে[৮] রোযার শুরু এবং পানাহার নিষিদ্ধ হওয়ার সঠিক সময় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সুবহে সাদিক তথা ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়া মাত্রই পানাহার বন্ধ করে রোযা শুরু করতে হবে। সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর পানাহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, এতে সন্দেহর অবকাশ নেই। আধুনিক যুগে রোযার সময়সূচী সম্বলিত ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে আমরা সুবহে সাদিক

---

৬ ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, ১ম, দারুল কিতাব, বৈরুত তা. বি., অধ্যায়: নামায, অনুচ্ছেদ: আযান যেভাবে, পৃ.১৯৭, হাদীস নং ৫০৭।

৭ মোল্লা আলী কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪২২ হি., পৃ. ২৯০।

৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান, *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান*, ৮ম খণ্ড, আল-মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪১৪ হি., ১৯৯৩ খ্রি., অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: সাহরী, পৃ. ২৪২, হাদীস নং ৩৪৬২।

শুরু হওয়ার সময় বাসাহরীর শেষ সময় খুব সহজেই জানতে পারি। কেউ ঘুম থেকে দেরিতে উঠে যদি দেখে যে, সাহরীর সময় শেষ হয়ে গিয়েছে তাকে সাহরী না খেয়েই রোযা পালন করতে হবে।

সাহরীর ফযীলতঃ সাহরীর ফযীলত অনেক। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে"।[৯]সহীহ ইব্‌ন হিব্বানের এক বর্ণনায় সাহরীকে মুবারক খাবার বলা হয়েছে।[১০]

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

"হযরত আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমাদের ও কিতাবধারীদের (ইহুদী-খ্রিস্টান) রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া"।[১১]

عن بن عمر قال قال رسول الله ﷺ إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.

"হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতারা সাহরী গ্রহণকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণের প্রার্থনা করেন"।[১২] হাদীসটি সহীহ।

সাহরীতে যা খাওয়া যায়ঃ সাহরী এক বরকতময় খাবার। বরকতময় খাবার হওয়ার অর্থ এই নয় যে, খুব বেশি করে সাহরী খেতে হবে। এক ঢোক পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নত আদায় হয়।[১৩] খেজুর দিয়েও সাহরী খাওয়া যায়। নবী (সা) এটিকে মুমিনের সাহরীর উত্তম খাবার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ .

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী(সা) বলেছেন, মুমিনের উত্তম সাহরী হলো খেজুর"। হাদীসটিসহীহ।[১৪] এছাড়া হালাল যে কোন খাদ্য দ্রব্যইসাহরী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

---

৯ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ সাহরীর বরকত, পৃ.৬৭৮, হাদীস নং ১৮২৩; অধ্যায়ঃ জুমু'য়া, অনুচ্ছেদঃ জুমু'য়ার আবশ্যকতা, পৃ.২৯৯, হাদীস নং ৮৩৬; ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, দারুল জিল, বৈরুত তা.বি., অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ সাহরীর ফযীলত, পৃ.১৩০, হাদীস নং ২৬০৩।

১০ *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান*, ৮ম খণ্ড, অধ্যায়ঃ রোযা,অনুচ্ছেদঃ সাহরী, পৃ. ২৪৩, হাদীস নং ৩৪৬৪।

১১ *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়ঃ রোযা,অনুচ্ছেদঃ সাহরীর ফযীলত, পৃ. ১৩০, হাদীস নং ২৬০৪।

১২ *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান*, ৮ম খণ্ড, অধ্যায়ঃ রোযা,অনুচ্ছেদঃ সাহরী, পৃ. ২৪৫, হাদীস নং ৩৪৬৭।

১৩ *সহীহ ইব্‌ন হিব্বান*, ৮ম খণ্ড, অধ্যায়ঃ রোযা,অনুচ্ছেদঃ সাহরী, পৃ. ২৫৩, হাদীস নং ৩৪৭৬।

১৪ *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়ঃ রোযা,অনুচ্ছেদঃ সাহরীকে গাদা বলা, পৃ. ২৭৫, হাদীস নং ২৩৪৭।

শেষ সময়ে সাহরী খাওয়াঃ সুন্নত হলো, বিলম্বে সাহরীর শেষ সময়ের কাছাকাছি সাহরী খাওয়া। রাসূলুল্লাহ(সা) সর্বদা শেষ সময়ে সাহরী খেতেন। তাঁরসাহরী ও ফজর নামাযের মধ্যে ৫০ আয়াত পাঠ করার মতো সময়ের ব্যবধান থাকতো।

عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله عنه قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً.

"হযরত যায়দ ইব্ন সাবেত (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাহরী খেয়েছি। অতঃপর (ফজরের) নামায পড়তে উঠে গিয়েছি। আমি বললাম, সাহরী ও নামাযের মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, ৫০ আয়াত তেলাওয়াত পরিমাণ"।[১৫]

عَنْ عَمْرٍو ، يَعْنِي ابْنَ حُرَيْثٍ ، قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا ، وَأَبْطَأَهُمْ سُحُورًا.

"আমর ইব্ন হুরাইস(রা) বলেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীগণ (সময় হলে) তাড়াতাড়ি ইফতার করতেন আর বিলম্বে শেষ সময়ে সাহরী খেতেন"।[১৬]

ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে সাহরী খেলে রোযা রাখতে অধিকতর সহজ হয় এবং ফজর নামায আদায় করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে কষ্ট করতে হয় না। সতর্কতা অবলম্বন করে ফজরের অনেক আগে সাহরী শেষ করা সুন্নত নয়।

সাহরী ও ফজরের আযানঃ সাহরীর সময় শেষ হওয়া মাত্রই পানাহার শেষ করতে হবে। আযান দেওয়া না দেওয়া কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ এটি কুরআনের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যেমনটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ(সা)-এর সময় তাহাজ্জুদ ও সাহরীর সময় একবার আযান দেওয়া হতো। তা ছিল মূলত ঘুম থেকে জাগ্রত করার জন্য। এরপর ফজরের সময় হওয়ামাত্র ফজরের আযান দেওয়া হতো। বিলাল (রা) তাহাজ্জুদ ও সাহরীর সময় আযান দিতেন আর অন্ধ সাহাবীআবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা) ফজরের আযান দিতেন। তাইরাসূলুল্লাহ(সা)আব্দুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা)-এর আযান শোনা পর্যন্ত পানাহার করতে বলতেন।

---

১৫ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড,অধ্যায়ঃ রোযা,অনুচ্ছেদঃ সাহরী ও নামাযের মধ্যে কতটুকু সময়, পৃ.৬৭৮, হাদীস নং ১৮২১; *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়ঃ রোযা,অনুচ্ছেদঃ সাহরীর ফযীলত, পৃ.১৩১, হাদীস নং ২৬০৬।

১৬ ইব্ন আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, ৩য় খণ্ড, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচিঃ ২০০৮ খ্রি., অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ দেরিতে সাহরী, পৃ. ১০, হাদীস নং ৯০২৫; আবু বাক্র আব্দুর রায্যাক, *মুসান্নাফু আব্দির রায্যাক*, ৪র্থ খণ্ড, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত ১৪০৩ হি., অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ তাড়াতাড়ি ইফতার,পৃ. ২২৬, হাদীস নং ৭৫৯১।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ না ইব্ন উম্মে মাকতুমের আযান শোনতে পাও"।[১৭]

আমাদের দেশে কেবল ফজরের নামাযের জন্যই আযান দেওয়া হয়। কাজেই মুয়াজ্জিনদের উচিত, রমযান মাসে ফজরের সময় হওয়া মাত্রই ফজরের আযান দেওয়া। আর মুসল্লিদের উচিত, সতর্কতামূলক ফজরের সময় শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট আগেই সাহরী শেষ করা। এজন্য সাধারণত রোযার সময়সূচীর ক্যালেন্ডারে সাহরীর শেষ সময় ও ফজরের আযানের সময়ের মধ্যে পাঁচ মিনিট ব্যবধান রাখা হয়।

০৬. ইফতার

ইফতার আরবী শব্দ। এটির মূল অর্থ- ফাটল, চিড়, ভাঙ্গন, সকালের খাবার, নাশতা ইত্যাদি।[১৮] রোযাদার ব্যক্তি রোযা ভঙ্গকারী যে কোন হালাল খাদ্যদ্রব্য পান বা আহার করে রোযা ভঙ্গ বা সমাপ্ত করে।

ইফতরের সময়:সূর্যগোলক সম্পূর্ণরূপে অস্ত যাওয়া মাত্রই ইফতরের সময় শুরু হয়। আল্লাহ্‌তা'য়ালা বলেন,

ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ.

"অতঃপর তোমরা রাত আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো"। (সূরা বাকারা, ২: ১৮৭) । আর সূর্যাস্তের মাধ্যমেই রাতের আগমন ঘটে।

سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

"হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন এদিক থেকে রাতের আগমন ঘটে, ঐদিক থেকে দিন পেছনে চলে যায় আর সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়"।[১৯]

---

১৭ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড,অধ্যায়: সাক্ষী,অনুচ্ছেদ: অন্ধের সাক্ষী, পৃ. ৯৪০, হাদীস নং ২৫১৩; *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা,অনুচ্ছেদ: সুবহি সাদিক থেকে রোযা শুরু, পৃ.১২৮, হাদীস নং ২৫৮৯।

১৮ আব্দুল হাফিয বালয়াভী, *মিসবাহুল লুগাত*, অনুবাদ ও সম্পাদনা: হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী, থানভী লাইব্রেরী, ঢাকা ১৪২৪ হি., পৃ. ৪৯২; জামালুদ্দিন ইব্ন মানযুর, *লিসানুল 'আরব*, ১৭তম খণ্ড, দারুস সাদির, বৈরূত ১৪১৪ হি.,পৃ. ১০৬।

সূর্যাস্তের মাধ্যমেই দিনের প্রস্থান ও রাতের আগমন ঘটে। কাজেই সূর্যাস্তই ইফতারের সময়।

সময় হওয়ামাত্র ইফতার করা: সূর্যাস্তের সাথে সাথে বিলম্ব না করে ইফতার করা সুন্নত।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

"হযরত সাহ্ল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষ যতদিন পর্যন্ত সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করবে ততদিন কল্যাণের সাথে থাকবে"।[২০]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, যতদিন মানুষ সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করবে ততদিন দীন বিজয়ী থাকবে। কারণ ইহুদী ও খ্রিস্টানরা দেরি করে ইফতার করে"।[২১]

যেসব খাবার দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব:খেজুর দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব। নবী (সা) সাধারণত খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। খেজুর না পেলে শুধু পানি দিয়ে ইফতার করেছেন।

عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر زاد ابن عيينه فإنه بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور.

"হযরত সালমান ইবন আমের আদ-দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)বলেন, তোমাদের যে কেউইফতার করলে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। কেননা এতে বরকত (সমৃদ্ধি) রয়েছে। খেজুর যার জন্য সহজলভ্য নয় সে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা তা পবিত্র"।[২২]

---

১৯ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড,অধ্যায়: রোযা,অনুচ্ছেদ: ইফতারের সময়, পৃ.৬৯১, হাদীস নং ১৮৫৩; *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা,অনুচ্ছেদ: রোযা শেষ হওয়ার সময়, পৃ. ১৩২, হাদীস নং ২৬১২।

২০ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড,অধ্যায়: রোযা,অনুচ্ছেদ: তাড়াতাড়ি ইফতার, পৃ.৬৯২, হাদীস নং ১৮৫৬; *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা,অনুচ্ছেদ: তাড়াতাড়ি ইফতার, পৃ. ১৩১, হাদীস নং ২৬০৮।

২১ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামি' আত-তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, দারু ইহইয়াই তুরাসিল আরবী, বৈরুত তা. বি., অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: যা দিয়ে ইফতার, পৃ. ৬৯৬, হাদীস নং ২৬৭৬; *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: যা দিয়ে ইফতার, পৃ. ২২৮, হাদীস নং ২৩৫৮।

ইফতারের সময় মোনাজাত করা: রোযাদারের দু'আ কবুল হয়। বিশেষ করে ইফতারের সময়। এসময়ের দু'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। কারণ ইফতারের সময়টা হলো রোযার পূর্ণতার পরম মুহূর্ত। এ সময় আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাঁর রোযাদার বান্দার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং অসংখ্য লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।

عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. في الزوائد إسناده صحيح .

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আপ্রত্যাখ্যাত হয় না। আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) ইফতারের সময় এই দু'আ পড়তেন: হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে সব কিছুতে পরিব্যপ্ত আপনার রহমতের ওসিলায় কামনা করছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন"।[২৩]হযরতআব্দুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) ইফতারের সময় পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে একত্রে দু'আ করতেন।[২৪]

ইফতারের দু'আ:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

হযরত মুয়ায ইবন যুহরা (রা) বলেন, নবী (সা) ইফতার করার সময় এ দু'আটি পাঠ করতেন:

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশে রোযা রেখেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করছি"।[২৫]

০৭. তারাবীহ নামায

২২ *জামি' আত-তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: যা দিয়ে ইফতার, পৃ. ৭৮, হাদীস নং ৬৯৫; *সুনানু আবী দাউদ*,২য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: যা দিয়ে ইফতার, পৃ. ২২৮, হাদীস নং ২৩৫৮।

২৩ *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: রোযাদারের দু'য়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, পৃ. ৫৫৭, হাদীস নং ১৭৫৩।

২৪ আবু বকর আহমাদ আল-বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, ৩য় খণ্ড, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত ১৪১০ হি., অধ্যায়: ইফতারের সময় বলা দু'য়া, পৃ. ৪০৮, হাদীস নং ৩৯০৭।

২৫ *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা,অনুচ্ছেদ: ইফতারের সময়বলা, পৃ. ২৭৮, হাদীস নং ২৩৬০।

রমযান মাসের ইবাদতসমূহে অন্যতম হলোতারাবীহ নামায যাকে হাদীসে 'কিয়ামুল লাইল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিয়ামুল লাইল হলো রাত জেগে ইবাদত করা। কাজেই তারাবীহ নামাযের দাবি হলো, রাত জেগে দীর্ঘক্ষণ ইবাদত করা। ধীরে সুস্থে খতমে কুরআনসহ ২০ রাকাত তারাবীহ নামায আদায় করলে কিয়ামুল লাইল যথার্থ হয়। তাড়াহুড়ো করে নামায আদায়, ২০ রাকাতের চেয়ে কম নামায বা খতমে কুরআন ছাড়া নামায পড়ে অন্য দিনের মত সাধারণ সময়ে ঘুমিয়ে পড়লে কিয়ামুল লাইল বা রাত জেগে ইবাদত যথার্থ হয় না। তারাবীহ নামায আদায়ের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(সা)-এরহাদিসসমূহ স্মরণযোগ্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ (সা)বলেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ নামায ও অন্যান্য নফল ইবাদত) আদায় করে আল্লাহ্ তার আগেকার সব পাপ ক্ষমা করে দেন"।[২৬]

حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَ أَبِيكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"হযরত আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)বলেছেন, আল্লাহ্‌তা'য়ালা তোমাদের উপর রমযান মাসেররোযা ফরয করেছেন এবং আমি তোমাদের জন্য 'কিয়ামে রমযান'(তারাবীহ নামায ও অন্যান্য নফল ইবাদত) সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে এবং রাতে (নামাযে) দণ্ডায়মান হবেসে তার যাবতীয় পাপ থেকে নবজাত শিশুর মতো পবিত্র হয়ে যাবে"।[২৭]

০৮. তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা

তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা ২০ (বিশ)। ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করাই সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। ইসলামের সূচনা থেকেই তারাবীহ নামায ২০ রাকাত আদায় করা হচ্ছে। সাহাবায়ে

২৬ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়ঃ তারাবীহ নামায, অনুচ্ছেদঃ তারাবীহ নামাযের মর্যাদা, পৃ. ৭০৭, হাদীস নং ১৯০৫; *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ তারাবীহ নামাযে উৎসাহ দান, পৃ. ১৭৬, হাদীস নং ১৮১৫।

২৭ আহমদ ইব্ন শুয়াইব আন-নাসাঈ, *সুনানু আন-নাসাঈ*, ৪র্থ খণ্ড, দারুল মারিফাহ, বৈরুত ১৪২০ হি., অধ্যায়ঃ রোযা, পৃ. ৪৭৮, হাদীস নং ২২০৯।

কিরাম (রা), তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের সোনালী যুগ থেকে পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ সমস্ত মুসলিম বিশ্বে কোথাও এর কম পড়ার ইতিহাস নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে তারাবীহ নামাযঃ

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَٰلِكَ.

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রমাযান মাসের এক গভীর রাতে বের হন। এরপর মসজিদে নামায আদায় করেন। কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। সকালে তাঁরা এব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করায় দ্বিতীয় রাতে আরো অধিক সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম সমাবেত হন। তিনি (নবী সা) নামায আদায় করেন এবং সাহাবায়ে কেরামও তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। সকালে তাঁরা এব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করায় তৃতীয় রাতে মুসল্লির সংখ্যা আরো অধিক বেড়ে যায়। এরপর রাসূল (সা) বের হন এবং নামায আদায় করেন। তারাও তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লিদের সংকুলান হলো না। কিন্তু নবী (সা) আর বের না হয়ে ফজরের নামায পড়তে বের হলেন। নামায শেষে লোকদের দিকে ফিরে বসেন। প্রথমে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন, এরপর বলেন, তোমাদের অবস্থা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমি এই (তারাবীহ) নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি (বিধায় আমি বের হয়নি)। তখন তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়তে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন। বিষয়টি এভাবে থেকে যায়"।[২৮]

আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনদিন জামাতের সাথে তারাবীহ আদায় করেছেন আর বাকি দিন একাকী পড়েছেন। এ হাদীস থেকে তাঁর তারাবীহ নামায আদায়ের রাকাত সংখ্যা জানা যায় না বিধায় বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা নির্ণয় করতে হবে। কারণ সাহাবায়ে কেরাম হলেন, রাসূল (সা)-এর কথা ও কর্ম প্রকাশের মূল মুখপাত্র। নামাযের রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ গবেষণা বা যুক্তির কোন বিষয় নয়। কাজেই এবিষয়ে

---

২৮ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড,অধ্যায়: তারাবীহ,অনুচ্ছেদ: তারাবীহর ফযীলত, পৃ.৭০৮, হাদীস নং ১৯০৮; শব্দের একটু পরিবর্তনসহ *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: নামায,অনুচ্ছেদ: তারাবীহর প্রতি উৎসাহ প্রদান, পৃ. ১৭৭, হাদীস নং ১৮১২।

সাহাবায়ে কেরামের আমল ও ফতওয়াই রাসূল (সা)-এর আমল হিসেবে পরিগণিত হবে। সাহাবায়ে কেরামের আমল বিশ রাকাত হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সহীহ সনদে পাওয়া যাওয়ায় বলা যায় যে, রাসূল (সা) বিশ রাকাত তারাবীহ পড়েছেন। তিন দিন জামাতে আর বাকি দিন একাকী পড়েছেন। বাকি দিন তিনি কেন একাকী পড়েছেন, তার কারণও প্রকাশ করে দিয়েছেন। উম্মতের কল্যাণে ফরয হওয়ার আশংকায় তিনি এমনটি করেছেন। তিনি চেয়েছেন তারাবীহ নামায সুন্নত থাকুক। সবাই নিজ আগ্রহে রমাযান মাসে অতিরিক্ত কল্যাণ অর্জন করুক। রাসূল (সা)-এর সেই কামনা ও আগ্রহ থেকেই সাহাবায়ে কেরাম গুরুত্বের সাথে ২০ রাকাত তারাবীহ আদায় করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে তারাবীহ নামাযঃ প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে এবং উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের মতো বিশ রাকাত তারাবীহ একাকী ও জামাত উভয় পদ্ধতিতে আদায় করা হয়। এরপর হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ থেকে চলে আসা ২০ রাকাত তারাবীহকে গুরুত্বের সাথে আদায় করেন এবং সবাইকে জামাতবদ্ধভাবে এক ইমামের পেছনে আদায় করার ব্যবস্থা করেন। সব সাহাবা বিষয়টিকে একবাক্যে গ্রহণ করেন। তখন থেকে সর্বত্রই মুসলমানরা ২০ রাকাত তারাবীহ নামায পড়ছেন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرٰى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِي يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِيْ يَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

"আব্দুর রহমান আল-কারী (র) বলেন, আমি রমাযান মাসে হযরত উমর (রা)-এর সাথে মসজিদে গেলাম। দেখলাম, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে(একাধিক ইমামের সাথে) তারাবীহ নামায পড়ছেন। কেউ একা পড়ছেন। কেউ ক'জন নিয়ে পড়ছেন। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, এদের সকলকে একজন মাত্র ইমামের পেছনে জামাতবদ্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে অতি উত্তম হয়। এরপর তিনি তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর পেছনে জামাতবদ্ধ করে দিলেন। আব্দুর রহমান আল-কারী (র) বলেন, আরেক রাতে আমরা বের হলাম। লোকেরা এক ইমামের পেছনে তারাবীহ পড়ছিল। হযরত উমর (রা) বললেন, এই পদ্ধতি কতই

না উত্তম। তবে রাতের যে অংশে তোমরা নামাযে দাঁড়াও তা থেকে ওই অংশ উত্তম যে অংশে তোমরা ঘুমিয়ে থাকো। (অর্থাৎ রাতের শেষাংশ)। তখন প্রথম রাতেই নামায পড়া হতো"।[২৯]

উল্লেখ্য যে, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আকাঙ্ক্ষাকেই বাস্তবায়ন করেছেন, যা তিনি ফরয হয়ে যাবে আশংকায় সবাইকে নিয়ে প্রতিদিন জামাতে আদায় করেননি।

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

"হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান (র) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম হযরত উমরইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩রাকাত বিতর মিলে ২৩ রাকাত পড়তেন"।[৩০]

عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة .

"হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেন, তারা (সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যুগে ২০ রাকাত পড়তেন "।[৩১] সনদ সহীহ।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَقَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ، وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ .

"হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা উমর (রা)-এর যুগে ফজরের কাছাকাছি সময়ে তারাবীহর নামায থেকে ফিরতাম। আর উমর (রা)-এর যুগে তারাবীহ হতো (বিতরসহ) ২৩ রাকাত"।[৩২] সনদ নির্ভরযোগ্য।

এধরনের একাধিক বর্ণনা এবং এর সমর্থনে বিশুদ্ধ হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত আমলধারা বিদ্যমান থাকার কারণে বর্ণনাগুলো সহীহ বা সর্বাপেক্ষা সহীহ হাদীসের পর্যায়ে গৃহীত। এতে দ্বিধা-দ্বন্দের কোন অবকাশ নেই।

---

২৯ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড,অধ্যায়: তারাবীহ,অনুচ্ছেদ: তারাবীহর ফযীলত, পৃ.৭০৭, হাদীস নং ১৯০৬; মালিক ইবনে আনাস, *আল-মুয়াত্তা*, ২য় খণ্ড, মুয়াসসাসাতু যায়েদ ইব্‌ন সুলতান আলী নাহইয়ান, বৈরুত ১৪২৫ হি., অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: কিয়ামে রমাদান, পৃ. ১৫৮, হাদীস নং ৩৭৮।

৩০ মালিক ইব্‌ন আনাস, *আল-মুয়াত্তা*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: কিয়ামে রমাদান, পৃ. ১৫৯, হাদীস নং ৩৮০।

৩১ আবু বাক্‌র আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন আল-বায়হাকী, *সুনানআল-বায়হাকী আল-কুবরা*, ২য় খণ্ড, মাকতাবাতু দারুল বায, মক্কা ১৯৯৪ খ্রি., ১৪১৪ হি., অধ্যায়: নামায, অনুচ্ছেদ: তারাবীহর রাকাত সংখ্যা, পৃ.৪৯৬, হাদীস নং ৪৩৯৩।

৩২ *মুসান্নাফু আব্দির রায্‌যাক*, ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: কিয়ামু রমাযান,পৃ. ২৬১, হাদীস নং ৭৭৩৩।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর যুগেও তারাবীহর নামায ইশার জামাতের পর ২০ রাকাত জামাতবদ্ধভাবে পড়া হতো। হযরত উমর (রা)-এর সময় থেকে চলে আসা তারাবীহর বিধানে তিনি কোন আপত্তিও তোলেননি আবার তাঁর খিলাফতকালে নতুন কোন বিধানও চালু করেননি।[৩৩] ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর যুগেও তারাবীহর নামায ২০ রাকাত আদায় করা হতো। তিনি ইমামদেরকে ২০ রাকাত পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন।[৩৪]

মক্কা মুকাররমায় তারাবীহ নামায: রাসূলুল্লাহ (সা), সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং তাবেঈনের যুগ থেকে পবিত্র মক্কা শরীফে ২০ রাকাত তারাবীহর নিয়ম আজ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে চলে আসছে। কোনো যুগেই এর কম বা বেশি পড়ার কোন প্রমাণ নেই। এ ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী(র) বলেন:

وأكثر أهل العلم ما روي عن عمر و علي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عشرين ركعة وهو قول الثوري و ابن المبارك و الشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة .

"অধিকাংশ আলেম তারাবীহর রাকাত প্রসঙ্গে ২০ রাকাতের মতই পোষণ করেন যা হযরত ওমর (রা), হযরত আলী (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটিই সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, এভাবে আমি পবিত্র মক্কাবাসীকে ২০ রাকাত তারাবীহর নামায পড়তে পেয়েছি"।[৩৫]

এ ব্যাপারে বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম আতা বিন আবী রবাহ (র) বলেন,

عن عطاء قال أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر.

"আমি লোকদেরকে (সাহাবী ও তাবেঈদেরকে) পেয়েছি, তাঁরা বিতরসহ ২৩ রাকাত পড়তেন"।[৩৬]

বর্ণনাটি সহীহ। এতে একজন বর্ণনাকারীও দুর্বল নেই।

মদীনা মুনাওয়ারায় তারাবীহ নামায: প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত আব্দুল আযীয বিন রুফাই (র) বর্ণনা করেন-

---

৩৩ *সুনানআল-বায়হাকী আল-কুবরা*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: নামায, অনুচ্ছেদ: তারাবীহর রাকাত সংখ্যা, পৃ.৪৯৬, হাদীস নং ৪৩৯৩।

৩৪ *সুনানআল-বায়হাকী আল-কুবরা*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: নামায, অনুচ্ছেদ: তারাবীহর রাকাত সংখ্যা, পৃ.৪৯৬, হাদীস নং ৪৩৯৬।

৩৫ *জামি' আত-তিরমিযী*,৩য় খণ্ড,অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: কিয়ামুল লাইল, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং ৮০৬।

৩৬ *আল-মুসান্নাফ*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: রমযানে কত রাকাত পড়বে, পৃ. ১৬৩, হাদীস নং ৭৬৮৮।

عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث

"হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) রমাযান মাসে লোকদের নিয়ে মদীনাতে ২০ রাকাত তারাবীহ এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন"।[৩৭]

সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (সর্বসম্মত ঐকমত্য): ২০ রাকাত তারাবীহর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (সর্বসম্মত ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এব্যাপারে হযরত উমর (রা)-এর সময় থেকে খোলাফায়ে রাশিদীন এবং অন্যান্য সাহাবীদের কোনো ধরনের কোনো আপত্তি নেই। সবাই জামাতের সাথে ২০ রাকাত তারাবীহর আমল করেছেন।

এক. ইমাম আবু বকর আল-কাসানী (র) তার বাদাইয়ুস সানাই' গ্রন্থে বলেন,

وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلَّى بِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

"হযরত উমর (রা) রমাযান মাসে সাহাবায়ে কেরামকে উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর ইমামতিতে একত্র করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব তাদেরকে নিয়ে প্রতি রাতে বিশ রাকাত করে তারাবীহ পড়তেন এবং তাতে কেউ আপত্তি করেননি। সুতরাং এব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সম্পন্ন হয়েছে"।[৩৮]

দুই. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (র) লিখেছেন- ইবনে হাজার আসকালানী(র) বলেন,

لَكِنْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ التَّرَاوِيحَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.

"তারাবীহর নামায ২০ রাকাতের উপর সব সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে"।[৩৯]

তিন. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম ক্বাসতালানী (র) লিখেছেন,

وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع.

"হযরত উমর (রা)-এর যুগের অবস্থা ইজমা বা সর্বসম্মত ঐকমত্য পর্যায়ে গণ্য"।[৪০]

---

৩৭ *আল-মুসান্নাফ*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: রমযানে কত রাকাত পড়বে, পৃ. ১৬৩, হাদীস নং ৭৬৮৪।

৩৮ ইমাম আবু বকর আল-কাসানী, বাদাইয়ুস সানাই', ১ম খণ্ড, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪০৬ হি., অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: তারাবীহ নামাযের পরিমাণ, পৃ. ১৮৮।

৩৯ *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭৩।

চার. ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী (র) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুগনীতে লিখেন,

مَا فَعَلَهُ عُمَرُ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي عَصْرِهِ، أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ.

"হযরত উমর (রা) যা করেছেন এবং যে বিষয়ে সব সাহাবায় কেরাম তাঁদের যুগে ইজমা-ঐক্যমতে পৌঁছেছেন, তা অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য"।[৪১]

পাঁচ. ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (র) লিখেন,

فَإِنَّه□ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أبي بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. فَرَأَى كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ؛ لِأَنَّه □ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ.

"প্রমাণিত হয়েছে যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা) লোকদেরকে ২০ রাকাত তারাবীহ ও ৩ রাকাত বিতর পড়িয়েছেন। অসংখ্য আলেম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে,এটিই সুন্নত। কেননা উবাই ইবনে কা'ব (রা) মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে ২০ রাকাত পড়িয়েছেন। আর কোনো একজনও তাতে আপত্তি করেননি"।[৪২]

ইজমায়ে উম্মতের আলোকে তারাবীহ নামায: ২০ রাকাত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় থেকে যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। বিশেষ করে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তারাবীহর নামায জামাতবদ্ধভাবে পড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার কারণে পবিত্র মক্কা-মদীনাসহ আরব-আজম তথা সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমানদের কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তখন থেকে সর্বত্রই মুসলমানরা ২০ রাকাত তারাবীহ পড়তে থাকে। বরং এতে সব মুহাজির ও আনসার সাহাবী এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমা সংঘটিত হয়। যার বিপরীতে খোলাফায়ে রাশিদীনসহ অন্যান্য সাহাবীদের কোনো ধরনের কোনো আপত্তি কোন কিতাবে উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা)-এরপুণ্যময় যুগে এবং তারপর সাহাবায়ে কিরাম ২০ রাকাত তারাবীহ নামায পড়েছেন। এর কম কেউ পড়েছে বলে ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই। কাজেই তারাবীহর নামায ২০ রাকাত পড়া সব যুগের মীমাংসিত একটি বিষয়।

০৯. রোযাকে নিখুঁত করা

---

৪০ ইমাম কাসতাল্লানী, *ইরশাদুস সারি শরহে বুখারী*, ৩য় খণ্ড, আল-মাতবা'য়াতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যাহ, মিসর ১৪২২ হি., অধ্যায়: তারাবীহ, অনুচ্ছেদ: তারাবীহ নামাযের ফযিলত, পৃ. ১৩৩।

৪১ ইবনে কুদামা, *আল মুগনী*, ২য় খণ্ড, মাকতাবাতুর কাহিরা, মিসর ১৩৮৮ হি., অধ্যায়: তারাবীহ ২০ রাকাত, অনুচ্ছেদ: তারাবীহ নামাযের জামাত, পৃ. ১২৩।

৪২ ইবনে তাইমিয়্যাহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, ২৩ তম খণ্ড, মাজমাউল মালিক ফাহদ, মদীনা ১৪১৬ হি.,পৃ. ১১২-১১৩।

আল্লাহ্‌তা'য়ালা বান্দাদেরকে তাঁর ভালোবাসা ও সান্নিধ্য দানের জন্যই মাহে রমযান দান করেন। রোযা কেবলই আল্লাহ্‌র জন্য আর আল্লাহ্‌ নিজেই রোযার প্রতিদান দেবেন। রোযার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সেই প্রতিদান লাভের জন্য রোযাকে নিঁখুত করতে হবে। প্রত্যেক ইবাদতকেই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়দিক থেকে সুন্দর ও নিঁখুত করতে হয়। তাহলেই তা আল্লাহ্‌র কাছে মাকবুল ও গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন নামাযের ক্ষেত্রে দরকার খুশু ও খুযু। খুশু হলো বাহ্যিক সৌন্দর্য আর খুযু হলো অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। বাহ্যিক সৌন্দর্য হলো কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা ইত্যাদি যথার্থভাবে আদায় করা। আর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য হলো ইহসান তথা এমনভাবে নামায আদায় করা যেন নামাযী আল্লাহ্‌কে দেখছে। কমপক্ষে এমন মনে করা যে, আল্লাহ্‌ নামাযীকে দেখছেন। যাকাত ও হজ্জের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্য হলো নিয়ম অনুযায়ী যথাযথভাবে যাকাত ও হজ্জ আদায় করা। আর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য হলো কেবলই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হালাল সম্পদের মাধ্যমে যাকাত ও হজ্জ আদায় করা। অন্যথায় মানুষের কাছে যাকাত ও হজ্জ আদায়কারী হলেও আল্লাহ্‌র কাছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না। তেমনিভাবে রোযার ক্ষেত্রেও রোযাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে সুন্দর ও নিঁখুত করতে হবে।

রোযার বাহ্যিক সৌন্দর্য হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকা। এই বিরত থাকার মাধ্যমে মানুষের পেট ও যৌন চাহিদা সংযমী হয়। রমযান মাস জুড়ে সিয়াম সাধনার কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে পেট ও যৌনাঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ দুইটি অঙ্গ দ্বারাই অধিকাংশ পাপ সংঘটিত হয়। আর রোযার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য হলো, রোযা অবস্থায় মিথ্যাচার, মিথ্যাকাজ, গিবত, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, বাকবিতাণ্ডা ও মারামারিতে লিপ্ত না হয়ে বরং সকল অঙ্গকে পাপ থেকে নিবৃত্ত রাখা। অন্যথায় রোযা আল্লাহ্‌র কাছে মাকবুল ও গ্রহণযোগ্য হবে না। মনে রাখতে হবে, এসব শুধু রোযার সাথেই নির্দিষ্ট নয়, বরং রোযা রেখে এগুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সংযত ও পাপমুক্ত জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যেন সারা বছর সংযত ও পাপমুক্ত জীবন যাপন করা যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَه□ وَشَرَابَه□

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মিথ্যাকথা ও মিথ্যাচার পরিত্যাগ করে না তার পানাহার পরিত্যাগ করা আল্লাহ্‌র কাছে কোনই গুরুত্ব রাখে না"।[৪৩]

---

৪৩ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: যে মিথ্যা কথা ছাড়ে না, পৃ. ৬৭৩, হাদীস নং ১৮০৪;*জামি' আত-তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: রোযা অবস্থায় গিবত না করা, পৃ. ৮৭, হাদীস নং ৭০৭; *সুনানু আবী দাউদ*,২য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: রোযা অবস্থায় গিবত না করা, পৃ.২৭৯, হাদীস নং ২৩৬৪।

১০. রমযান মাসে কুরআন তেলাওয়াত

মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌তা'য়ালার প্রেরিত সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআন মজীদ রমযান মাসে নাযিল হয়েছে।[৪৪] কুরআন নাযিলের কারণেইরমযান মাস শ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে স্বীকৃত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ.

"হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সা) সব মানুষের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে তাঁর দানের হাত আরো বেশি সুপ্রসারিত হতো যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রমযানের প্রতি রাতে জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। রাসূলুল্লাহ(সা)জিবরাঈল (আ)-এর সাথে কুরআন মজীদ পুনরাবৃত্তি করতেন"।[৪৫]

فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِى أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَه □ بِه□ فِى الْعَامِ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَانِى إِلاَّ قَدْ حَضَرَ أَجَلِى.

"হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সা) বলেছেন, সারা বছর কুরআনের যে অংশগুলো নাযিল হতো, তিনি রমযানেসবটুকু জিবরাঈলকে পড়ে শোনাতেন এবং জিবরাঈলও তাঁকে পড়ে শোনাতেন। যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর একে অপরকে দুইবার পড়েশুনিয়েছেন"।[৪৬]

কুরআনের সঙ্গে রমযানের নিবিড় সম্পর্কের কারণে এ বরকতময় মাসে পুণ্যবান মনীষীরা রোযা রাখার মহান হুকুম পালনের সাথে সাথে অন্যান্য নফল ইবাদতের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। রমযানের পুরো মাসকে পবিত্র কুরআনের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিতেন। তাদের কেউ কেউ সাধ্যানুযায়ী অধিকবার কুরআন খতমের প্রতি মনোনিবেশ করতেন। আবার অনেকের মনোযোগ থাকত কুরআনের গভীরে গিয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটন করে তার মুক্তামালায় জীবনকে সাজিয়ে নেওয়া।

---

৪৪ দ্র. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, ২: ১৮৫।

৪৫ *সহীহ আল-বুখারী*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: ওহীর সূচনা, অনুচ্ছেদ: ওহীর সূচনা, পৃ. ৬, হাদীস নং ৬; *সহীহ মুসলিম*, ৭ম খণ্ড, অধ্যায়: মর্যাদাসমূহ, অনুচ্ছেদ: নবী সা. এর দানশীলতা, পৃ. ৭৩, হাদীস নং ৬১৪৯।

৪৬ *সহীহ আল-বুখারী*, ৫ম খণ্ড, অধ্যায়: অনুমতি প্রার্থনা, অনুচ্ছেদ: মৃত্যুর আগে কারো গোপনীয়তা প্রকাশ না করা, পৃ. ২৩১৭, হাদীস নং ৫৯২৮; *সহীহ মুসলিম*, ৭ম খণ্ড, অধ্যায়: সাহাবীদের মর্যাদাসমূহ, অনুচ্ছেদ: ফাতিমা রা. এর মর্যাদা, পৃ. ১৪৩, হাদীস নং ৬৪৬৮।

এই পবিত্র মাসে কাম্য হলো: **(এক)** সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে না জানলে কুরআন শেখার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করা। **(দুই)** সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে জানলে এই রমযানে একাধিক বার খতম হওয়ার মতো বেশি করে তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা। **(তিন)** কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআনের মর্মবাণী বোঝার জন্য তাফসীর ও হাদীস অধ্যয়নসহ হক্কানী আলেমদের সাহচার্য লাভ করা।**(চার)** কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)- এর সুন্নাহ মাফিক আমল করে কুরআনের সাথে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা। **(পাঁচ)**তারাবীহ নামাযে কুরআন শুনে খতম করা। **(ছয়)**রমযান মাসে গড়ে তোলা অভ্যাস বছর জুড়ে চালু রাখা।

১১. রমযান মাসে দান-খয়রাত করা

রমযান হলো সবর ও মুয়াসাতের মাস। সবর মানে ধৈর্য আর মুয়াসাত মানে সহানুভূতি। গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষরা বিভিন্ন সময় ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করে থাকে। রোযার মাধ্যমে রোযাদারের তা উপলব্ধির সুযোগ হয়। অন্যের দুঃখ-কষ্ট বোঝার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। সহানুভূতি প্রকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। তার আলোকে রমযানে অপরিহার্য ও সাধারণ সবধরনের দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে উদার হতে হবে। রাসূলুল্লাহ(সা) এমনিতে সব মানুষের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন,রমযান মাসে তাঁর দানের হাত আরো বেশি সুপ্রসারিত হতো।

যাকাত: যাকাত এক বছরে একবার আদায়যোগ্য ইবাদত হলেও তা আদায়ের জন্য রমযানকে বেছে নেওয়া উচিত। কারণ, এতে একদিকে সহানুভূতি প্রকাশের মাসে সহানুভূতি প্রকাশ করা যায়, অন্যদিকে রমযানের কারণে বেশি মাত্রায় নেকী পাওয়া যায়।

সাদাকাতুল ফিতর: সাদাকাতুল ফিতর এক মাস রোযা রাখার পর রোযার ভুল-ত্রুটির কাফ্ফারা হিসেবে আদায়কৃত সাদাকা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সাদাকাতুল ফিতর আত্মশুদ্ধি ও আমলের পূর্ণতার জন্য।[৪৭]ওয়াকি' ইব্‌ন আল-জাররাহ (র)-এর ভাষ্যমতে এটি নামাযের সিজদায়ে সাহুর মতো রোযার ভুল-ত্রুটির ক্ষতিপূরণের জন্য।[৪৮] কাজেই সাদাকাতুল ফিতর রমযানেই আদায় করা উচিত। রাসূলুল্লাহ(সা) ঈদগাহে যাওয়ার আগেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। তাছাড়া রোযার মাধ্যমে গরিবদের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়েই রোযাদার ঈদের মুখোমুখি হয়। ঈদের আনন্দে সবাইকে শরিক করতে যাকাত ও সাদাকাতুল ফিতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজেই সামর্থ্য অনুযায়ী সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা উচিত।

---

৪৭ *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: যাকাত, অনুচ্ছেদ: যাকাতুল ফিতর, পৃ.২৫, হাদীস নং ১৬১১; *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: যাকাত, অনুচ্ছেদ: যাকাতুল ফিতর, পৃ. ৫৮৫, হাদীস নং ১৮২৭।

৪৮ *ইযাহুল মিশকাত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৭।

রোযাদারকে ইফতার করানো:রমযান মাসে রোযাদারকে ইফতার করানো খুবই ফযীলতপূর্ণ একটি নেক আমল। রমযানের বাইরে এর কোন সুযোগ নেই।

عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.

"হযরত যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করায় সে রোযাদারের সমান সওয়াব লাভ করে এবং তাতে রোযাদারের সওয়াবে মোটেও ঘাটতি হয় না"।[৪৯]

অধীনস্তদের কাজের চাপ কমিয়ে দেওয়া:রমযানে নিজের অধীনস্ত সবার কাজের চাপ কমিয়ে দেওয়া উচিত। মজুরি না কমিয়ে কাজের চাপ কমিয়ে দিলে আল্লাহ্‌তা'য়ালা নিয়োগদাতাকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।

عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر يوم من شعبان فقال من خفف عن مملوكه غفر الله له و أعتقه من النار.

"হযরত সালমান ফারসী(রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের অধীনস্তদের কাজের চাপ কমিয়ে দেয়, আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন"।[৫০]

সাধারণ দান-খয়রাত: রমযানে সাধারণ ও নফল দান-খয়রাতের পরিধি বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরি। আল্লাহ্ বলেন,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ.

"তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা উদ্বৃত্ত তাই ব্যয় করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো"। (সূরা বাকারা, ২: ২১৯)।

১২. ই'তিকাফ

ই'তিকাফ অর্থ অবস্থান করা, কোনো স্থানে নিজেকে অবরুদ্ধ করে রাখা। ইসলামী পরিভাষায় ই'তিকাফ হলো, ইবাদত করা ও সওয়াব লাভের উদ্দেশে পুরুষদের জন্য মসজিদে

---

৪৯ *জামি' আত-তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: ইফতার করানোর সাওয়াব, পৃ. ১৭১, হাদীস নং ৮০৭; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, ১ম খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: ইফতার করানোর সাওয়াব, পৃ. ৫৫৫, হাদীস নং ১৭৪৬।

৫০ আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযাইমা, *সহীহ ইব্ন খুযাইমা*, ৩য় খণ্ড, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত১৪১২ হি., ১৯৯২ খ্রি. ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: রমাদান মাসের মর্যাদা, পৃ. ১৯১, হাদীস নং ১৮৮৭।

এবং মহিলাদের জন্য আপন গৃহে নামাযের জায়গায় অবস্থান করা। রমযান মাসে ই'তিকাফ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। রমযানেরফযীলত, বরকত এবং বিশেষত লায়লাতুল কদরের ফযীলত ও বরকত হাসিলের জন্য ই'তিকাফের বিকল্প নেই। রমযানের বিশ তারিখের সূর্যাস্ত থেকে ঈদের চাঁদ উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (রমযানের শেষ দশক) ই'তিকাফ করাকে সুন্নত ই'তিকাফ বলা হয়। নবী (সা) তাঁর জীবনে পাওয়া সবরমযান মাসের শেষ দশক ই'তিকাফ করেছেন। একবার শুধু রমযানে জিহাদের সফরের কারণে ই'তিকাফ করতে না পারায় পরবর্তী বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করে তা পূরণ করে নিয়েছেন। সাহাবীগণও তাঁর সাথে ই'তিকাফে শরিক হতেন। ই'তিকাফ একটি মর্যাদাপূর্ণ মাসনুন আমল যা ইসলামের অন্যতম নিদর্শনও বটে। কোনো মসজিদ ই'তিকাফশূন্য থাকলে পুরো এলাকাবাসী সুন্নতে মুয়াক্কাদা বর্জনের কারণে গুনাহগার হবে।

ই'তিকাফের ফযীলত ও উপকারিতা: ই'তিকাফের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীসের ভাষ্য নিম্নরূপ-

من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه و بين النار ثلاث خنادق أبعد ما بين الخافقين

"হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে একদিন ই'তিকাফ করবে আল্লাহ্‌তা'য়ালা তার এবং জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। অর্থাৎ আসমান ও জমিনের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে তার চেয়েও বেশি দূরত্ব সৃষ্টি করে দেবেন"।[৫১]

ই'তিকাফের উপকারিতার বর্ণনায় বলা যায় যে, **প্রথমত,**শবে কদর অন্বেষণের অন্যতম মাধ্যম হলো ই'তিকাফ। **দ্বিতীয়ত,**ই'তিকাফকারী কোনো আমল না করলেও শুধু মসজিদে অবস্থানের কারণে তার রাত-দিন ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়। **তৃতীয়ত,**ই'তিকাফের কারণে অনেক পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। **চতুর্থত,**ই'তিকাফের মাধ্যমে নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্‌তা'য়ালার কাছে সমর্পণ করা হয়।

১৩. লায়লাতুল কদর

রমযান মাসের রাতসমূহের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় রাত লায়লাতুল কদর বা কদরের রাত। এ রাত রমযান মাসের সৌন্দর্য ও মর্যাদা আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বরকতময় এ রাতের স্রোতধারায় প্লাবিত হয়েছে মাহে রমযান। লাইল অর্থ রাত।কদর শব্দের দুইটি অর্থ হতে পারে।

---

৫১ *শু'আবুল ঈমান*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: ই'তিকাফ, পৃ. ৪২৪, হাদীস নং ৩৯৬৫।

প্রথম অর্থ হলো মাহাত্ম্য, সম্মান ও মর্যাদা। এক্ষেত্রে লায়লাতুল কদরের অর্থ হবে সম্মানিত, মহিমান্বিত বা মর্যাদাপূর্ণ রাত। এ রাতের রয়েছে অস্বাভাবিক মাহাত্ম্য ও সম্মান। এজন্য এ রাতকে লায়লাতুল কদর তথা মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ রাত বলা হয়।

দ্বিতীয় অর্থ হলো তাকদীর বা ভাগ্য। এ রাতেই পরবর্তী এক বছরের বিস্তারিত অবধারিত বিধিলিপি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সে বিধিলিপিতে মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও রিযিক ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে ফেরেশতাদের লিখে দেওয়া হয়। কাজেই এ রাতকে আরবীতে লায়লাতুল কদর বা শবে কদর বলা হয়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা), মুজাহিদ (র) ও দাহ্হাক (র) প্রমুখ এ মত পোষণ করেছেন যে, শবে কদরে পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিতব্য সৃষ্টি সম্পর্কিত সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা (লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ ফায়সালা অনুসারে) স্থির করা হয়। অর্থাৎ সে ব্যাপারে ফেরেশতাদেরকে জানানো হয়। যেমন, এ বছর কারা কারা জন্ম গ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেওয়া হবে ইত্যাদি।[৫২]

এ বিশেষত্বের দিকেই আল্লাহ্তা'য়ালা ইঙ্গিত করেছেন।

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ . فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ .

"আমিতা (কুরআনকে) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, আমিতো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়"। (সূরা দুখান, ৪৪: ৩-৪)।

লায়লাতুল কদর অন্বেষণ: রমযানের শুরু থেকেই লায়লাতুল কদরের অন্বেষণে খুব তৎপর থাকতে হবে। হাদীসসমূহে লায়লাতুল কদরকে বিশেষভাবে রমযানের শেষ দশকের রাতসমূহে অন্বেষণ করতে বলা হয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন আর বলতেন, তোমরা লায়লাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশকে অন্বেষণ করো"।[৫৩]

এখানে অনুসন্ধান বা খোঁজ করার অর্থ হচ্ছে এ রাতগুলোতে ইবাদত-বন্দেগি ও তওবা-ইস্তেগফার করা।

---

৫২ ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর, *তাফসীরে ইব্ন কাসীর*, ৫ম খণ্ড, দারুল মা'রিফাহ, বৈরূত ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৩৪৪।

৫৩ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়: তারাবিহ, অনুচ্ছেদ: রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান, পৃ. ৭১০, হাদীস নং ১৯১৬; *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদ: লায়লাতুল কদরের ফযীলত, পৃ. ১৭৩, হাদীস নং ২৮৩৩।

শেষ দশকেও যদি অনুসন্ধান করা সম্ভব না হয় তবে শেষ সাতদিন অবশ্যই অন্বেষণ করতে হবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

"হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, তোমরা লায়লাতুল কদরকে রমযানের শেষ সাতদিন অবশ্যই অন্বেষণ করো"।[৫৪]

রমযানের শেষ দশকের মধ্যে আবার বেজোড় রাতসমূহে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।রাসূলুল্লাহ (সা)বলেছেন, তোমরা লায়লাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে অন্বেষণ করো"।[৫৫] অর্থাৎ রমযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাতগুলো। ২৭ রমযানের রাতই যে লায়লাতুল কদর তা সুনির্দিষ্ট নয়। অবশ্য ২৭ রমযানের রাতের প্রতি কোন কোন হাদীসে ভিন্নভাবে গুরাত্বারোপ করা হয়েছে। যারা শেষ দশকের সবকটি রাতে ইবাদত-বন্দেগি করতে একেবারেই অপারগ ও অক্ষম তাদের জন্য অন্তত সাতাশের রাতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ لَعَلَّ اللَّهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ.

"হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এরনিকট এসে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন বৃদ্ধ রুগ্ন ব্যক্তি। রাতে নামাযে দাঁড়াতে আমার অসহনীয় কষ্ট হয়। তাই আপনি এমন একটি রাতের কথা বলে দিন, যে রাতে আমি লায়লাতুল কদর পেতে পারি। তখন তিনি বলেন, তুমি সাতাশের রাতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দাও"।[৫৬]

عنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أُبَىٌّ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللَّهِ إِنِّى لأَعْلَمُهَا وَأَكْثَرُ عِلْمِى هِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِى أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقِيَامِهَا هِىَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

৫৪ *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়: রোযা, অনুচ্ছেদঃ লায়লাতুল কদরের ফযীলত, পৃ. ১৭০, হাদীস নং ২৮১৯; *সহীহ আল-বুখারী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, অধ্যায়ঃ তাবির, অনুচ্ছেদঃ স্বপ্নে একমত হওয়া, পৃ. ২৫৬৫, হাদীস নং ৬৫৯০।

৫৫ *সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়ঃ তারাবিহ, অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান, পৃ. ৭১০, হাদীস নং ১৯১৩।

৫৬ ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ১ম খণ্ড, মুয়াসসাসাতুল কুরতুবা, কায়রো তা. বি.,পৃ. ২৪০, হাদীস নং ২১৪৯।

"হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলেন, লায়লাতুল কদর কোন রাত তা আমি অবশ্যই জানি। সেটা হলো সাতাশের রাত"।[৫৭]

লায়লাতুল কদরে করণীয়ঃ রমযানের এ রাতটিতে যথাসাধ্য ইবাদত-বন্দেগিতে আত্মনিয়োগ করাই মুমিনের কাম্য। রমযানের শেষ দশদিন আসার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সা) সপরিবারে রাত জাগরণ করে ইবাদত-বন্দেগি করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশক শুরু হওয়ার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে রাত জাগরণ শুরু করতেন এবং পরিবারবর্গকে জাগাতেন। ইবাদতের মধ্যে অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন এবং শক্ত করে লুঙ্গি বেঁধে নিতেন। অর্থাৎ কোমর বেঁধে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতেন"।[৫৮]

কাজেই এ রাত ইবাদত-বন্দেগি এবং ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে কাটানো উচিত।

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি লায়লাতুল কদর জানতে পারলে তাতে কী প্রার্থনা করবো?রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি বলবে-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

"হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। ক্ষমা করাকে ভালোবাসো। কাজেই আমাকে ক্ষমা করো।"

১৪. রমযান মাস ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

সরকারের সদিচ্ছায় আমাদের দেশে প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রমযান মাসে বন্ধ রাখা হয়। সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালতের কাজের সময়সূচী কমিয়ে রোযা পালনের উপযোগী করে দেয়া হয়। রোযাদারদের সুবিধার্থে সরকারিভাবে বাজার দর স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সাহরী, ইফতার ও তারাবীহ নামায আদায়ের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন মসজিদে তাফসীরুল কুরআনের আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বই-পুস্তক বিক্রয়ে ব্যাপক মূল্যছাড় দেওয়া হয়। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চেষ্টায় এখন সব মসজিদের তারাবীহ নামাযে সমান পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। এতে কোন মুসল্লী মসজিদ পরিবর্তন করলেও

---

৫৭ *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদঃ কিয়ামুল লাইলে উৎসাহ প্রদান, পৃ. ১৭৮, হাদীস নং ১৮২২।

৫৮ *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খণ্ড, অধ্যায়ঃ ইতিকাফ, অনুচ্ছেদঃ শেষ দশকের ইবাদত, পৃ. ১৭৫, হাদীস নং ২৮৪৪; শব্দের একটু পরিবর্তনসহ *সহীহ আল-বুখারী*, ২ম খণ্ড, অধ্যায়ঃ তারাবিহ, অনুচ্ছেদঃ শেষ দশকের ইবাদত, পৃ. ৭১১, হাদীস নং ১৯২০।

তারাবীহ নামাযে ধারবাহিকভাবে তিলাওয়াত শোনতে পারে। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন রমযান উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে থাকে। দেশের দৈনিক পত্রিকগুলোও রমযান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। মসজিদসমূহে মুসল্লীসংখ্যা বেড়ে যায়। ছোটদের মধ্যেও রোযা পালনের প্রতিযোগিতা দেখা যায়। মানুষের মধ্যে সংযমীভাব পরিলক্ষিত হয়। সবমিলিয়ে রমযান উদ্‌যাপনের এক পরিবেশ বিরাজ করে। রমযান উদ্‌যাপনে আমাদের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা আরো শাণিত হলে এবং রমযান উদ্‌যাপনের দীক্ষা বছর জুড়ে ধরে রাখতে পারলে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত হবে নিঃসন্দেহে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, রমযান এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের মাঝে আগমন করে। ইবাদতের উপযুক্ত পরিবেশবিশিষ্ট এমাসে নিখুঁতভাবে রোযা পালন, তারাবীহ নামায আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, দান-খয়রাতসহ সংযত জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে সবার মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ভাব-গাম্ভীর্য জাগ্রত হবে। তার ফলেঅন্যায়, অবিচার, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদমুক্ত শান্তি ও সৌহার্দ্যের সমাজ গড়ে ওঠবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি.

আরবি ব্যাকরণের পরিচয় ও ইসলামী শারী'আহ অধ্যয়নে এর প্রয়োজনীয়তা :একটি বিশ্লেষণ

ড. মো: আব্দুর রহিম মুকুল*

[Abstract: Language is the medium of expression. This language was born with human creation. Grammar is the consultant and guide of language. Grammar was born a few centuries before the birth of **'Iesa** (A). Arabic grammar was born in the middle of the first century of Hijri year to protect the purity and integrity of Arabic language like other grammars. The speed of Arabic language differs from other languages in the world. With the change of sound of vocabulary, the meaning of this language is changed as well. The basic principles of this grammar are made from the divine book, Al-Qur'an. The texts of Quran-Sunnah and Islamic Sharee`ah are impossible to know and understand without the knowledge of Arabic grammar. So, by acquiring knowledge of grammar, it is necessary to study the Quran and Sunnah. At the same time, the Muslim Ummah should try to protect national pride and dignity.]

ভূমিকা:যে নীতিমালার মাধ্যমে ভাষা শুদ্ধভাবে পড়া, বলা ও লিখা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে। আরবি ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও সমপরিচয় প্রযোজ্য। ব্যাকরণের জন্মের পূর্বে ভাষার জন্ম। সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় ভাষাকে নিরাপদ রাখার জন্য ব্যাকরণের জন্ম হয়েছে। আরবি ব্যাকরণও তার ভাষার এক দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় ভাষাকে রক্ষার জন্য জন্ম নিয়েছে। তবে পার্থক্য হলো অন্যান্য ব্যাকরণ রচিত হয়েছে তাদের ভাষাবিজ্ঞানীদের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-গবেষণা থেকে। আর আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে স্বর্গীয় বাণী আল কুরআন, রসূলের অমীয় বাণী হাদীস ও প্রাঞ্জল আরবি কবিতা থেকে। ভাষাবিজ্ঞানীগণ তাই আরবি ভাষা চর্চা, কুরআন- হাদীস অধ্যয়ন ও ফিকহ চর্চা -প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ব্যাকরণের জ্ঞানকে অপরিহার্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অনেকে ব্যাকরণের জ্ঞানহীন বিদ্যা চর্চাকে তীর্যকভাবে কটাক্ষ করেছেন। অনেকে একে লবণহীন তরকারীর সাথে তুলনা করেছেন। যেমন, আশ-শা'বী বলেন,[১]

---

* প্রভাষক, আদব বিভাগ, নাগেশ্বরী কামিল মাদরাসা, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

১ আবু বকর আহমাদ ইবন 'আলী ইবন ছাবিত আল খতীব আল বাগদাদী, *আল জামি' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'*, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৩ হি.),পৃ. ২৮।

النحو فى العلم كالملح فى الطعام(জ্ঞানের রাজ্যে ব্যাকরণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ, তরকারীর স্বাদে লবণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ।)

মূল শব্দসমূহ:আরবি, ব্যাকরণ, ভাষা, কুরআন, হাদীস, ফিকহ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ গবেষণায় বিভিন্ন তথ্যসূত্রের মাধ্যমে ব্যাকরণ ও আরবি ব্যাকরণের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষা ও ব্যাকরণের পারস্পরিক বন্ধন ও সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এ গবেষণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকসমাজ কুরআন-সুন্নাহ, তাফসীর-ফিকহ তথা ইসলামী শরী'আহ অধ্যয়নে আরবি ব্যাকরণ জানার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। ইন শা' আল্লাহ।

কর্মপদ্ধতি

এ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য উপাত্তসমূহ প্রাথমিক উৎস ও দ্বিতীয় উৎস থেকে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষা-সাহিত্য ও ব্যাকরণের ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ যেমন-ভাষাবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান এর *'তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ'*, আল বাগদাদীর*'আল জামী' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামী''* ইত্যাদিকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর সাধারণ ভাষা-সাহিত্য ও দর্শনের আরবি ও ইংরেজি গ্রন্থসমূহ এবং গবেষণাপত্রকে দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে প্রাধান্য দেয়াহয়েছে, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো বিভ্রান্তি না ঘটে এবং সঠিক তথ্য উপস্থাপিত হয়।

ব্যাকরণ ও আরবি ব্যাকরণ

ব্যাকরণের জন্মপরিচয়

ভাষা সর্বদাই গতিশীল। পৃথিবীর শুরু থেকে সে বয়ে চলেছে আপন গতিতে। কখনো প্রতিবন্ধকতার কারণে কখনো নিজে নিজেই গতিপথ পরিবর্তন করে বাঁক নিয়েছে ভিন্ন দিকে। হঠাৎ কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জনসংখ্যাধিক্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক প্রবাহ ও শাখা প্রশাখা। তখন শাখা-প্রশাখাগুলোর গতি হয়েছে দুর্বল ও শ্লোথ। কোন কোন শাখা হারিয়ে ফেলেছে নাব্যতা। অধিকাংশ সময় কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে তাদের মূল স্রোতধারা। যেমন পরিণতি হয়েছে সেমিটিক ভাষার। সে সাতটি ভাষার জন্ম দিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ভাষার এ বিবর্তন ও কলংক রোধে ভাষাভাষীরা প্রণয়ন করেছেন নির্দিষ্ট নীতিমালা। এই নীতিমালা ভাষা-সাহিত্যে ব্যাকরণ হিসেবে পরিচিত। প্রচলিত অর্থে ব্যাকরণ হলো, যে শাস্ত্রে কোন ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং

বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধিবিশদভাবে আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।[২] প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান ব্যাকরণের পরিচয় দিয়েছেন ভিন্নভাবে। তিনি বলেন,[৩]

النحو بمعناه الحقيقى طبيعى على لسان كل متكلم يتلقنه من مرضعه.

(প্রকৃত অর্থে ব্যাকরণ হলো স্বভাবগতভাবে এমন একটি ভাষা শেখার নাম, যা প্রত্যেক ভাষাভাষী তার মায়ের কাছ থেকে শিখে থাকে।)

তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, মানুষ কথা বলা শিখতে শিখতে ভাষা শিখে ফেলে। তাই সে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই সুন্দরভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। তিনি ব্যাকরণকে মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষা শেখার সহায়ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪] যা হোক ব্যাকরণ ভাষার শাসক বা নিয়ন্ত্রক নয়; বরং ভাষা ব্যাকরণের উৎস ও আলোচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে ব্যাকরণ ভাষার পরামর্শক ও পথনির্দেশক মাত্র। কারণ ব্যাকরণের জন্ম হয়েছে ভাষা সৃষ্টির অনেক পরে। যখন কোন ভাষার কোন নীতিমালা ছিলনা তখনও মানুষ কথা বলেছে শুদ্ধ ভাষায়, বক্তৃতা দিয়েছে প্রজ্ঞা ও অলংকারপূর্ণ ভাষায়, কবিতা লিখেছে ছান্দসিকভাবে। তারা লিখেছে নাটক ও উপন্যাস, আবিষ্কার করেছে গণিতের সূত্রাবলী, বলে গেছেন দার্শনিক মতবাদ ও প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাবলী এবং আরো কত কিছু। তবে একটা সময়ে ভাষার শুদ্ধতা ও স্বকীয়তা রক্ষায় প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। যেমন খ্রীস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে গ্রীক ব্যাকরণ রচনা শুরু করেছিলেন দার্শনিক ও গণিতের জনক পিথাগোরাস[৫] (Puthagoras,মৃ. ৪১১ খৃ. পূর্ব)। আর তা পূর্ণতা দিয়েছিলেন এ্যারিস্টটেল[৬] (Aristoteles, মৃ. ৩২২-৩৮৪ খৃ. পূর্ব) এবং তার সমসাময়িক

---

২ Shorter Oxford English Dictionary-তে Grammar-এর পরিচয়ে বলা হয়েছে, Grammar the branch of language study or linguistics which deals with the means of showing the relationship between words in use, traditionally divided into the study of inflections (or morphology) and of the structure of sentences (syntax) accidence, and often including also phonology. N.B: *Shorter Oxford English Dictionary*, vol-1, fifth edition (Oxford University press, 2002), p. 1137.

৩ জুরজী যায়দান,*তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (কায়রোঃ দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ২৫০।

৪ *পূর্বোক্ত*।

৫ পিথাগোরাস ছিলেন একজন গ্রীক দার্শনিক ও গণিতবিদ। তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে সন্যাসী জীবন যাপন করতেন। তাকে গণিত শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি সংখ্যাকে সকল বিষয় নির্ণয়ের মাধ্যম মনে করতেন। দ্র. Tomas Taylor, *Life of Pythagoras* (London: J. M. Watkins, 1818), p. 1-141.

৬ এ্যারিস্টটেল প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। তিনি চেলিসিডিসের অন্তর্গত স্টেগিরা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্লেটোর ছাত্র ছিলেন। তিনি প্লেটোর কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাজানা জ্ঞান অর্জন করেন।

দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানীরা। আর তারও অনেক আগে গ্রীকরা কোন প্রকার ব্যাকরণ ছাড়াই রচনা করেছে অসংখ্য গ্রন্থ। যেমন খ্রীস্টপূর্ব ৯ম শতাব্দীতে হোমার[৭] (Homeros, মৃ. খ্রীস্টপূর্ব ৯ম শতাব্দী) রচনা করেছিল ইতিহাস খ্যাত মহাকাব্য 'ইডিয়াস' ও 'ওডিসি'; ভাষাতত্ত্ববিদ ইসখায়লুস[৮] (Aeschylus, মৃ.খৃ.পূর্ব ৫২৫-৪৫৬) লিখেছেন 'প্রমিথিউস আল-মুকায়য়াদাহ'(بروميتيوس المقيدة/বন্দী প্রমিথিউস) নাটকটি; দার্শনিক এ্যানেক্সিম্যান্ড্রোস[৯] (Anaximandros, মৃ. খৃ.পূর্ব ৬১০-৫৪৭) ও থ্যালিস[১০] (Thales, মৃ. খৃ.পূর্ব ৫৪৮) বলে গেছেন অনেক দার্শনিক মতবাদ; ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস[১১] (Herodotos, মৃ. খৃ. পূর্ব ৪৮৪) লিখেছেন তার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ আর-রিহালাহ (الرحالة) ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থাবলী। কারণ ব্যাকরণের কোন গ্রন্থবদ্ধ নীতিমালা সম্পর্কে তাদের ধারণা না থাকলেও ভাষাজ্ঞান ছিল তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্বে।[১২]

তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তার প্রধান গ্রন্থগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো,Dialogues, On Monday, Natural History, Organon of the Instrument of Curect Thinking, On the Soul, Rhetoric, Physics, Metaphysics, Politics, Poetics. দ্র. Michael H. Hart, *The 100 A Ranking of the most Influential Persons in the History* (New York: Carol Publishing Group, 1993), p. 70-75.

৭তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৯ম শতাব্দীতে এশিয়া সুগরায়/Asia Minor (آسيا صغرى) জন্মগ্রহণ করেন। তার রচিত মহাকাব্য ইডিয়াস ও ওডিসি গ্রীক কাব্য জগতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। দ্র.George Grote, *History of Greece,* Vol-1 (Boston: John P. Jewett & Company, 1851), p. 13-35.

৮ তিনি গ্রীক কাব্য গগণের উজ্জলতম নক্ষত্র ছিলেন। তাকে বিয়োগান্ত নাটকের স্রষ্টা বলা হয়। দ্র. John Herington, *Aeschylus* (New Haven: Yale University Press, 1986), 1-11; Lois Spartz, *Aeschylus* (Twayne Publishers, 1982), p 5-19.

৯ তিনি ছিলেন একজন গ্রীক দার্শনিক। ধারণা করা হয় তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৬১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীস্টপূর্ব ৫৪৭ সালে মারা যান। দ্র. F. Copleston, *A History of Phylosophy*, Vol-1 (New York: Image Books, 1985), P. 24.

১০ তিনি ছিলেন গ্রীক দার্শনিক ও গণিতবিদ। তিনি মিলিটস/Miletos শহরে এক ফিনীশীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীকরা তাকে তাদের শ্রেষ্ঠ সপ্ত মনীষীদের মধ্যে প্রথম মনে করে থাকেন। তিনি জ্যামিতি বিদ্যায় নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তার মতে, "জগতের সকল জিনিসের উৎস পানি।" দ্র. A. F. Uduigwomwen, *History and Philosophy of Science* (Aba: A. A. U. Industries, 1996), P. 21.

১১ তিনি ছিলেন গ্রীক ঐতিহাসিক ও পর্যটক। তিনি বিশ্বের বিখ্যাত স্থানসমূহ ভ্রমণ করেন। তিনি বিশেষতঃ ইরাক, ফিনীশীয়া ও মিসর ভ্রমণ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রচীন জাতিসমূহের উত্থান-পতন নিয়ে গবেষণা করেন। তার আর-রিহালাহ গ্রন্থটি প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাসের তথ্য সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাকে ইতিহসের জনকও বলা হয়। দ্র.M. A. George Rawlinson, *The History of Herodotus*, Vol-1 (New York: D. Appleton & Company, 1859), P. 1-28; J. A. S. Evans, *Herodotus* (Boston: Iwayne Publishers, 1982), P.1.

১২ *যায়দান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০।

একইভাবে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রাজা পমপিউস[১৩] (Pompeius, মৃ.খৃ. পূর্ব ১০৬-৪৮)-এর শাসনামলে ভাষাবিদ ডায়েনিউসিয়স[১৪] (Dionusios, খৃ. পূর্ব প্রথম শতাব্দী) গ্রীক ব্যাকরণের অনুসরণ করে রোমান ব্যাকরণ রচনা করেন। আর তারও অনেক আগে রোমান কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ রচনা করেছেন অনেক গ্রন্থ। এ সকল রচনাবলীর পিছনে ছিল তাদের ভাষাগত পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা ।[১৫] কিন্তু ভাষার বিশুদ্ধতা, গতিশীলতা ও সমৃদ্ধি স্থায়ী করার জন্য ব্যাকরণ অনস্বীকার্য ছিল। তাই এ প্রয়োজনীতা অনুভব করে ভাষাবিজ্ঞানীগণ ব্যাকরণ প্রণয়ন করেছেন।

আরবি ব্যাকরণের পরিচয়

(ক) ঐতিহাসিকপরিচয়

হিজরী প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.)-এর শাসনামলে আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী (র.)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় আরবি ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়। আর তার শতবর্ষ পূর্বে আরবে আবির্ভাব হয়েছিল ইমরুল কায়স, যুহায়র, লাবীদ, আনতারাহ, তরাফাহ, আন-নাবিগাহ, আল-আ'শাসহ আরো কত প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক। যারা আরবি ভাষায় রচনা করেছিল ইতিহাস খ্যাত স্বর্ণাক্ষরে খচিত প্রেমাচ্ছল কবিতামালা ও কালজয়ী কীর্তিগাঁথা। যেগুলো সপ্ত ঝুলন্ত কাব্য হিসেবে পরিচিত। সে সময় রচিত হয়েছে আরো অসংখ্য কবিতা, গান, বাগ্মীতা, প্রবাদ-প্রবচন ও অন্যান্য সাহিত্যকর্ম। যেগুলো জন্ম থেকেই আরবি ভাষা-সাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দ্বীপ্তি ছড়াচ্ছে এবং সেগুলোর আলোয় ভাষা-সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানীগণ আজও খুঁজে পান নতুন নতুন পথের সন্ধান। আর যখন আরবি ব্যাকরণের জন্ম হয় তখনও ভাষা-সাহিত্যে বইছিল বসন্তের মৃদু হাওয়া। এটি সম্ভব হয়েছিল আরবদের ভাষাজ্ঞান ও দক্ষতার কারণে। কারণ তারা ছিলেন জন্মগত পণ্ডিত এবং প্রকৃতিগত সাহিত্যিক।[১৬]কিন্তু ভাষা প্রতিরক্ষার জন্য কোন প্রণীত নীতিমালা না থাকায় মাটির নীচে খোসাসহ লুকিয়ে থাকা লাহনের (ভাষাগত অশুদ্ধতা) বীজ উর্বর পরিবেশে অংকুরিত হয়ে ডালপালা মেলতে থাকে। ফলে স্বল্প সময়েই তাদের স্বভাবজাত ভাষায় দেখা দেয় অশুদ্ধতা ও বিপর্যয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে ভুল পরিলক্ষিত হতে থাকে। হাদীসের ইবারাতেও লাহন দৃশ্যত হয়। তখন 'আলী (রা)-এর তত্ত্বাবধানে ভাষাবিজ্ঞানী আবুল আসওয়াদা আদ দুআলী (র) জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে প্রণয়ন করেন ভাষা রক্ষার নীতিমালা বা ব্যাকরণ (النحو)।

---

১৩ তিনি একজন রোমান শাসক ছিলেন। তিনি সিরিয়া জয় করে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। দ্র. John Leach, *Pompey the Great* (London: Croom Helm, 1986, 1978), P. 9.

১৪ তিনি প্রাচীন গ্রীকের রাজধানী আথিনার বিচার বিভাগের উচ্চ পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন। দ্র.George Grote, *History of Greece*, Vol-1, P. 35-38.

১৫ *যায়দান*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০-২৫১।

১৬ *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৫১।

(খ) শাব্দিকও উৎপত্তিগত পরিচয়

শব্দগত ও উৎপত্তিগতভাবে আরবি ব্যাকরণের দুটি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। শব্দগত প্রতিশব্দ হলো[১৭]القواعدالعربية আর উৎপত্তিগত প্রতিশব্দ হলো[১৮]النحو العربى। শাব্দিকভাবে القواعد العربية দ্বারা আরবি ব্যাকরণ বুঝালেও পারিভাষিকভাবে القواعد العربية বলতে আরবি ব্যাকরণ বুঝায় না। ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও ঐতিহাসিকদের লেখা ও গবেষণায় এরূপ ব্যাবহারও তেমনটি পাওয়া যায় না। কারণ القواعدশব্দটি القاعدة এর বহুবচন। অর্থ হলো, নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান, পদ্ধতি, নেতৃত্ব ইত্যাদি।[১৯]القاعدة কোন নির্দিষ্ট পরিভাষা নয়; বরং এটি একটি সাধারণ পরিভাষা, যা বিষয় ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই এই পরিভাষাটি যে কোন বিদ্যার যে কোন নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন বলা হয়, القواعد الرياضية বা গণিতের সূত্রাবলী, القواعد الدستوريةবা সাংবিধানিক বিধিমালা, قواعد الخط লেখার নিয়ম, القواعد التمثيلية বা অভিনয়ের নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি।[২০]

আর পরিভাষা হলো, কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্য নির্দিষ্ট কোন শব্দ ব্যবহার করা।[২১] যার নামকরণ উদ্দিষ্ট বিষয়ের অর্থ ও ভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে হতে পারে আবার কোন সঙ্গতি ছাড়াই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন নামে হতে পারে। যেমন, الصرف বা التصريفপরিভাষা দ্বারা আরবি শব্দাবলীর রূপান্তর বিষয়ক বিদ্যাকে বুঝানো হয়।[২২] এ পরিভাষাটির শাব্দিক অর্থের সাথে ব্যবহারিক অর্থেরও মিল আছে। অন্যদিকে العروضপরিভাষাটি দ্বারা আরবি ছন্দবিজ্ঞানকে

১৭লুইস মা'লূফ, *আল মুনজিদ ফিল লুগাহ ওয়াল আ'লাম*(বৈরূতঃ দারুল মাশরিক, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৬৪৩; ড. ইবরাহীম মাদকূর, *আল মু'জামুল ওয়াসীত* (কায়রোঃ দারু লি ইশা'আতিল ইসলাম, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৭৪৮-৭৪৯।

১৮আশ শায়খ মুহাম্মাদ আত-তানতাবী, *নাশআতুন নাহু ওয়া তারীখু আশহারুন নুহাত*(মিসরঃ দারুল মানার, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২৪;ড. শাওকী দায়ফ, *আল মাদারিসুন নাহবিয়্যিাহ* (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, তাবি), পৃ. ১৫; মুনীর আল বা'লাবাক্কী, *আল মাওরিদ(ইংরেজি-আরবি)*(বৈরূতঃ দারুল 'ইলম লিল মালয়ীন, ১৯৮৬), পৃ. ৩৯৭; Hans Wher, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language ins, 1976), p. 948; Ilias Antun Ilias, *The School Dictinanry* (Cairo: Elias Modern Press), p. 132.

১৯ *আল মুনজিদ*, পৃ.৬৪৩; *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ. ৭৪৮-৭৪৯।

২০*তদেব।*

২১আল মুনজিদ গ্রন্থকার পরিভাষা এর পরিচয়ে বলেন, الاصطلاح: العرف الخاص أى اتفاق طائفة مخصوصة من القوم على وضع الشئ أو الكلمة(অর্থঃ পরিভাষা হলো, নির্দিষ্ট পরিচিতি অর্থাৎ প্রণীত বা উদ্ভাবিত কোন বিষয় বা শব্দের পরিচিতি প্রদানে জাতির নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের ঐক্যমত পোষণ করা।) দ্র. অল মুনজিদ, পৃ.৪৩২; আল মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ.৫২০।

২২ইবন ফারিস আস সাহাবী ফী ফিকহিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ (দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ.১৪৩; আল মুনজিদ, পৃ.৪২২; আল মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৫১৩; রশীদ আশ শারতূনী, মাবাদিউল আরাবিয়্যাহ ফিস সরফ ওয়ান নাহু, চতুর্থ খণ্ড (ঢাকাঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স, তাবি), পৃ. ৮।

বুঝানো হয়।[২৩]কিন্তু العروضশব্দটির অর্থ ও ভাবের সাথে ছন্দবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে العروض পরিভাষাটি ছন্দবিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে।[২৪] কিন্তু القواعد সাথে ব্যাকরণ এর শব্দগত মিল থাকলেও এ শব্দটিকে শুধুমাত্র ব্যাকরণের জন্য নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করার কোন নজীর পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে আরবি ব্যাকরণের উৎপত্তিগত নাম হলো النحو العربى। এ নামটি রেখেছিলেন আরবি ব্যাকরণের রূপকার ইসলামের ৪র্থ খলীফা আলী ইবন আবী তালিব (রা)। তিনি নামটি রেখেছিলেন আরবি ব্যাকরণের জন্মের পরপরই। যখন আবুল আসওয়াদ আদ দুআলী ব্যাকরণের কিছু নিয়ম রচনা করে আলী (রা)-কে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি তা দেখে বলেছিলেন, [২৫] ما أحسن هذا النحو الذى قد نحوت (তুমি যা রচনা করেছো তা কতইনা চমৎকার) এর পর থেকে ভাষাবিজ্ঞানীগণ আলী (রা)-এর পবিত্র জবানীতে উচ্চারিত النحو শব্দটিকে ব্যাকরণ নামক একটি বিদ্যার নাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সেই নামেই ডেকে আসতেছেন।[২৬] সেই দৃষ্টিকোণ থেকে النحو শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে ইংরেজিতে Grammar শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[২৭] যেমন, Greek Grammar-কে আরবিতে النحو الإعريقى বা النحو اليونانى, Syriak Grammar-কে আরবিতে النحو السريانى, Persian Grammar-কে আরবিতে النحو الفارسى,Hindi Grammar-কে আরবিতে النحو الهندى নামে ব্যবহার করা হয়।[২৮]

কিন্তু আরবি ব্যাকরণের উৎপত্তির পর অতি অল্প সময়ে ব্যাকরণ চর্চার পরিধি অনেকগুণে বেড়ে যায়। ভাষাবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা করতে থাকেন। তাদের গবেষণায় স্বল্প সময়েই ব্যাকরণের নব আবিষ্কারের পথ প্রসস্ত হয়। ফলে আল খলীল ইবন আহমাদ আল ফারাহীদী উদ্ভব করেন العروض নামে কবিতা রচনার নীতিমালা সম্বলিত একটি বিদ্যার।[২৯] অন্যদিকে

২৩আশ শায়খ নাসীফ আল ইয়াযাজী আল লুবনানী, আল অদাবু ফী ফুনূনিল 'আরাব (বৈরূত: আল মাকতাবাতুল আমিরিকানিয়্যাহ, ১৯৪৫), পৃ. ১৫৬; অল মুনজিদ, পৃ.৪৯৭-৪৯৮; আল মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৫৯৩-৫৯৫।

২৪লূয়স শায়খু, 'ইলমুল আদাব ফিল 'আরূদ (কানপুর: আল মাকতাবাতুল মাজীদিয়্যাহ, তাবি) পৃ. ৩; কার্নিলিউস কান ডীক আল আমেরিকানী, মুহিতুত দায়িরাহ (মুলতান মাদানী কুতুব খানাহ, তাবি), পৃ. ২।

২৫ নাশআতুন নাহু, পৃ. ২৪; আল মাদারিসুন নাহবিয়্যাহ, পৃ. ১৫।

২৬ তদেব।

২৭তদেব; যায়দান, ১ম খণ্ড; পৃ. ২৫০-২৫১; ড. আহমাদ আমীন, দুহাল ইসলাম, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ২৪৫; আল মাদারিসুন নাহবিয়্যাহ, পৃ. ২০-২১।

২৮ যায়দান, ১ম খণ্ড; পৃ. ২৫০-২৫১; আল মাদারিসুন নাহবিয়্যাহ, পৃ. ২০-২১।

২৯ আব্দুল বাকী ইবন আব্দিল মাজীদ আল ইয়ামানী, ইশারাতুত তা'য়ীন ফী তারাজিমিন নুহাত ওয়াল লুগাবিয়্যিন (রিয়াদ: শারিকাতুত তিবা'আতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১১৪; ড. মুহাম্মাদ আল মুখতার, *তারীখুন নাহবিল আরবি ফিল মাশরিক ওয়াল মাগরিব*(বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৭২-৭৩।

আবূ মুসলিম মু'আয আল হার্‌রা শব্দ বিশ্লেষণে অগ্রণি ভূমিকা পালন করেন। তার গবেষণার ফলে পরবর্তীতে الصرفনামে আরো একটি স্বাধীন বিদ্যার উদ্ভব হয়।[৩০] যদিও ব্যাকরণের সত্তার অস্তিত্বের দিক দিয়েالنحوও الصرفআলাদা নয়। উভয়েই একই সূত্রে গাঁথা। আধুনিক যুগে অনেকে ব্যাকরণকে শুধুমাত্র النحو ও الصرف এর সাথে নির্দিষ্ট করেছেন।[৩১] অতঃপর ব্যাকরণ চর্চায় বৈয়াকরণিকদেও ব্যবহৃত ভাষার প্রাঞ্জলতা ও রচিত গ্রন্থাবলীর উজ্জ্বলতায় البلاغةনামে আরো একটি বিদ্যার অবয়ব তৈরি হতে থাকে এবং স্বল্প সময়েই তা আত্মপ্রকাশ করে স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসেবে পথ চলা শুরু করে।[৩২] আর ধ্বনিতত্ত্ব বা الإملاءব্যাকরণের প্রাথমিক স্তরের মৌলিক উপাদান হিসেবে আগে থেকেই স্বীকৃত ছিল।

এভাবে النحو العربىনামে জন্ম নেয়া আরবি ব্যাকরণের চর্চা ও গবেষণা থেকে উদ্ভব হয় 'ইলমুল ইমলা (علم الإملاء/Phonetics)বা ধ্বনি তত্ত্ব, 'ইলমুল সারফ (علمالصرف/Morphology)বা রূপতত্ত্ব, 'ইলমুন নাহ্ব (علم النحو/Syntax)বা বাক্যতত্ত্ব, 'ইলমুল 'আরূদ (علم العروض/Prosody)বা ছন্দবিজ্ঞান, ও 'ইলমুল বালাগাহ (علمالبلاغة/Rhetoric)বা অলংকার শাস্ত্র নামে পাঁচটি স্বতন্ত্র বিদ্যার। এখন এ বিদ্যাগুলোর নাম ও পরিচিতি অলাদা আলাদা হলেও পূর্বে সবগুলোর অস্তিত্ব নিহিত ছিল النحو العربىনামে একটি বিদ্যার মধ্যে। তাই এই বিদ্যাগুলো একটি অন্যটির পরিপূরক এবং একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ ও সৌন্দর্য্যহীন। এক্ষেত্রে আরবি ব্যাকরণের উদাহরণ একটি প্রস্ফুটিত রঙ্গিন জবা ফুলের মত। যে ফুলটি প্রস্ফুটিত হয়েছে একটি স্নিগ্ধ ও পরিপক্ক পুস্পকলি থেকে। যার রয়েছে সুসমামণ্ডিত পাঁচটি পাপড়ি। আর পাঁচটি পাঁপড়িই ফুলটিকে সমভাবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করেছে।

পরিভাষায়আরবি ব্যাকরণ হলো, যে বিদ্যায় আরবি ভাষার শব্দ, বর্ণ ও বাক্য প্রকরণের সকল নিয়ম-নীতি এবং ছন্দময় ও আলংকারিক প্রয়োগের সুষ্ঠু ও সঠিক বিধানাবলী আলোচিত হয়। আরবি ভাষা বিশ্লেষক 'খালিদ আল আযহারী' (মৃ. ৯০৫ হি.)

আরবি ব্যাকরণের পরিচয় প্রদানে বলেন,

هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم إعرابا وبناء.

(ইহা [আরবি ব্যাকরণ] এমন নীতিমালা সম্বলিত একটি বিদ্যার নাম যার মাধ্যমে আরবি ভাষার প্রকাশভঙ্গি ও বাক্য গঠনের অবস্থা ও পদ্ধতি জানা যায়।)[৩৩]ভাষাবিদ আশ শায়খ মুসতাফা আল গালায়ীনী বলেন,

---

৩০ জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস সুয়ূতী, বুগইয়াতুল ওয়াত, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৮২।

৩১ *মুহাম্মাদ বিক দিয়াব*, ২য় খণ্ড (মিসর: মাতবা'আতুত তারক্কী, ১৩১৮ হি./১৯০০খ্রি.), পৃ. ২-৩।

৩২ আহমাদ মুসতাফা আল মারাগী, তারীখু 'উলুমিল বালাগাহ (মিসরঃ শারিকাতু মাকতাবাহ ওয়া মাতবা'আহ মুসতাফা আল বাবী আল হালাবী, ১৩৬৯ হি./১৬৫০ খ্রি.), পৃ. ৯-১০।

৩৩খালিদ আল আযহারী, শরহুত তাসরীহ 'আলাত তাওদীহ, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১১-১২।

فالعلوم العربية هى العلوم التى يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأ

(আরবি ভাষাবিজ্ঞান এমন জ্ঞানের নাম যার মাধ্যমে আরবি ভাষায় কথা বলা ও লিখার সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র থাকা যায়।)[৩৪]

ইসলামী শরীআহ অধ্যয়নে আরবি ব্যাকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী শরী'আহ জানা, বুঝা ও অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকেও শরী'আহ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍمِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْاَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

(এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের অন্তর্গত 'শরী'আহ'-এর উপর। সুতরাং তুমি তার (শরী'আহ) অনুসরণ করো। আর অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।)[৩৫] ইসলামী শরী'আহ এর সকল উৎস আরবি। ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়া ইসলামী শরী'আহ-এর মূল উৎসসমূহ তথা কুরআন, হাদীস, ফিকহ (ইজমা-কিয়াস) অধ্যয়ন ও অনুধাবন করা অসম্ভব। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যাকরণ সমৃদ্ধ শুদ্ধ আরবি ভাষাজ্ঞান।

ক)ভাষার শুদ্ধতায় আরবি ব্যাকরণ

আরবি বিশ্বের সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধশালী ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইসলামের সকল মৌলিক উৎসের ভাষা আরবি। দ্বীন জানা ও বুঝার মাধ্যম এ ভাষা। এ ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে। কুরআনের বাহক বিশ্বনবীর ভাষাও আরবি।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,[৩৬] إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ। তিনি অন্য আয়াতে বলেন,[৩৭] بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ। তাই দ্বীন বুঝার জন্য, ইসলামী শরী'আহ জানার জন্যআরবি ভাষাজ্ঞান অপরিহার্য। আর লাহনমুক্ত শুদ্ধ আরবি ভাষা চর্চা অপরিহার্য হলো আরবি ব্যাকরণ। ভাষাশুদ্ধ হলে ভাষা হবে সৌন্দর্যমণ্ডিত আর ভাষাভাষীরা হবেন সম্মানীত। 'আব্দুল বাকী ইবন 'আব্দুল মাজীদ তার *'ইশারাতুত তা'য়ীন ফী তারাজিমিন নুহাত ওয়াল-লুগাবিয়্যিন'* গ্রন্থে এক বেদুঈনকে ভাষার শুদ্ধতার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতার বর্ণনা করে কয়েকটি কবিতার চরণ উল্লেখ করেছেন।

তার দুটি চরণ নিম্নরূপ:[৩৮]

النحو يصلح من لسان ألكن * والمرء تكرمه إذا لم يلحن

৩৪শায়খ মুসতাফা আল গালায়ীনী, *জামি'উদ দুরুসিল 'আরাবিয়্যাহ*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুত তাওফিক লিত তুরাছ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৭।

৩৫সূরাহ আল জাছিআহ, আয়াত: ১৮।

৩৬ সূরাহ ইউসূফ, আয়াত: ২।

৩৭সূরাহ আশ শু'আরা', আয়াত: ১৯৫।

৩৮*মুহাম্মাদ বিক দিয়াব*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭।

فإذا طلبت من العلوم أجلها * أجلها منها مقيم الألسن.

"ব্যাকরণ ক্রটিপূর্ণ ভাষাকে শুদ্ধ করে। আর মানুষকে তখনই সম্মান করা হয় যখন তার ভাষা ক্রটিমুক্ত হয়।"

"যখন তুমি কোন বিদ্যার্জনের ইচ্ছা পোষণ করো, তখন তাকে মহৎ মনে করো।আর মহোত্তর বিদ্যা হল বিশদ্ধ ভাষায় কথা বলা।"

ব্যাকরণের উপকারিতা বর্ণনায় আয যাজ্জাজী বলেন,[৩৯]যদি কেউ বলেন, আরবি ব্যাকরণ শেখার উপকারিতা কি? তার প্রশ্নের উত্তর হলো, কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে শুদ্ধ ও যথাযথভাবে আরবি ভাষায় কথা বলার ও কুরআন বুঝার মাধ্যম হলো ব্যাকরণ। কুরআন দীন ও দুনিয়ার মূল ভিত্তি। একইভাবে নবী (সা)এর হাদীস জানা ও মর্মার্থ বুঝে জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যম হলো ব্যাকরণ। ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়া কোনটিই সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই 'উমার (রা) সকলকে ব্যাকরণ শেখার নির্দেশনা দিয়ে বলেন,[৪০] تعلموا النحو كما تعلمون السنن والفرائض(তোমরা ব্যাকরণ শিখো যেমনিভাবে তোমরা সুন্নাহ ও ইলমুল ফারায়িদ শিখছো।) তিনি আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা)-এর নিকট চিঠি লিখে বলেন,[৪১] أمابعد: فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن، فإنه عربي.(অতঃপর, তোমরা রসূলের সুন্নাহের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করো। আরবি ভাষায়ও দক্ষতা অর্জন করো। আর কুরআনে ই'রাব দাও। কেননা কুরআন আরবি ভাষায়)। তিনি ভাষার অশুদ্ধতাকে কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারতেন না। তিনি ভাষার অশুদ্ধতার জন্য তার সন্তানদেরকে প্রহার করতেন।[৪২]

৩৯আরবি ভাষ্য:

قال الزجاجي: فإن قيل: فما الفائدة في تعلم النحو؟ ... فالجواب في ذلك أن يقال له: الفائدة فيه للوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدل ولامغير (وتقويم كتاب الله عز وجل) الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد ومعرفة أخبار النبي ﷺ وإقام معانيها على الحقيقة، لأنه لاتفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب.

দ্র. আবুল কাসিম আয যাজ্জাজী (মৃ. ৩২৭ হি.), *আল ঈদাহ ফী 'ইলালিন নাহু*, ৩য় সংস্করণ (স্থান বিহীন, দারুন নাফায়িস, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৯৫।

৪০ আল যাহিয (মৃ. ২৫৫ হি.), *আল বায়ান ওয়াত তাবয়ীন*, ২য় খণ্ড(বৈরূতঃ দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, ৪২৩ হি.), পৃ. ১৫১।

৪১আবূ 'উমার ইউসূফ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল বার ইবন 'আসিম আল কুরতুবী (মৃ. ৪৬৩ হি.), *জামি'উ বায়নিল 'ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, ২য় খণ্ড (আল মামলাকাতুল আরাবিয়্যাহ আস সা'উদিয়্যাহঃ দারুল জাওযী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১১৩২।

৪২ ইয়াকূত আল হামাবী, মু'জামুল উদাবা, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল গরবিল ইসলামী, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৩।

হযরত আলী (রা) হাসান ও হুসাইনকে (রা) ভাষায় লাহন করার জন্য শাসন করতেন। হযরত ইবন ‘উমার (রা) ও ইবন আব্বাস (রা) উভয়েই তাদের সন্তানদেরকে ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করতেন।[৪৩]

আর আরবি ব্যাকরণের জনক আবুল আসওয়াদ আদ দুআলীর সন্তানরাও ভাষার অশুদ্ধতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। একদা আবুল আসওয়াদের কন্যা তাকে বলেন, يا أبت: ما أحسنُالسماءِ؟(আব্বু, আকাশের মধ্যে কোনটি বেশি সুন্দর?) আবুল আসওয়াদ বললেন, হে আমার কন্যা, তারকারাজিই আকাশের মধ্যে বেশি সুন্দর। কন্যা বললেন, আব্বু আকাশের মধ্যে কোন জিনিসটি বেশি সুন্দর আমি তা বুঝাতে চাইনি; বরং আমি আকাশের সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়েছি। আবুল আসওয়াদ বললেন, তাহলে তুমি বলো, ! ما أحسنَ السماءَ(আকাশটি কতই না সুন্দর!)[৪৪]অন্য বর্ণনায় আছে, তার মেয়ে বলেছিল, يا أبت: ما أشدُّ الحرِّ(আব্বু, কোন সময় বেশি গরম লাগে?) আবুল আসওয়াদউত্তরে বলেছিলেন, যখন আকাশে মেঘ থাকে এবং মাটি উত্তপ্তথাকে তখন গরম বেশি লাগে। মেয়ে বলল, বাবাআমি তো গরমের সময় বুঝাতে চাচ্ছি না, আমি বলতে চাচ্ছি, এখন কী গরম! আবুল আসওয়াদ বললেন, তাহলেবলো, ما أشدَّ الحرَّ!। এরপর তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন।[৪৫] তাই বলা যায়, ভাষার শুদ্ধতার জন্য ব্যাকরণ জরুরী।

খ)আল কুরআন অধ্যয়নে আরবি ব্যাকরণ

আল-কুরআন মহান আল্লাহ বাণী। এ কুরআনের ভাব-ভাষা, শৈল্পিক-লালিত্য, ছন্দ-প্রাঞ্জলতা, মৌলিকত্ব-স্থায়িত্ব ও বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত ও অপরিবর্তনীয়। তবে ই‘রাব তথা ব্যাকরণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে কুরআনের অর্থেও পরিবর্তন সাধিত হয়। কখনো কখনো কুফরী কালামও হয়ে যায়। আরবি ব্যাকরণ রচনার পিছনে তিনটি কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল এ ধরনের ভুল থেকে কুরআনকে সুরক্ষা করা। তাই ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়া কুরআন অধ্যয়ন তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করলে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা জানা সম্ভব নয় এবং ভুল তিলাওয়াত ও ব্যাখ্যার জন্য সওয়াবের পরিবর্তে কুরআনের লানত পেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,[৪৬]. صراط الذين أنعمتَ عليهم (আমাদেরকে তাদের পথ দেখিয়ে দাও যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন।) এই আয়াতে কারীমায় أنعمتَ এর পরিবর্তে أنعمتُ(تُ হারফে পেশ দিয়ে) পড়লে অর্থ হবে, আমাদেরকে তাদের পথ দেখিয়ে দাও যাদের উপর আমি অনুগ্রহ

৪৩আবু বকর আহমাদ ইবন ‘আলী ইবন ছাবিত আল খতীব আল বাগদাদী, *আল জামি‘ লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি‘*, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৪০৩ হি.),পৃ. ২৬, (১০৭০)।

৪৪ আল মাদারিসুন নাহবিয়্যাহ, পৃ. ১৫; আবূ সা‘য়ীদ আল হাসান ইবন আব্দিল্লাহ আস সাইরাফী, *আখবারুন নাহবিয়্যিন আল বসরিয়্যিন* (মিসর: মাদরাসাতুছ ছাকাফাতিদ দীনিয়্যাহ, তাবি), ১৮; *নাশআতুন নাহু*, পৃ. ১৮।

৪৫ আল মাদারিসুন নাহবিয়্যাহ, পৃ.২১; *আখবারুন নাহবিয়্যিন*, পৃ. ১৮।

৪৬ সূরাতুল ফাতিহাহ, আয়াত: ৭।

করেছি। এরকম তিলাওয়াত বড় গুনাহের কাজ। এরূপ ভুল কেবল ব্যাকরণ না জানার কারণে হয়ে থাকে। একইভাবে[৪৭] وإذ ابتلى إبراهيمَ ربّهُ(যখন ইবরাহীমকে (আ) তার প্রভূ পরীক্ষা করলেন।)[৪৮] ও وقتل داودُ جلوتَ(দাউদ (আ) জালুতকে হত্যা করেছিল।) আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে إبراهيمَ ربُّه এর স্থলে إبراهيمُ ربَّه পড়লে অর্থ হবে, যখন ইবরাহীম (আ) তার প্রভুকে পরীক্ষা করলেন। দ্বিতীয় আয়াতে وقتل داودُ جالوتَ এর স্থলে وقتل جالوت داودَ পড়লে আয়াতের অর্থ হবে, জালুত দাউদকে (আ) হত্যা করেছিল। উপরের আয়াতদ্বয়ের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে ই'রাব (مفعول ও فاعل)-এর পরিবর্তনের জন্য। এভাবে তিলাওয়াত করা কুফরী কালাম এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِالْعُلَمَاءُ এই আয়াতেও فاعل ও مفعول এর পরিবর্তনের জন্য বিপরিত অর্থ হবে, যা স্পষ্ট কুফরি কালাম।

তাইতো রসূল (সা.) সাহাবীদেরকে কুরআন নাযিলের সাথে সাথে তা সঠিক ভাবে পড়ে মর্মার্থ বুঝার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন রসূল (সা) বলেছেন, أعربواالقرآن الكريم والتمسوا غرائبه(তোমরা কুরআন বুঝে পড়ো ও উহার বিস্ময়কর-দুর্লভ জ্ঞান অন্বেষণ করো।)। এক ব্যক্তি রসূল (সা)-এর সামনে অশুদ্ধ করে কুরআন পড়লে তিনি উপস্থিত সাহবীদের বললেন,(أرشدوا أخاكم فقد ضل)তোমরা তোমাদের ভাইকে পথ দেখিয়ে দাও (ভাষা শুদ্ধ করে দাও) কারণ সে পথ হারিয়ে ফেলেছে।)[৪৯]তাই এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ কুরআনের ই'রাবের উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, ইবনুল আনবারী রচনা করেছন *আল বায়ান ফী ই'রাবিল কুরআন (البيان في إعراب القرآن);* আয যাজ্জাজ লিখেছেন, *মা'আনিল কুরআন ওয়া ই'রাবিহী (معاني القرآن وإعرابه);* আল ফার্‌রা ও আল আখফাশ প্রণয়ন করেছেন *মা'আনিল কুরআন(معاني القرآن)*।

তাই সকল প্রকার কুফরী কালাম ও অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত হতে বাঁচার জন্য এবং শুদ্ধ তিলাওয়াত ও জ্ঞান-গবেষণা করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে উভয় জগতে সফলতা অর্জনের জন্য আরবি ব্যাকরণ জানা অতি জরুরী।

গ)হাদীস অধ্যয়নে আরবি ব্যাকরণ

হাদীস হলো রসূল (সা)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি। ব্যাকরণ জানা না থাকলে হাদীস বর্ণনায় ই'রাবের পরিবর্তন হলে অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যাবে; যা রাসূল (সা)-এর উপর মিথ্যা বলারই নামান্তর। আর রাসূল (সা)-এর উপর মিথ্যা বলার পরিণতি বড় ভয়াবহ। রাসূল (সা) এ

৪৭ সূরাতুল বাকারাহ, আয়াত: ১২৪।

৪৮ সূরাতুল বাকারাহ, আয়াত: ২৫১।

৪৯ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ আল হাকিম আন নীসাপূরী (মৃ. ৪০৫ হি.), আল মুসতাদরক আলাস সাহীহায়ন, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৪৩৯।

প্রসঙ্গে বলেন,[৫০] من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে ঠিক করে নিল।) এক্ষেত্রে ইমাম নাবাবী (র)-এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,[৫১] وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف (প্রত্যেক হাদীস অন্বেষণকারীর উচিৎ আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ জানা। যে জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি বিকৃতভাবে হাদীস পড়া ও লিখা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।) আল-খাতীব আল-বাগদাদী তার 'আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামী" গ্রন্থে হাদীস চর্চায় ব্যাকরণের প্রয়োজনীতার উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি তার আলোচনার স্বপক্ষে মনীষীদের মতামত তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

১. আল-মুগীরা ইবন 'আব্দুর রহমান বলেন, 'একদা আদ-দারাওয়ারর্দী ('আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ) আমার বাবাকে হাদীস শোনাতে আসলেন, হাদীস পড়ার সময় তিনি স্পষ্টতঃ লাহন করে পড়ছিলেন। বাবা তাকে বললেন, হে আদ-দারাওয়ারর্দী, তোমার ধ্বংস হউক! তুমি আগে তোমার ভাষা শুদ্ধ করো তারপর তুমি হাদীস শোনানোর উপযুক্ত হবে।'[৫২]

২.হাযিব সুলায়মান বলেন, 'আমি ওয়াকী'কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হাদীস শোনার জন্য আ'মাশ এর নিকট গেলাম। আমি মাঝে মাঝে অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলছিলাম, তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ সুফিয়ান হাদীস শিক্ষা করার পূর্বে যে জিনিসটি শিক্ষা করা বেশি জরুরী তা তুমি শিক্ষা করনি। আমি বললাম হে আবূ মুহাম্মাদ, কোন জিনিসটি হাদীস শিক্ষার থেকে বেশি জরুরী? তিনি বললেন, ব্যাকরণ। আর তাই তিনি প্রথমে আমাকে ব্যাকরণ শিখালেন তারপর হাদীস লিখে দিলেন।'[৫৩]

৩. শু'বাহ বলেন,[৫৪]

من طلب الحديث، فلم يبصر العربية فمثله مثل الرجل عليه برنس، وليس له رأس

---

৫০ আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সাহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইবন কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯০৭ খ্রি.), হাদীস নম্বর ১১০, পৃ. ৫২।

৫১ ইমাম নাববী, *তাকরীমুন নাববী মা'আ তাদরীবির রাবী*, ২য় খণ্ড (তা. বি), পৃ. ১০৬।

৫২ قال المغيرة بن عبد الرحمن: جاء الدرَاوَرْدى- يعنى: عبد العزيز بن محمد- إلى أبى يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا بينا، فقال له أبى: ويحك يا الدرَاوَرْدى، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى . দ্র. *আল জামি' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬।

৫৩ قال حاجب بن سليمان: سمعت وكيعا يقول: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت، فقال لى: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث، فقلت يا أبا محمد، وأي شئ أولى من الحديث؟ قال: النحو. فأملى عليّ الأعمش النحو، ثم أملى على الحديث . দ্র. *আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামী'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬।

৫৪ *আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামী'*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬।

"যে ব্যক্তি ব্যাকরণ না জেনে হাদীস অন্বেষণ করে তার উদাহরণ ঐ কোট পরিহিত ব্যক্তির ন্যায় যার শরীরে আছে ঢিলেঢালা কোট অথচ তার মাথা নেই।"

৪. হাম্মাদ ইবন সালমাহ বলেন,[৫৫]

مثل الذى يطلب الحديث ولا يعرف النحو، فهو كمثل الحمار عليه مخلاة، لاشعير فيها.

"ব্যাকরণে অজ্ঞ হাদীস শিক্ষার্থীর উদাহরণ ঐ গাধার মত যার গলায় খাবারের থলি ঝুলানো অথচ তাতে কোন খাবার (যব) নেই।"

ঘ)ফিকহ চর্চায় আরবি ব্যাকরণ

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিধানাবলীর গবেষণালব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার হলো ফিক্হ। ব্যাকরণ ছাড়া যেহেতু কুরআন ও হাদীস চর্চা করা সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে ফিক্হ চর্চা করা একেবারে অসম্ভব। কারণ ব্যাকরণের নীতিমালা অনুসরণ করেই মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান দিতে হয়। ফকীহগণ ব্যাকরণের নীতিমালা অনুসরণ না করে কখনও মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান দিতেন না। ইবন আল-'ইমাদ আল-হাম্বালী তার 'শাযারাতুয যাহাব' গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ ইমাম শাফি'য়ী (র.)-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,[৫৬] لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. "আমাকে ফিকহের এমন কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়নি; যার উত্তর আমি ব্যাকরণের নীতিমালা অনুসরণ করে দেই নি।"

তাই বলা যায় আরবি ভাষার জ্ঞানের রাজ্যের চাবি হলো ব্যাকরণ। একমাত্র ব্যাকরণ জানার মাধ্যমে এ রাজ্যের তালা খুলে সকল গুপ্তধন আহরণ করা সম্ভব। ইমাম শাফি'য়ী বলেন, [৫৭] من تبحر فى النحو اهتدى الى كل العلوم. "যে ব্যাকরণে দক্ষতা অর্জন করলো, সে জ্ঞানের রাজ্যের সন্ধান পেল।"

আরফকীহ ও প্রকৃত মুজতাহিদ হওয়ার জন্য আরবি ব্যাকরণের উপর পূর্ণ জ্ঞানের অপরিহার্যতার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ভাষাবিজ্ঞানী একমত পোষণ করেছেন এবং ইজতিহাদ করার জন্য ব্যাকরণের জ্ঞানকে প্রধানতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ

---

৫৫ *পূর্বোক্ত।*

৫৬ ইবন আল'ইমাদ আল-হাম্বালী, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব* (কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুদস, তাবি), পৃ. ২৩১।

৫৭ *পূর্বোক্ত।*

করেছেন।[৫৮]অনেকে এ জ্ঞানকে একজন 'আলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৫৯] এমনকি প্রাচ্যবিদরা যারা সর্বদাই মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সন্দেহ ও সমালোচনার দৃষ্টিতে বিচার করে থাকেন তারা আরবি ভাষা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আরবি ব্যাকরণের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। যেমন প্রখ্যত প্রাচ্যবিদ 'ডি বোর' তার *তারিখুল ফালসাফাহ ফিল ইসলাম* গ্রন্থে (ড. মুহাম্মাদ আবূ রুয়ায়দাহ কর্তৃক অনূদিত) এবং জার্মানীর প্রাচ্যবিদ 'ইউহান ফিক'তার আল '*আরাবিয়্যাহ* গ্রন্থে (ড. আব্দুল হালীম নাজ্জার কর্তৃক অনূদিত) আরবি ব্যাকরণের মাহত্ত্ব ও প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তা জানার প্রয়োজনীতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[৬০]

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, কুরআনের সংস্পর্শে প্রণীত আরবি ব্যাকরণের নিয়মাবলী অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। আরবি ভাষার সকল প্রকার ভুল থেকে বাঁচার জন্য এ ব্যাকরণের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। একইভাবে কুরআনুল কারীম শুদ্ধভাবে পড়া, বুঝা, বিশ্লেষণ করা ও গবেষণার জন্য এ জ্ঞানের বিকল্প নেই। হাদীসের বর্ণনার যথার্থতা ও মর্মার্থ

---

৫৮ আহমাদ ইবন আবদিল্লাহ আল বাতলী তার আহমিয়্যাতিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ গ্রন্থে আবুল বারাকাত আল আনবারীর উক্তি উক্তি উল্লেখ করেছেন, إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهاد، وإن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو. (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে. ইজতিহাদ করার জন্য আরবি ব্যাকরণের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য শর্ত। একজন মুজতাহিদ সকল জ্ঞানের অধিকারী হলেও আরবি ব্যাকরণ না জানা পর্যন্ত মুজতাহিদের স্তরে পৌছতে পারবেনা।) দ্র. আহমাদ ইবন আবদিল্লাহ আল বাতলী, *আহমিয়্যাতিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ* (রিয়াদ: দারুল ওয়াতান লিন নাশর, ১৪১২ হি.), পৃ. ১৪।

৫৯ আল বাতলী একইভাবে আবু ইসহাক আশ শীরাযীর উক্তি নকল করেছেন। তিনি বলেন, ... ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله ﷺ في خطابهما. [তিনি (মুফতি বা মুজতাহিদ) আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ জানবেন, যার দ্বারা তিনি মহান আল্লাহর বানী ও রাসূল (সা.) এর কথার অর্থ বুঝতে পারেন।] দ্র.*আহমিয়্যাতিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৬০ডি. বোর বলেন, علم النحو أثر رائع من آثار العقل العربي ... ويحق للعرب أن يفخروا به. [আরবদের জ্ঞানের সৃষ্টিকর্মের নির্দেশনাবলীর মধ্যে আরবি ব্যাকরণ একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। . . . আর এ বিদ্যাকে নিয়ে আরবদের গর্ব করার যথার্থ অধিকার আছে।] দ্র. ডি বোর, *তারীখুল ফালসাফাহ ফিল ইসলাম*, অনুবাদ: ড. মুহাম্মাদ আবূ রুয়ায়দাহ (কায়রো: লাযনাতুত তালিফ, তাবি), পৃ ৪০; ইউহান ফিক বলেন, وقد تكفلت القواعد التي وضعها نحاة العرب بعرض اللغة الفصحى وتصويرها في جميع مظاهرها على صورة محيطة شاملة حتى بلغت كتب القواعد الأساسية عندهم مستوى من الكمال لايسمح بزيادة لمستزيد. [আরব ভাষাবিজ্ঞানীগণ নিয়ন্ত্রিত ও বিস্তৃত পদ্ধতিতে ভাষার বিশুদ্ধতা ও সুনাম রক্ষার্থে যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তা ভাষার রক্ষণাবেক্ষণের দ্বায়িত্ব পালন করেছে। এমনকি ভাষাবিজ্ঞানের উপর রচিত তাদের মৌলিক গ্রন্থাবলী উৎকর্ষের এমন স্তরে পৌছেছে যে, যার পরে কোন স্তরে যাওয়ার অনুমতি নেই।] দ্র. ইউহান ফিক আল 'আরাবিয়্যাহ, অনুবাদ: ড. আবদুল হালিম আন নাজ্জার; ড. মুহাম্মাদ 'আবদুল খালিক, আন নাহু বায়নাত তাকলীদ ওয়াত তাজদীদ, *মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, রিয়াদ: ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অনুধাবনের জন্যও ব্যাকরণের জ্ঞান সমভাবে প্রযোজ্য। আর ফিকহের জ্ঞান পুরোটাই ব্যাকরণ নির্ভর। কারণ কুরআন-সুন্নাহ হলো ফিকহের মূল উৎস। এক কথায়ইসলামী শরী‘আহ যথাযথ অধ্যয়নের জন্য আরবি ব্যাকরণ অপরিহার্য।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা
৬০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ খ্রি.

محمد سلطان ذوق الندوى : خدمته فـى اللغة العربية

محمد عميم الاحسان*

[Abstract : Muhammad Sultan Zauq an-Nadawi [b.1939 C.E./1357A.H] is a global Islamic figure, discreet philosopher and brilliant writer. He is one of the pioneers of the Islamic awakening and Arabic literary renaissance in Bangladesh. He is a man of great moral integrity. He rebelled against the old traditional curriculum of madrasahs and put emphasis on their development. He completed his higher education from Jameya Islamia, Patiya, Chattogram and Nadwatul Ulama, Lucknow, UP, India with distinction. His exemplary life was characterized by efforts, sacrifices, services and achievements, which drew the attention of the great intellectuals in the Arab and Islamic countries. He served as a teacher of Hadith Nabawi and Arabic literature in several madrashas in Bangladesh. He has urged the people who are related to madrasah education to overcome the drawbacks which they have in the recent past and to choose advanced modern methods of education and also introduce some decent improvements in the madrasah curriculum. As a call of duty, he established an ideal and advanced educational institution named "Jameya Darul Maaref al-Islamia", which motto is : **"Combining the good old with the useful new."** Muhammad Sultan Zauq an-Nadawi is the founder Editor of the Arabic "Manar Al-Sharq", "As-Subhul Jadid" and the Bengali "Al-Haq" magazines. Some of his literary works were included in the curriculum of madrasahs in Bangladesh. The thoughts of the famous Islamic Scholar Sayed Abul Hasan Ali-An Nadawai have always inspired him. This article aims to explicate his outlook on several crucial issues namely teaching methodology, format of curricula etc.

Keywords : Sultan Zauq an-nadawi, Education, Knowledge, The Teaching method, Philosophy.]

الكلمة الافتتاحية :

العالم العبقري، الداعية الإسلامي المعاصر، الشخصية الإسلامية العالمية، الأديب الاريب، والشاعر المبدع محمد سلطان بن أبـي الخير (ذوق، الندوي) تاريخ حيٌّ وشخصية عالمية، وله دور عظيم فى انتشار التعليم الإسلامى وبناء المجتمع على ضوء الشريعة الإسلامية فى بنغلاديش. وهو رجل متمسك بالعقيدة الإسلامية المبتنية على أسس القرآن والسنة النبوية

الباحث، الماجستير فـي الفلسفة، قسم الدعوة والدراسات الاسلامية، الجامعة الاسلامية، كوشتيا. amimul1@yahoo.com

وصوت قوي للحركة المعادية للشرك والبدعة، ورائد ناجح لنشر التعليم الإسلامي والفكرة الإسلامية، أنه دعا المدارس والجامعات الدينية إلى التيقظ والانتباه، ووجههم إلى الأساليب

المتطورة فـي المناهج التعليمية والتربوية، شعارها **"الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع"،** وضحّى نفسَه ونفائسه فى سبيله وركز جهوده لتنمية المستوى التعليمي فـي المدارس والجامعات المختلفة فـي بنغلاديش.

ميلاده ونشأته :

ولد العلامة الشيخ سلطان ذوق الندوي حفظه الله تعالى عام 1939م بجزيرة مهشخالي التابعة لمحافظة كوكسبازار بنغلاديش، [1] وكانت أسرته أسرة متديّنة متوسطة الثراء، عامرة بذكر الله، متمسكة بالكتاب والسنة، واسم أبيه الصوفـي أبو الخير، فقد كان كثير العبادة، شديد الورع، كريم النفس، ومنقطعا إلى التزكية والإصلاح، وكان جدّه من أمِّه مقبول أحمد رحمه الله مجازا فـي السلوك والتصوف للـ شيخ ظفر أحمد العثماني مؤلف [2] "إعلاء السنن".

بدأت حياته العلمية فـي قريته على العلماء المخلصين، فتلقى فيها التعليم المبدئي فـي العلوم الدينية والعصرية، ثم التحق بالمدرسة القرآنية التابعة للجامع المركزي فـي نَتُونْ بَازَارْ مهش خالي، [3] ودرس هناك القرآن الكريم ومبادئ العلوم الدينية عند الأستاذ فضل أحمد المرحوم، وكان يعطف على الطفل محمد سلطان، عطوفة الوالد لولده. [4]

ففـي عام 1952م الموافق 1372هج التحق بالجامعة الاسلامية فتية ستوغرام ، وقد كانت الجامعة الإسلامية فتية منهلا ثرّا صافيا للعلوم والمعارف الإسلامية والعربية، [5] ومجمعا زاخرا للعلماء والنبغاء، فوجد فـي عنفوان شبابه مسرحا كبيرا ومرتعًا خصبًا للتنمية الصالحة ومدرجًا للصعود إلى ذروة العلا. وقد تخرج فيها بتفوق وامتياز عام 1378هج الموافق 1959م بعد أن قضى فيها ست سنوات. [6]

حياته العملية :

---

1. صفحات من حياتي (النسخة البنغالية) ، للعلامة الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي ، ستوغرام، أندرقلعة، دار الفنا للطباعة ، ط- 2014م، ص : 25

2 اعلاء السنن، المحدث الناقد العلام ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله تعالي، دار الكتب العلمية، المجلد 1-22، بيروت، لبنان، طباعة 2017، ص : 25

3. صفحات من حياتي (النسخة البنغالية)، للعلامة الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي، ستو غرام، أندرقلعة، دار الفنا للطباعة، ط- 2014م ص : 28

4. حياة الشيخ المفتي عزيز الحق رحمه الله تعالي (الأردية والبنغالية)، كتبه : الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي، ستو غرام، أندرقلعة، دار الفنا للطباعة، ص : 15،16، ط-2014م

5. قطب الزمان شيخ العرب والعجم الحاج محمد يونس : حياته وأعماله وخدماته ، تأليف مولانا محمد حبيب الله ، ص : 166،212. رجال صنعوا التاريخ وخدموا الاسلام والعلم في بنغلاديش، ص : 344، دار البيان، داكا، الطباعة : 2018م.

6. رجال فقدناهم، مجد مكي، الجزء الثاني، ص : 88، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الاولي، نشرت من قبل فـي مجلة "منبر الداعيات" البيروتية.

بعد تخرّجه فـي الجامعة الإسلامية فتية، ستوغرام، بنغلاديش عام 1959م اشتغل بالتعليم بالمدرسة الرشيدية ;بَشَارَتْ نَغَر، صندنائش ستوغرام، وقام فيها بخدمة التدريس حوالي مدة سنتين.

وفـي سنة 1960م انضم بالجامعة الإمدادية كِشُورْ غَنْج كأستاذ أعلى بدعوة الشيخ مولانا أطهر علي رحمه الله، مؤسس حزب النظام الإسلامي، ومكث هناك سنة كاملة، وأثناء مكثه فـي الجامعة الإمدادية أنشأ قصيدة رائعة مدح فيها الجامعة والقائمين عليها، فلمّا رآها الأديب الشهير عبد الرحمن الكاشْغرِيْ أعجب بها، وكان آنذاك أستاذا بالمدرسة العالية داكا. وفـي سنة 1961م الموافق 1381هج عاد إلى الجامعة الإسلامية فتيه شيتاغونغ بأمر الشيخ محمد يونس عبد الجبار رحمه الله المدير الأسبق للجامعة. وكان مدرسا ناجحا موفقا يتبع أسلوبًا خاصًّا فـي إلقاء الدروس والمحاضرات، فتهافت عليه طلبة العلم تهافت الجراد على الشمع.

وكان يقوم بتأهيل الطلاب للخطابة، ويعلمهم قواعد الكتابة وفن الإنشاء والتعبير فـي العربية والأردية، كما يقيم الأمسيات الأدبية والأندية الشعرية ويديرها ويشرف عليها بكل إخلاص حتى أتت جهوده المبذولة بثمار يانعة، وما يرى اليوم فـي بنغلاديش من أنشطة أدبية عربية، ما هي إلا من نتاج تلك الجهود المخلصة التي بذلها الشيخ، فجزاه الله أحسن وأوفر الجزاء.

و فى عام 1971م اضطرّ إلى مغادرة التدريس إثر نشوب الاضطرابات السياسية، فاشتغل بجريدة "شجاعة" الأردية مدة وقد نشرت له فيها عدة مقالات قيمة وقصائد راقية.

وفـي العام المذكور عين أستاذا فى الجامعة عزيز العلوم بابونغر فتكصرى شيتاغونغ بإشارة من شيخه هارون بابونغري رحمه الله. فقام فيها بتأسيس منظمة طلابية المسماة بـ"نادية الأدب" لممارسة الأنشطة الأدبية والثقافية. وكان يؤدي مسئولية الإفتاء بها.

ولما استقرّ الوضع السياسي باستقلال بنغلاديش عام 1971م عاد إلى حقله التعليمي الجامعة الإسلامية فتية، وكان يدرس فيه ا كتب الحديث والفقه إضافة إلى إشرافه على قسم الأدب العربي بالجامعة، وقام بتأسيس "مجمع اللغة العربية وآدابها بنغلاديش " و كانت تصدر بإدارته جريدة عربية راقية باسم "الصبح الجديد" على رأس ثلاثة أشهر .

فـي سنة 1385هج استقال عن خدمة التدريس بالجامعة الإسلامية بعد أن قضى فيها 17 سنة قصدا إلى ما كان يحلمه من الجمع المتّزن بين الأصالة والحداثة فـي مناهج المدارس الإسلامية، وفاءً لمقتضيات العصر، ومتطلبات بيئة هذه البلاد[7].

سفره إلى ندوة العلماء لكناؤ الهند :

---

7. صفحات من حياتي (النسخة البنغالية)، للعلامة الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي، ستوغرام، أندرقلعة، دار الفنا للطباعة، ص : 45، ط-2014م

فـي سنة 1981م الموافق 1406هج سافر إلى الهند للمشاركة فـي "مؤتمر الأدب الإسلامي العالمي" الذي عقدته "رابطة الأدب الإسلامي العالمية" بندوة العلماء لكهناو، و قد تعرّف أثناء هذا السفر على كثير من الشخصيات الإسلامية الكبار والأدباء المعاصرين، وأقام فـي دار العلوم بندوة العلماء مدة شهرين، وتولّى تدريس مادة التعبير والإنشاء والترجمة لطلاب المرحلة الثانوية فيها. وفـي هذه الرحلة نال شرف الانتساب إعزازيا إلى ندوة العلماء، حيث أجازه الشيخ أبو الحسن علي الندوي رحمه الله بكتابة لقب "الندوي" مع اسمه، تقديرا لجهوده العلمية وإنتاجاته الأدبية، وهو أول شخص نال هذه المكرمة العلمية الإعزازية.

و أيضا سافر الشيخ إلى المملكة العربية السعودية و دولة قطر وسلطنة عمان، وتاليندا وماليزيا وباكستان والهند وكثير من الدول الشرقية فـي بعض المناسبات الدعوية.

تأسيس جامعة دار المعارف الإسلامية :

لم تؤسس جامعة دار المعارف الاسلامية لتنافس اخواتها من المدارس، ولا لتجاري نظيراتها من الجامعات، وانما نشأت علي تقوي الله عز وجل لتحقيق أهداف سامية متماشية مع حاجات العصر فاهمة لغة العصر، سيطرت علي رأسه فكرة إنشاء مؤسسة تعليمية مثالية متطورة تتبع منهج السلف الصالح وتخضع للطريقة الوسطية على غرار دار العلوم التابعة لندوة العلماء، وقد أشار عليه سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله فـي أول سفره إلى بنغلاديش أن يستعد لإقامة مدرسة دينية مثالية تلبّي دعوة العصر الراهن ومتطلباته، فأسس معهد دار المعارف الإسلامية [8] عام 1985م، وكان شعارها منذ أول يومه " الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع"، فتطور المعهد فـي مدة قريبة وبلغت تعاليمه إلى المرحلة الجامعية فتحوّل المعهد إلى الجامعة وسمّيت بجامعة دار المعارف الإسلامية ستوغرام، بنغلاديش وقامت المعادلة بين جامعة دار المعارف الإسلامية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1414هج، وكما اعترفت جامعة دار العلوم ندوة العلماء فـي الهند بجميع شهاداتها الدراسية عام 1417هـ.

دعوته الى الاصلاح والتطوير فـي منهاج التعليم :

فلاشك أن الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي أحد الرجال المصلحين الكبار فـي هذا العصر، وأن له نظرية متميزة فـي الإصلاح والنهوض وبعثها من جديد، لتقوم بدورها ورسالتها التي كلفها الله القيام بها، وإن أول ملامح المصلح أن يكون عارفا بمشكلات أمته، فعرف هذا المصلح المفكر هذه المشكلة التي يعاني بها الأمم فـي العصر الحاضر فـي مناهجهم التعليمية، فانطلاقا من هذه المشكلة قام الشيخ الندوي سنة 1985م بتوجيه دعوة مدوية إلى

---

8. جامعة دار المعارف : جذور راسخة وهمة الي القمة، محمد عفيف فرقان المدني، استاذ الحديث وأمين العام للنادي الثقافي بجامعة دار، المعارف، المجلة التذكارية بمناسبة المؤتمر الاول لتكريم الخريجين بدار المعارف على مرور 35 عاما من التأسيس، ص : 148،149

المسئولين عن المدارس الاسلامية، وإدخال تحسينات وتطويرات فـي هذه المناهج بما يتفق طبيعة العصر الحديث.

كتب العلامة محمد سلطان ذوق الندوي كلمة عن المناهج الدراسية فـي الأقطار الإسلامية فـي إحدى كلمات العدد لمجلة "الصبح الجديد" فنالت الكلمة قبولا وإعجابا لم يكن يرجوهما حين يكتبها، لاسيما لما كانت المحتويات مما يصادم الاراء العامة، ثم حاول الندوي انتقادا خاصا بالمنهج التعليمي السائد فـي مدارس بنغلاديش الإسلامية، ووضع خطة جديدة بالتشاور مع علماء التدريس والتربية.[9]

المؤتمرات والندوات التى شاركها :

قد شارك العلامة الشيخ سلطان الندوي عددا كثيرا من المؤتمرات والاحتفالات العالمية، وفي التالي أذكر بعضا منها :

1. المهرجان المئوي لدار العلوم ديبوند بالهند على دعوة اللجنة الاستقبالية بعام 1400 الهجري الموافق 1980م.
2. الندوة العالمية المنعقدة فـي رحاب دار العلوم ندوة العلماء بلكنو للنقاش فـي المناهج التعليمية بعام 1401 الهجري الموافق 1981م.
3. مؤتمر القمة الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة للنقاش فـي قضية الخيلج بعام 1990م.
4. ساهم فـي المسابقة العلمية فـي الجماهير الليبية بطرابلس ببحث حول الإسلام والمرأة بعام 1982 م ونال البحث الترتيب الثاني بين البحوث المقدمة فـي المسابقة.
5. ساهم فـي المؤتمر العالمي لـرابط الأدب الإسلامي العالمية المنعقد بلكنؤ فـي الهند بعام 1406هـ الموافق 1985م، بمقال حول اختيار النصوص الأدبية من وجهة نظر الإسلام، نشرته مجلة البعث الإسلامي الصادرة من ندوة العلماء فـي الهند.
6. شارك فـي المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالمملكة العربية السعودية تلبيةً لدعوة الحرس الوطني للشئون الفنية بالمملكة عام 2000م، والمقال الذي أعدّه للإلقاء فـي المهرجان كان عنوانه "دور العرب فـي نشر الإسلام والثقافة الإسلامية والبلاد المتاخمة".
7. شارك فـي الاحتفال بانقضاء عشرين سنة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بالرياض، تلبيةً لدعوة جامعة الملك السعود بالرياض سنة 2001م.

<u>تأليفاته وانجازاته العلمية</u> :

يمتاز مؤلفاته بنفاسة العلم وجودة الفكر، وحسن التعبير والعرض. فمن مؤلفاته :

1. **الطريق إلى الإنشاء (ثلاثة أجزاء).**

---

9. مجلة التذكارية الوداعية "هدهد"، جامعة دار المعارف الإسلا مية، شيتاغونغ، عام 2005م، ص : 24

لتلاميذ صف كنز الدقائق وشرح الوقاية والهداية، سنة النشر : 1400هـ، دار النشر : مكتبة الندوي بشيتاغونغ، الأجزاء : 3، صفحات الكتاب : (الجزء الأول) 24، (الجزء الثاني) : 80، (الجزء الثالث) : 64.

ومن مزايا (الطريق الى الانشاء) :

تلبية رغبات الجيل المعاصر وإملاء الفراغ فـي منهج التعليم :

إن المؤلف ـ حفظه الله ـ كان يحلم منذ سنوات أن يؤلف كتابا تمرينيا فـي الانشاء والتعبير على ضوء الأدب العربي الجديد، ليملأ الفراغ الذي فـي منهج المدارس الأهلية حول هذا الموضوع الحديث، وأحسن أهلها لأهميتها، فشمر الكاتب عن ساق الجهد، واعد هذا الكتاب المفيد ـ فـي ثلاثة أجزاء ـ فـي شهر فقط، كما قال الكاتب فـي سيرته الذاتية:

"شعرت بأهمية تأليف كتاب للإنشاء على أسلوب "معلم الإنشاء" المطبوع من ندوة العلماء لكناؤ، الذي يرشد الطلاب إلى الترجمة والتعبير، فألفت ـ بتوفيق الله ـ (الطريق إلى الإنشاء) فـي ثلاثة أجزاء فـي شهر فقط، وهذه السلسلة أيضا صادفت قبولا فـي المناهج الدراسية فـي المدارس الأهلية والرسمية، فاستفاد الطلاب كثيرا بهذا الكتاب فـي دروس الإنشاء والتعبير، ولابد لي أن أصحح وأزود فـي كتب الإنشاء بمرور الأيام وإمتداد العصور، إن سمح لي الو قت أكمل هذه العملية أيضا، والله أسأل التوفيق"[10]

سلسلة كاملة فـي فن الإنشاء :

رأينا هذا الكتاب يجدر لنا أن نقول : هذا الكتاب منهج كامل فـي فن الإنشاء والتعبير، فان الكاتب بدأ الجزء الأول يذكر أكثر من ست مائة كلمات مفردة، وأرشد المعلمين الكرام إلى طريق التدريس والتدريب، حيث قال الكاتب فـي مقدمته : "أوردت أكثر من ست مائة كلمات مفردة تحت عناوين مستقلة، فعلى المعلمين أن يكتبوا الطلاب بها جملا أردية، فيعربوها، ثم يكتبوهم بها جملا عربية فيحولوها إلى الأردية ...."ثم تدرج الى عملية الترجمة من العربية إلى الأردية أو عكسها. وبسط الكلام فـي الجزء الثاني عن علم الإنشاء مع تمرينات شتى، وبين كيفية إعداد المقالات والرسائل وغيرها بكل إيضاح.

تقديم الأساليب والنماذج مع تطبيقاتها وتمريناتها :

وجدنا الكاتب يقسم الجزء الثاني إلى ثلاثة أبواب......الباب الأول : فـي الأوصالف والفوائد، والثاني : فـي الموضوعات العامة، والثالث : فـي الرسائل.

مازال الكاتب يشرع كل باب ببيان طريقة الكتابة وأجزاء المقالات، ثم يذكر موضوع الكتابة مع عناصرها، ثم يذكر نموذج إجابتها. ثم أتى الكاتب بالتطبيق، ويذكر موضوعا قريبا يلائم بما قبله مع عناصره، فيعد التلميذ المقالة على ضوء هذه العناصر، ففـي هذا

---

10. صفحات من حياتي (النسخة البنغالية)، للعلامة الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي، شيتاغنغ، أندرقلعة، دار الفنا للطباعة، ص : 80، 81، ط-2014م.

الطريق سلكه فـي الكتاب، إلا وجدناه فـي بداية الجزء الثالث يفصل أساليب الإنشاء كل التفصيل، وبسطها كل البسط، حيث قسم الباب الأول إلى ثلاثة دروس، أولها : التفصيل والتجزية، وثانيها : التجز ية وإعتدال الأجزاء، وثالثها : تعيين المواضيع وتفصيلها. [11]

نقل بعض المقالات والرسائل للادباء البارزين :

زين الكاتب كتابه بكتابات بعض الأدباء البارزين ورسائلهم، نموذجا لدى الطلبة، هذه عملية حميدة رفعته إلى ذروة عليا، مرة نجده كلمة الشيخ يوسف جاسم الحجي، أو فقرة الشيخ عبد العزيز آل مبارك، وأحيانا نجده يقتبس فقرات من كتب السيد أبي الحسن علي الندوي، وبعض رسائله، وفـي بعض المقام نجده يقوم بعنوان "نماذج الإنشاء : رسائل ومقالات كُتاب مصر والهند.

وأهم ما قال به المؤلف فـي هذه السلسلة الأدبية الكريمة أنه ذكر بعض إرشادات قيمة فـي بداية الجزء الثالث من الكتاب بعناوين : "ما يجب على التلميذ ملاحظته ليتقدم فـي الإنشاء" و "طريق السير فـي موضوع الإنشاء" و "العيوب التي يقع فيها التلاميذ فـي إنشائهم"، وألحق بنهاية الكتاب بعض اداب الكاتب والمؤلف، أنقل هذه الاداب وتلك الإرشادات بعبارة المؤلف، لتكمل الغاية، وتعم الفائدة.

وإرشاد ما يجب على التلميذ ملاحظته ليتقدم فـي الإنشاء :

أرشد الكاتب إلى ما يجب على التلميذ ملاحظته ليتقدم فـي الإنشاء حيث قال :

أ. يجب أن تتكلم دائما باللغة العربية لتتعود التعبير الصحيح، فأن هذا يساعدك على الإنشاء لأنه ليس إلا حديثا مكتوبا.

ب. فـي دروس المطالعة يجب أن تعبر عن معنى قرأت بعبارة من عند ك، وأن تحرص على الألفاظ اللغوية الجديدة، والأساليب الجيدة لتخرجها عند المناسبة بإنشائك كي يرق ويحسن.

ج. وفـي دروس المطالعة أيضا معلومات شتى جليلة الفائدة، فاحرص عليها لتغرز مادتك، وتجد العناصر موفورة عند التفكير فـي أي موضوع يمس تلك المعلومات.

د. المحفوظات أثر عظيم فـي الإنشاء، فيجب أن تذكرها دائما عند الكتابة لتستفيد من أسلوبها ومعناها ولتقتبس منها ما يناسب موضوعك.

ه. يجب أن تعرف ما تدرسه من المواد، كتدبير الصحة، ومبادئ العلوم والجغرافية، تستطيع أن تنتفع به عند معالجة الموضوعات التي لها صلة بهذه المواد، فالصحة تفيد فـي مو ضوع "النظافة" والتاريخ يعينك فـي "الاثار"، وفـي الموضوعات الإجتماعية

---

11. تيسير الطريق الي الانشاء، ابو صائم بن عبد القيوم، المكتبة المدنية، بنغلابازار، داكا، الطباعة : 2019

مثلا. وفـي الصحف والمجلات والكتب معلومات غزيرة، وأساليب حسنة تستفيده إذا عنيت بقرائتها، فيجب أن توجه إليها عناية خاصة ليؤثر ذلك فـي إنشائك.

2. التعليق على قصص النبيين للشيخ الندوي (على ثلاثة أجزاء الأوائل).

3. شرح زاد الطالبين للشيخ عاشق إلهي البرني (بالأردية).

4. نخبة الأحاديث.

5. دعوة الإصلاح والتطوير فـي منهاج التعليم (بالعربية والبنغالية والأردية).

6. حديث النفس (بالأردية والبنغالية).

7. سلسلة مع الطفل المسلم المعاصر (كتب منهجية لتعليم اللغة العربية عشرون درسا).

راح الشيخ يتمنى تحبيب الأطفال اللغة العربية، [12] يلفت أنظار العلماء إلى توسيع الدائرة العربية فـي منهج التعليم، ويدعوهم إلى تحويل هذا المنهج الأردي إلى المنهج العربي، ولكن لم يجد أي كتاب يشبع رغبات الجيل الجديد فـي تعليم العربية وتنمية أهليتهم من المرحلة الإبتدائية، فبدأ يؤلف هذه السلسلة المفيدة باسم (مع الطفل المسلم المعاصر) لسد هذه الفاقة والحاجة.

اختبار الأسلوب السهل :

اختار الكاتب فيها أسلوبا سهلا حديثا، يسائر أعمار التلاميذ ومداركهم، فإن العصر عصر التسهيل والتيسير، فأصبح كل شيء أسهل الحصول، حتى تمكنا اليوم أن نتصل بمن نريده، وإن كان أقصى بلاد أمريكا، ونشاهده على شاسة الجوال والكمبيوتر ومن حوله، كانه يتكلم جالسا معنا، فالله سبحانه وتعالى ـ يسرنا كلها بالعلوم الحديثة والتكنولوجيا، فيجدر باطفالنا أن ينالوا منهجهم التعليمي سهلا سائغا.[13]

مراعاة طبيعة البلاد :

اختار الكاتب فيها أسلوبا يجري مع طبيعة البلاد، حيث أورد فيها أشياء يعرف الأطفال أسماءها فـي البنغالية، لتواجدها وتوافرها فـي بنغلاديش، أو فـي الدول التي تجاورها، وأيضا ترجم المفردات والمركبات الى البنغالية الفصيحة، عكس ما كان يدرس قبل ذلك من الكتب، فأنها ترجمت فيها إلى الأردية أو الفارسية، بعد استقلال بنغلاديش من سيطرة الأردية ازدادت الرغبات إلى البنغالية الوطنية، فحاول الكاتب أن يتم هذه الرغبات الجميلة، ويراعي طبيعة البلاد وبيئتها، فهذه المراعاة من ذكاء الكاتب الأديب وسذاجته.

مضامين توافق العقائد الإسلامية :

لقد وجدنا الكاتب فـي هذه السلسلة يودع فـي قلوب الصغار بذر الإيمان، ويغرس فـي عقولهم النقية الفتية نبتة الاسلام، حيث استخدم الألفاظ التي تتعلق بالاسلام، والقصص التي

---

12. علماء بنغلاديش ومشايخها (منذ انتشار الاسلام حتي العهد الحاضر)، فضيلة الشيخ فرقان أنوري ومحمد عميم الاحسان، دار التزكية، بيت المكرم، داكا (تحت الطباعة).

13 https//:sayeedahmadkhannadwi.blogspot.com, العلامة سلطان ذوق الندوي البنغلاديشي

تعلمهم الدروس والعبر حول الدين، والأناشيد التي تحثهم على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة، أمثال ألفاظ : الله، بركة، تسبيح، ثواب .....، و (النثر) أنا مسلم، قرأت القران، الله خالق كل شيء، الله الواحد الأحد...، (القصص) التفكير فـي خلق الله، نصيحة لقمان لابنه، من مكارم الأخلاق....، (الأناشيد) التحية، الكتاب، الله، سبحان ربي أناره، الله ربي، تحية الضيوف، أنا يا قوم مسلم.

التصوير المباح :

مما يثير انتباه الأطفال أن تطبع كتبهم مصورة مزينة، كي يعرفوا الأسماء بالصور، ويرغبوا فـي القراءة، فإنهم مفتونون بالألعاب، والتصوير والتزيين يظنونهما لعبة لهم، فيهتمون بالقراءة، وجدنا الكاتب ناجحا فـي هذا المجال، حيث صور فـي معرفة الحروف والمفردات والجمل الصغيرة، وأحسن تصويرها، لكن لم يجاوز حد الشرع الذي حدده الرسول ـ ﷺ ـ فلم يتعرض لتصوير الحيوان أو أي صور غير جائزة:

ادخالها فـي المقررات الدراسية :

قال العلامة الكبير المحدث الفقيه الأديب الشيخ إسحاق الغازي ـ رحمه الله : "فارى إدخال هذه الكتب فـي المقررات الدراسية فـي الصفوف المناسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأسال الله تعالى أن يتقبل ... "من أهم مزاياها أن هذه السلسلة قد صادفت قبولا من مجالس تعليمية لكثير من مدارس الاهلية والرسمية ورياض الأطفال الاسلامية، فما زال ألوف من الصغار يتعلمون العربية يقروون هذه السلسلة الحبيبة.

8. القراءة العربية (الجزء الأول والثاني).
9. القراءة للراشدين.
10. أفكار (ديوان الشعر) فـي الأردية والعربية والفارسية.
11. التعليق الضروري على مقامات الحريري.
12. الجانب البلاغي فـي شعر المتنبي.
13. لحن الفؤاد (مجموع من القصائد العربية والأردية والبنغالية).
14. كلمات مختارة.
15. شذرات من النصوص الأدبية (جزآن من الكتب المنهجية).
16. الخطب العصرية.
17. طرق التأثير والإقناع فـي الدعوة إلى الله.
18. الأذكار والأوراد والمأثور (بالعربية والبنغالية).
19. الحج والعمرة (بالعربية والبنغالية).
20. معلم الفارسية.

21. المرشد إلى الأردية (قواعد).
22. قواعد الأردية الميسّرة (قواعد).
23. حياة الشيخ المفتي عزيز الحق رحمه الله (بالأردية والبنغالية).
24. تسلية القلوب (شيئ من حياة الشيخ محمد هارون البابونغري).
25. قندخامه شرح بندنامة للعطار.
26. رحلتي إلى أرض الجهاد (بالعربية والبنغالية).
27. موجز فـي حياة الإمام الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله.
28. موجز فـي حياة حكيم الإسلام العلامة القارئ محمد طيب رحمه الله.
29. تعريف عن القاديانية وحركاتها فـي بنغلاديش.

ذوقه فـي النثر والنظم :

وإن العلامة الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي ما كان بارعا فـي النثر فقط، بل كان مبدعا فـي انقراض الشعر ايضا فـي العربية والأردية والفارسية، فقد نطق بلغة الضاد فأفصح، وتحدث بالأردية فأجاد، وتعلم الفارسية فأتقن، حتى جادت قريحته بالنظم والنثر أيضا بهما أفحل شعراء هذه اللغات الإسلامية الثلاث، وله ديوان فـي الشعر يسمى "كليات ذوق" ديوان الشعر فـي العربية والاردية والفارسية، الذي يحتوي على أشعار تقريبا فـي مائتي صفحة، فيعرفه الناس شاعرا مبدعا مطبوعا مؤثرا، كثير النوادر فـي الشعر، واعترفوا بعبقريته الشعرية النادرة، كما اعترف بذلك مفكر الإسلام الشيخ السيد أبو الحسن علي الندوي ـ رحمه الله ـ أيضا، وذلك عند مارأى الشيخ شعرا له فـي موعد للزيارة فقال : "إني ما كنت عالما بعبقريتك الشعرية النادرة هذه من قبل!" وقال مغربي فـي شإنه عند ما رأى شعرا خلال زيارته للمغرب : "والله هذا متنبي! [14]

وكان له الباع الطويل والقدم الراسخة فـي اللغة الأردية والفارسية وادابهما أيضا، نثرا كان أو شعرا، فينظم القصائد الأردية والفارسية بسهولةٍ وبسرعة مدهشة، وبأسلوب سهل ممتنع، قد يثير عجب أبنائهما.

بعض مقالاته وحواراته المنشورة :

أـ المقالات :

1. الجانب الخلقي لسيرة النبي ﷺ.(نشرت سنة 1401هـ فـي إحدى الصحائف الغراء الصادرة من دولة قطر.
2. الاتجاهات الأدبية فـي بنغلاديش لمستوى الطفل (فـي مجلة الأدب الإسلامي الفصلية الصادرة عن رابطة الأدب الإسلامي العالمية بمملكة العربية السعودية).

14. ذوق الندوي، محمد سلطان ذوق، كليات ذوق، بنغلاديش، ستوغرام، المكتبة العزيزية، ط 1396هـ ص : 172

3. اختيار النصوص الأدبية من وجهة نظر الإسلام (فـي مجلة البعث الإسلامي الصادرة من ندوة العلماء فـي الهند).
4. الأدب الإسلامي وتطوّراته فـي بنغلاديش (فـي جريدة الرائد سنة 1410 هـ.

وغيرها من المقالات القيمة طبعت فى الصحف والمجلات الداخلية والخارجية.

ب-الحوارات :

1. نشر له حوار فـي صحيفة العرب بدولة قطر فـي يناير سنة 1995م.
2. نشر حوار فـي جريدة العالم الإسلامي الصادرة من رابطة العالم الإسلامي بعنوان بالتعليم الإسلامي نواجه العلمانية والإلحاد فـي جمادى الأولى عام 1420هـ.
3. نشر حوار عن الأدب الإسلامي فـي مجلة الوعي الإسلامي الصادرة من الكويت.
4. ونشر له حوار فـي مجلة المجتمع الصادرة من الكويت.
5. ونشر حوار فـي مجلة منار الإسلام بالإمارات المتحدة.
6. ونشر حوار فـي مجلة المدينة الصادرة من السعودية.

بارك الله فى حياته ونفع به الأمة الإسلامية شرقا وغربا.

المراجع :

1. القرأن الكريم.
2. صحيح البخاري، للامام محمد بن اسماعيل البخاري، المكتبة المدنية، بنغلابازار، داكا
3. صحيح مسلم، للامام مسلم بن الحجاج القريشي، المكتبة المدنية، بنغلابازار، داكا
4. صفحات من حياتي (النسخة البنغالية)، للعلامة الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي، ستوغرام، أندرقلعة، دار الفنا للطباعة، ط-2014م
5. رجال صنعوا التاريخ وخدموا الاسلام والعلم فـي بنغلاديش، ميزان هارون، دار البيان، بنغلابازار، ط-2018م
6. علماء بنغلاديش ومشا يخها (منذ انتشار الاسلام حتي العهد الحاضر)، فضيلة الشيخ فرقان أنواري ومحمد عميم الاحسان، دار التزكية، بيت المكرم، داكا (تحت الطباعة).
7. مجلة الوعي الاسلامي الصادرة من دولة الكويت، العدد 402، صفر 1420هـ-مايو-يونيو 1999م.
8. مجلة منار الشرق الصادرة من جامعة دار المعارف الاسلامية، شيتاغونغ، بنغلاديش، العدد التاسع والعاشر، محرم جمادي الاخري، عام 1421 هـ.
9. مجلة التذكار الوداعية هدهد لعام 2005م، جامعة دار المعارف الاسلامية، ستوغرام.

10. اعلاء السنن، المحدث الناقد العلام ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله تعالي، دار الكتب العلمية، المجلد 1-22، بيروت، لبنان، طباعة 2017، ص : 25
11. حياة الشيخ المفتي عزيز الحق رحمه الله تعالي (الأردية والبنغالية)،
كتبه : الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي، شيتاغنغ، أندرقلعة، دار الفنا للطباعة، ط-2014م
12. رجال فقدناهم، مجد مكي، الجزء الثاني، ص : 88، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الاولي، نشرت من قبل في مجلة "منبر الداعيات" البيروتية.
13. القادياني والقاديانية، ابو الحسن علي الحسني الندوي، الدار السعودية، جدة، الطبعة السادسة، 1410هج ،1990م،
14. جامعة دار المعارف : جذور راسخة وهمة الي القمة، محمد عفيف فرقان المدني، استاذ الحديث وأمين العام للنادي الثقافي بجامعة دار المعارف، المجلة التذكارية بمناسبة المؤتمر الاول لتكريم الخريجين بدار المعارف على مرور 35 عاما من التأسيس، ص : 148،149
15.أستاذي وشيخي سلطان ذوق الندوي البنغلاديشي، محمد شهاب الدين،
https :islamicmedia.org, 2.12.2019